মাসুদ রানা

জলরাক্ষস

কাজী আনোয়ার হোসেন

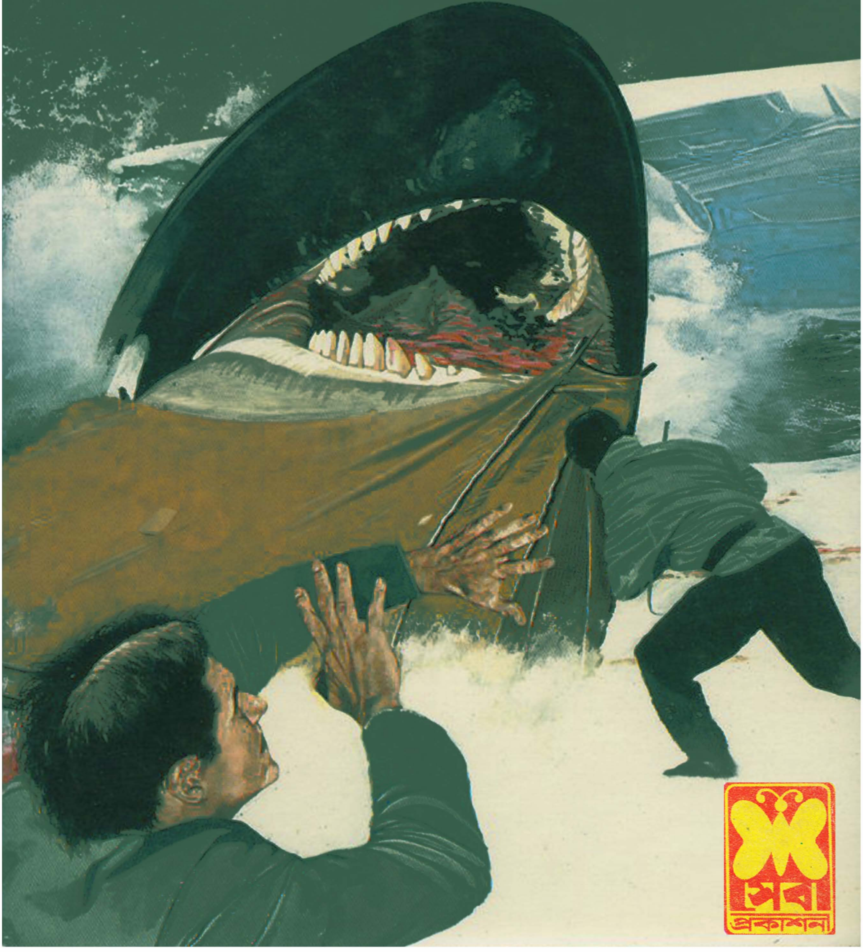

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৩৮১

জলরাক্ষস

কাজী আনোয়ার হোসেন

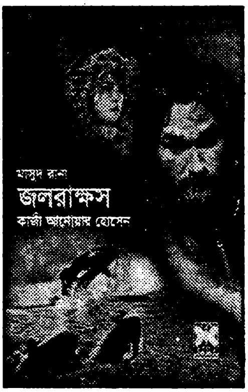

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ছেষট্টি টাকা

ISBN 984-16-7381-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিদেশি ছবি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-381
JALRAKKHOSH
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক

অরেগন, যুক্তরাষ্ট্র।

এইম ফ্যাসিলিটির কমান্ডার লয়েড পারকার মানুষটা একটু অন্যমনস্ক হলেও, মানুষ হিসাবে অত্যন্ত অমায়িক। কিন্তু পেন্টাগন থেকে ফিরে আসবার পর এতটাই বদলে গেছেন তিনি, ফ্যাসিলিটির টেকনিশিয়ান ও বিজ্ঞানীরা ভদ্রলোককে চিনতেই পারছেন না। যাঁর মুখে হাসি ছাড়া কথা ফোটে না, তিনি সবাইকে কনফারেন্স রুমে ডেকে পাঠিয়ে রীতিমত চোখ রাঙিয়ে ধমকের সুরে আদেশ-নির্দেশের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন।

তারপর জানা গেল কী ব্যাপার। এইম, অর্থাৎ অলটারনেটিভ ইন্টেলিজেন্সেস মেরিন ফ্যাসিলিটি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে আরও টাকা দরকার কমান্ডার পারকারের। সেটা পেতে হলে নেভিকে খুশি করতে হবে ওঁর। আর নেভিকে খুশি করতে হলে প্রথমে জয় করতে হবে অ্যাডমিরাল ওয়ালেস-এর মন। অথচ অ্যাডমিরাল ওয়ালেস সম্পর্কে জানা গেছে, ওই ভদ্রলোকের মন জয় করাটা খুবই কঠিন কাজ।

দু'বছরে এই প্রথম মেরিন সৈন্যদের নিয়মিত মার্চ-এর শব্দকে ছাপিয়ে অ্যাংকারেজ-এর শান্ত পানির উপর দিয়ে সার্জেন্টের হুংকার ছুটে গেল বহুদূর। কয়েকটা টিম ব্যস্ত হাতে পুরানো জাহাজগুলোয় নতুন করে রঙ চড়াল। ঘষে-মেজে, ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে তকতকে করা হলো ল্যাব রুম, কমপিউটার, ভিডিও ইকুইপমেন্ট, দরজার হাতল ইউনিফর্মের বোতাম ইত্যাদি। তেরোটাদিন মহা হইচই

আর অস্থিরতার মধ্যে কাটল, চোদ্দোদিনের সকাল থেকে নেমে এল পিন-পতন নীরবতা।

পরিষ্কার করা হয়েছে কিলার ওয়েইলের পিঠ। ঝকঝক করছে এই মুহূর্তে যে-সেন্ট্রি অ্যাডমিরাল ওয়ালেসের পাস পরীক্ষা করছে তার বুট জোড়াও।

কমান্ডার পারকার নিজেও আজ পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরেছেন, কোমরে ঝুলছে হিপ হোলস্টারে পোরা রিভলভার।

'সবকিছু বেশ টিপটপ,' বললেন অ্যাডমিরাল ওয়ালেস। সিঁড়ি ভেঙে ভদ্রলোককে প্রশাসনিক ভবনে নিয়ে যাচ্ছেন কমান্ডার পারকার। 'ভালই চালাচ্ছেন আপনি।'

দরজার সেন্ট্রি সশব্দে অ্যাটেনশন হলো।

পাহাড়টা মেইনল্যান্ডে, দুশো ফুট উঁচু; দু'পাশ থেকে মোটা দুটো প্রাচীর বৃত্ত তৈরির আদলে ক্রমশ ঢালু হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে গেছে। প্রাচীর দুটোর মাথা জলমগ্ন না হয়ে পরস্পরের দিকে বাঁকা হয়ে প্রায় একহাজার গজ এগিয়েছে, তবে পুরোপুরি মিলিত হয়নি—ফাঁকা জায়গাটা শক্ত ইস্পাতের জাল দিয়ে আটকানো। এপাশে বিশাল এক লেগুনের মত চমৎকার অ্যাঙ্কারেজ, ওপাশে খোলা, নীল সাগর।

প্রশাসনিক ভবনটা পাহাড়ের মাথায়। ওটার দু'পাশে ল্যাবরেটরি। সামনে প্যারেড গ্রাউন্ড। প্যারেড গ্রাউন্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে স্লিপিং কোয়ার্টার, রিক্রিয়েশন হল, জিমনেশিয়াম, সিনেমা হল আর দোকান-পাট।

সাজানো ল্যাব, পরিচ্ছন্ন মেস-হল ইত্যাদি সবই খুঁটিয়ে দেখলেন অ্যাডমিরাল ওয়ালেস। সবশেষে কমান্ডার পারকারের অফিসে এসে বসলেন। 'জায়গাটা কেমন তা দেখলাম। এবার শোনা যাক, এখানে গুরুত্বপূর্ণ কী কাজটা হয়।'

মাথার চুল পিছনদিকে সরাবার জন্য হাত তুললেন কমান্ডার পারকার, তারপর মনে পড়ে গেল ওগুলো কেটে ছোট করে

ফেলতে হয়েছে। হাতটা নামিয়ে নেওয়ার আগে টাই অ্যাডজাস্ট করলেন।

'আমাদের এখানে সাত প্রজাতির জেনাস ডেলফিনয়েড আছে, সার,' শুরু করলেন তিনি। 'প্রথমে কমন ডলফিনের কথা ধরুন, আট থেকে দশ ফুট লম্বা। এরপর ধরুন বটলনোজ ডলফিন, একটু বড়, নয় থেকে বারো ফুট। তিন নম্বরে আসে হোয়াইট ওয়েইল, দশ থেকে বারো ফুট। তারপর দাঁতাল হোয়াইট ওয়েইল নারওয়াল, বারো থেকে আঠারো ফুট—একটা মাত্র দাঁত, ছয়ফুট লম্বা। পাইলট ওয়েইল, আঠারো থেকে বাইশ ফুট। বটলনোজ ওয়েইল, প্রকাণ্ড বটলনোজ ডলফিনের মত দেখতে, ছত্রিশ ফুট পর্যন্ত হয়। সবশেষে, এই ফ্যাসিলিটির স্টার, কিলার ওয়েইল—অর্থাৎ গ্র্যামপাস।'

ডেস্কের উপর ঘুসি মারলেন অ্যাডমিরাল ওয়ালেস। 'যিশুর দোহাই, কমান্ডার, আসল কথায় আসুন!' তিন হপ্তা আগে ডাক্তার সাবধান করে দিয়ে ওঁকে বলেছেন, এখনই সিগারেট না ছাড়লে মারা যাবেন শীঘ্রি। সেই থেকে একটা সিগারেটও ছোঁননি ভদ্রলোক, ফলে ওঁর মেজাজ খুব উত্তপ্ত হয়ে আছে। অ্যাডমিরালের মারমুখো চেহারার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন কমান্ডার পারকার, তারপর বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সার, ডলফিন স্তন্যপায়ী প্রাণী, বাচ্চা প্রসব করে। একসময় ওগুলো ডাঙার বাসিন্দা ছিল। ফুসফুসে ওগুলো বাতাসই নেয়।' ওঁর নীল চোখের দৃষ্টি অ্যাডমিরালের লাল চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হলো। বিরতিটুকু ঠিক নীরবতা হয়ে ওঠার সুযোগ পেল না।

'অথচ তারপরও,' দ্রুত বলে যাচ্ছেন পারকার, 'ফুসফুস থেকে আশি ভাগ পানি এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে বের করে দিতে পারে, ভরতেও পারে প্রায় ওই একই গতিতে...'

'আমি জানতে চাইছি, আপনি কাজের কথায় কখন আসবেন!' হুমকির সুরে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল ওয়ালেস।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন কমান্ডার পারকার। 'সোনার। শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবেন, ডলফিন ফ্যামিলির সোনার কতটুকু অ্যাডভান্সড্। দৃষ্টিপথ যেখানে স্বচ্ছ নয়, সেখানেও মাথাটা সামান্য এদিক ওদিক নেড়ে কানের সাহায্যে যে-কোনও জিনিসের আকার আর দূরত্বও জেনে নিতে পারে—ঠিক যেমনটি আমরা চোখ দিয়ে জেনে নিই।

'বিশ্রামের সময়টায় একটা ডলফিন নিচু গলায় বারকয়েক ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ করে পনেরো কি বিশ সেকেন্ড পরপর। এই ধ্বনি কোনও কিছুতে বাড়ি খেয়ে ডলফিনের চোয়াল ও কানে ফিরে আসে। রিডিংটা ইন্টারেস্টিং লাগলে আগের চেয়ে জোরে শব্দ পাঠাতে শুরু করে, যতক্ষণ না জিনিসটার আকৃতি নিখুঁত হয় ও দূরত্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।'

ওঁর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল ওয়ালেস।

'ইন্টেলিজেন্স। মানুষের পর ডেলফিনয়েড প্রজাতিই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। ফলে ওগুলোকে ট্রেনিং দেয়া সহজ। খেলাধুলো খুব পছন্দ করে, কিছু শেখাবার সময় সেটাও খুব কাজে লাগে...'

অ্যাডমিরাল বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাকে না আপনার কিলার ওয়েইলের ট্রেনিং সম্পর্কে ধারণা দেয়ার কথা? এতসব প্যাঁচাল পাড়ছেন কেন?'

'এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, সাধারণ ডলফিন দল বেঁধে কাজ করে, কিলার ওয়েইল একা কাজ করতে পছন্দ করে। কিলার ওয়েইলকে অ্যান্টি-পারসোনেল উইপন হিসেবে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা যাবে বলে আশা করছি আমরা। ট্রেনিং দিয়ে রং নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব; সেক্ষেত্রে যে-কোনও একটা রঙের ডাইভিং সুটকে আক্রমণ করবে, অন্য সুটের প্রতি কোনও রকম বিদ্বেষ দেখাবে না। তা ছাড়া, কিলার ওয়েইল এমনিতেই হিংস্র প্রাণী, কোনও অস্ত্রই লাগবে না ওর। বুঝতেই পারছেন, সার,

খরচও পড়বে অনেক কম।'

'হুম।'

'আমাদের এই ফ্যাসিলিটিতে মাত্র একটা পুরুষ কিলার ওয়েইল আছে। সাত বছর আগে বাচ্চা বয়েসে আমাদের নেভি অ্যান্টার্কটিকা থেকে ধরেছিল। বিশেষ ডায়েট দেওয়ায় ওটার-এখন ওজন সাত টন, দৈর্ঘ্যে আটত্রিশ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি।'

'তার মানে স্বাভাবিকের চেয়ে দশ ফুট বেশি লম্বা?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'জী, সার, তবে গভীর সাগরে এরচেয়েও বড় কিলার ওয়েইল মাঝে-মধ্যে দেখা যায়।'

'বেশ। আমাকে আর কী জানাবার আছে আপনার?'

আবার শুরু করলেন কমান্ডার পারকার।

অ্যান্টি-পারসোনেল ওয়ার্ক-এ ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ওই কিলার তিমিটাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডকে অনুপ্রবেশ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে টের পায় ওটা, যে-কোনও আগন্তুককে পিন-পয়েন্ট করতে পারে, নিজের উপস্থিতি গোপন রেখে অনুসরণ করতে পারে। তাৎক্ষণিক অ্যাকশন দরকার হলে ট্রেনিঙের সময় পাওয়া নির্দেশ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়। অ্যান্টি-পারসোনেল অ্যাকশন শুরু করবার চূড়ান্ত সংকেত—নোঙর করা যে-কোনও জাহাজের খোলের দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে হাত লম্বা করা।

'আপনার লেকচার শুনতে শুনতে আমি না পাগল হয়ে যাই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এত বকবক না করে কিলার ওয়েইলটাকে কী ট্রেনিং দিয়েছেন তার কিছু নমুনা দেখালে হয় না, প্লিজ?' শেষ শব্দটা উচ্চারণ করবার সময় দু'পাটি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে ঘষলেন।

চেয়ার ছাড়লেন কমান্ডার পারকার। সামান্য ঘামছেন তিনি। 'আ-আসুন, সার, আমরা এবার অ্যাঙ্কারেজে নামি।'

প্রশাসনিক ভবনের মূল হলরুমে ফিরে এসে এলিভেটরে

চড়লেন ওঁরা।

'প্রথমে আমরা আপনাকে ডলফিন দেখাব, সার। ওগুলোকে অ্যাঙ্কারেজের একপাশে পেন-এ রাখা হয়েছে । কিলারটা ছাড়া সবগুলো আছে ওখানে। কিলারটা বাইরে কোথাও আছে।'

'বাইরে কোথাও?'

'বাইরে মানে অ্যাঙ্ক্যারেজেই, তবে যেখানে খুশি যাবার স্বাধীনতা আছে। খুব বেশিক্ষণ পেনে আটকে রাখলে মেজাজ গরম করে ওটা, বেয়াড়া হয়ে উঠতে চায়।'

'বিপজ্জনক?'

'হ্যাঁ, তবে অ্যাকটিভ নয়, সার। একটার পেছনে আরেকটা, এভাবে তিনটে হাতিকে একলাইনে দাঁড় করালে যে আকার পাওয়া যাবে, এখানে আমরা অতবড় একটা প্রাণীকে ট্রেনিং দিচ্ছি।'

'আই সি।'

'এই অ্যাঙ্কারেজ পাহারা দেয়াও ওটার ট্রেনিঙের একটা অংশ, সার। অনুপ্রবেশকারীকে খুন করতে পারলে পুরস্কার দেয়া হয়, এ-কাজে আমরা ডামি ব্যবহার করি। রিমোট-কন্ট্রোলড্। অত্যন্ত দামি।'

ভবনের বাইরে রোদ খুব কড়া। পেন এরিয়ায় এসে ডলফিন দেখলেন অ্যাডমিরাল, তবে কিলার সম্পর্কে বলা কমান্ডারের কথাগুলোই সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়।

অবশেষে কমান্ডার বললেন, 'চলুন, সার, এবার তা হলে মনিটরিং রুমে যাওয়া যাক।'

পানির উপর দিয়ে দূরে তাকিয়ে সদ্য রঙ করা জাহাজগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে কমান্ডারের পিছু নিলেন অ্যাডমিরাল, ঢুকে পড়লেন এলিভেটরে। সিগারেটের অভাব তীক্ষ্ণ খোঁচা মারছে তাঁর মগজে।

কন্ট্রোল রুমে ছয়টা মনিটর রয়েছে, ওগুলো অ্যাঙ্কারেজের উপর ও নীচের বাইশটা ক্যামেরার সঙ্গে সংযুক্ত। হাতে একটা

মোবাইল ইন্টারকম নিয়ে কন্ট্রোল-এর কাছাকাছি বসলেন কমান্ডার পারকার।

ইন্টারকমে নির্দেশ দিলেন কমান্ডার। এক নম্বর মনিটরের স্ক্রিনে কংক্রিটের স্লিপওয়ে দেখা গেল, প্রায় খাড়াভাবে পানিতে নেমে গেছে। সাদা কোট পরা বিজ্ঞানী স্লিপওয়ের দিকে হেঁটে এলেন, ক্যামেরার দিকে হাত তুলে সংকেত দিচ্ছেন। 'ঠিক আছে, আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি,' বিজ্ঞানীকে বললেন কমান্ডার। 'ওটাকে এবার ডাকুন, প্লিজ।'

তাঁর পিছনে দাঁড়ানো নাবিকের হাত থেকে একটা লম্বা পাইপ নিলেন বিজ্ঞানী। নাবিকের শুধু একটা পাশ দেখা যাচ্ছে ছবিতে। পাইপ নিয়ে হাঁটু গাড়লেন বিজ্ঞানী, পানিতে ডুবিয়ে ফুঁ দিলেন তাতে। সঙ্গে সঙ্গে ছ'নম্বর মনিটরে ঝাপসা নড়াচড়া ধরা পড়ল। কোনও নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, রিপিট হচ্ছে। এক সেকেন্ডের ব্যবধানে বাকি মনিটরগুলোতেও তা-ই দেখা গেল। একটু পর বিজ্ঞানীর পাশের পানিতে স্থির একটা গাঢ় আকৃতি পরিষ্কার ফুটে উঠল।

'ওটাও দেখছে আমাদেরকে,' বললেন পারকার। 'জানে কোন্ লেন্সে ধরা হয়েছে তাকে, কারণ ক্যামেরায় লাল আলো আছে।' ইন্টারকমে বললেন, 'ওপরে তুলুন ওকে, প্লিজ।'

নড়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। প্রকাণ্ড কালো মাথা পানির উপর উঁচু হলো। কিলারের বাকি অংশ পানির নীচে ঢাকা। বিরাট মুখটা খুলে যাচ্ছে।

'ওটার কামড়ের মাপ তিন ফুট সোয়া সাত ইঞ্চি,' বললেন কমান্ডার, চোখ রেখেছেন মনিটরে—কিলারের মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানী, কোদাল আকৃতির গোলাপি জিভটা হাতের তালু দিয়ে ঘষে দিচ্ছেন। 'দুই চোয়াল তিন ফুট এক ইঞ্চি ফাঁক হতে পারে। দাঁতগুলো ছয় থেকে আট ইঞ্চি লম্বা, সব মিলিয়ে ছাপ্পান্নটা।'

ইন্টারকম থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'ভেরি গুড,' জবাব দিলেন কমান্ডার। 'স্টার্ট ওয়ান, প্লিজ।'

নড়ে উঠলেন বিজ্ঞানী। কালো মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ছ'নম্বর মনিটর, সার।' ছ'নম্বর মনিটরের ছবি বদলে গেল—বড়সড় জাহাজের পিছনে একটা সাদা ভেলা ভাসছে। ভেলার উপর কালো একটা বাক্স, আকারে নয় কিউবিক ফুট হবে।

'প্রায় ঊনচল্লিশ ফুট লম্বা, সাতটন ওজন। ডরসাল ফিন সাত ফুট উঁচু। প্রতিটি ফ্লিপার ছ'ফুট...আবার এক নম্বরে তাকান, সার,' বললেন কমান্ডার।

ভেলা থেকে কালো বাক্সটা নিয়ে এসে স্লিপওয়ের উপর রাখল কিলার। ওটার বিরাট জিভে তালু ঘষে আবার আদর করলেন বিজ্ঞানী, তারপর পুরস্কার হিসাবে খেতে দিলেন এক তাল লাল মাংস। ওঁর সংকেত পেয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

'পাঁচ নম্বরে, সার,' বললেন কমান্ডার পারকার। পাঁচ নম্বর স্ক্রিনে তাকিয়ে গভীর সাগরের তলায় একটা ক্যানিস্টার দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল। 'পঁচিশ দশমিক আট নট স্পিডে সাঁতরাতে পারে, ঘণ্টায় ধরুন পঁয়ত্রিশ মাইল।' ক্যানিস্টারের উপর চলে এল কিলার, এক সেকেন্ড ঝুলে থাকল ওখানে, তারপর ক্যানিস্টারটা মুখে নিয়ে আলোর একটা ঝলকের মত গায়েব হয়ে গেল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরেই এক নম্বর মনিটরে ফিরে এল ওটা, ক্যানিস্টারটা স্লিপওয়েতে তুলছে। আবার তাকে পুরস্কৃত করলেন বিজ্ঞানী।

ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'এপি ওয়ান-এ যান, প্লিজ।' মাউথপিসে কথা বলে অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলেন কমান্ডার। 'চারে তাকান, সার।'

পানির নীচ থেকে তোলা ছবিটায় একটা বোটের তলা ফুটে উঠল। 'ওকে আমরা ছোট ইঞ্জিন ইনভেস্টিগেট করতে শিখিয়েছি, সার।' খুনি তিমি হাজির হলো, ওটার পাশে বোটটা যেন ছোট্ট

খেলনা।

ছলাৎ করে আওয়াজের সঙ্গে বোটের পাশের পানিতে একটা দেহ পড়ল। থেমে গেল খুনি, দেখছে। বোটের পাশ থেকে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে দেহটা, আড়ষ্ট ভঙ্গি, কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করছে না। গুঁতো মারল কিলার, তারপরেও কোনও নড়াচড়া নেই। ওটাকে ছেড়ে দিয়ে বোটের পিছু নিল কিলার। এই সময় আরও তিনটে দেহ পড়ল পানিতে, পড়েই সাঁতরাতে শুরু করল।

'ওগুলো ডামি?'

'ইয়েস, সার; খুব দামি।'

'কোত্থেকে সংগ্রহ করেছেন?'

'আমরা নিজেরাই ডেভলপ করেছি, সার।'

'আই সি।'

হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল তিমি। একমুহূর্ত পর বেল বেজে উঠল, সেই সঙ্গে লাল আলো ফ্ল্যাশ করছে। 'ওটাকে সতর্ক করা হয়েছে,' বললেন কমান্ডার।

মনিটর চারে ফিরে এল তিমি। বোটকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ডামিগুলো, তবে ওগুলোকে কিছু বলছে না।

ইন্টারকমে কথা শেষ করে চেয়ার ছাড়লেন কমান্ডার। 'এখান থেকে আর কিছু দেখার নেই, সার। ডামিগুলো যদি অ্যাঙ্কারেজে নোঙর করা বোটের দিকে এগোয়, আক্রান্ত হবে। আর মাত্র ওই তিনটে ডামিই আছে আমাদের হাতে, তাই ওগুলো নষ্ট করতে চাই না।' কন্ট্রোল রুমে আলো জ্বলে উঠছে। এক এক করে অফ করা হচ্ছে মনিটর।

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। ফ্যাসিলিটিটা কলমের এক খোঁচায় উড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে এখানে ওঁর আসা, কিন্তু এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে নিজের অজান্তেই কমান্ডার পারকারকে সমীহ করতে শুরু করছেন তিনি। 'তবে কিলার ওয়েইলটাকে কাছ থেকে দেখতে চাই আমি।'

একটু গম্ভীর হলেন কমান্ডার। 'সেক্ষেত্রে আমি যেহেতু এক্সপার্ট, আপনাকে আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে, সার—কার কী র‍্যাঙ্ক সেটা মনে রাখলে চলবে না।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

এলিভেটরে চড়লেন ওঁরা। সুযোগ পেয়ে অ্যাডমিরালকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়ে রাখছেন কমান্ডার। 'প্লিজ, আপনার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেন ঠিক থাকে। পানির দিকে ভুলেও হাত বাড়াবেন না। ভুলেও না! কেউ সঙ্গে না থাকলে কিছুতেই পানির কাছাকাছি যাবেন না।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'ওটা কি সত্যি সত্যি ডামি খায়?'

'না, সার। ডামিগুলো যাতে বিস্বাদ লাগে তার ব্যবস্থা করা আছে। আমরা চাই না মেটালের টুকরো ওর পেটের ভেতর ক্ষত সৃষ্টি করুক।'

এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ভরদুপুরের কড়া রোদে বেরিয়ে এলেন দুজন। এক নম্বর মনিটরে যে স্লিপওয়ে দেখেছিলেন অ্যাডমিরাল, এই মুহূর্তে ওটার পাশে একটা প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাচ্ছেন, পানি থেকে বেশ অনেকটা উপরে। জায়গাটা বুক-সমান উঁচু রেইলিং দিয়ে ঘেরা।

ইঙ্গিতে ওটা দেখালেন কমান্ডার। 'ওই পুলপিট থেকে সবকিছু আরও পরিষ্কার দেখতে পাবেন, সার।' ধাপ বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলেন ওঁরা। কমান্ডারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল, বুকে রেইলিং ঠেকবার পর থামলেন, অ্যাঙ্কারেজের নীল জলরাশির উপর চোখ বুলাচ্ছেন। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, ছোটবেলায় নিষিদ্ধ আর বিপজ্জনক কিছু করবার সময় যেমনটি হতেন।

'প্রায় চল্লিশ ফুট মত লম্বা!' বিড়বিড় করলেন তিনি, মাথা নাড়ছেন।

'ডাকুন ওটাকে!' বিজ্ঞানীর উদ্দেশে বললেন কমান্ডার, এখনও নাবিকদের নিয়ে স্লিপওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। কপালে হাত তুলে চোখে ছায়া ফেললেন অ্যাডমিরাল, পানির ঝলমলে সারফেসে দৃষ্টি বুলাচ্ছেন।

আলোর ঝলকানির মত কী যেন নড়ে উঠতে দেখলেন তিনি, একটা জাহাজের পাশে। 'ওই যে, ওদিকে, দেখতে পেয়েছি!' বললেন তিনি, জানেন না ভুল দেখেছেন। কমান্ডারের দিকে খানিকটা ঘুরে গেছেন তিনি, ডান হাত রেইলিঙে, লম্বা করা বাম হাত পানির দিকে তাক করা...

পুলপিটের সরাসরি নীচ থেকে কিলার দেখল লম্বা করা একটা হাত...

'সার!' চেঁচিয়ে উঠলেন কমান্ডার। 'সার, হাত...'

কিন্তু পানি থেকে ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে কিলার, তীব্রবেগে উঠে আসছে আরও।

দৈত্যটার লাফিয়ে ওঠার আওয়াজে রিয়্যাক্ট করতে চাইল অ্যাডমিরালের শরীর, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

কর্কশ জিভের স্পর্শ পেলেন অ্যাডমিরাল, হাঁ করা মুখের উত্তাপ অনুভব করলেন: প্রচণ্ড একটা শক্তি রেইলিঙের উপর যেন আছড়াল ওঁকে। পড়ে যাননি, তবে পিঠটাকে সোজা করতে পারছেন না। শেষ অনুভূতি, গভীর হতাশায় ছেয়ে গেল মন—আরও কিছুদিন যাতে বাঁচতে পারেন সেই আশায় তিন হপ্তা সিগারেট না খেয়ে আছেন!

আসলে কী হয়েছে না-হয়েছে জানতে পারেননি অ্যাডমিরাল ওয়ালেস। তবে কমান্ডার পারকার দেখেছেন।

কামড়ে ধরেই ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা সরিয়ে নিল কিলার, সকেট থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে অ্যাডমিরালের লম্বা করা হাত। সেটা খসে পড়ল মুখ থেকে, কিলারের সঙ্গে পড়ে যাচ্ছে পানিতে।

ওদিকে ডান হাতে এখনও রেইলিং আঁকড়ে ধরে আছেন

অ্যাডমিরাল। ওঁর শরীরের বাম পাশে তৈরি লাল গর্তটা থেকে বিচ্ছিন্ন ধমনীর রক্তধারা যেন কেটলির নল থেকে বেরুচ্ছে, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে দশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ছে। হ্যাঁচকা টানে রেলিঙের উপর উঠে পড়ল ওঁর শরীরের অর্ধেকটা, তারপর সবার চোখের সামনে ডিগবাজি খেয়ে ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে।

কী ঘটতে যাচ্ছে জানেন কমান্ডার, এ-ও জানেন যে কিছুই করবার নেই তাঁর, তা সত্ত্বেও সামনের দিকে এগোলেন। কিন্তু শক্তি পেলেন না হাঁটুতে, তিন পা এগিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন, শক্ত কংক্রিটে ঠুকে গেল মাথা। মুহূর্তের জন্য সবকিছু অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে শুনতে পেলেন গুলির আওয়াজ। তারপর যখন সিধে হলেন, দেখলেন পানিতে অ্যাডমিরালের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

'কিল ইট!' সেন্ট্রির উদ্দেশে চেঁচাচ্ছেন কমান্ডার, যেন হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। 'কিল ইট!' হোঁচট খেতে খেতে স্লিপওয়ের দিকে ছুটলেন, যাচ্ছেন যেখানটায় কিলারকে খেতে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই পুরস্কারের আশায় অপেক্ষা করছে ওখানে।

সত্যি তা-ই। সিমেন্টের কিনারায় ফ্লিপারগুলো আটকে নিয়ে পানিতে ভাসছে ওটা, প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে, প্রকাণ্ড সাদা-কালো মুখ যেন কোনও মূকাভিনেতার।

হিপ হোলস্টার থেকে .৩৮টা টান দিয়ে বের করে নিলেন কমান্ডার পারকার। অস্ত্রটা দু'হাতে শক্ত করে ধরলেন, তারপরেও থরথর করে কাঁপছে সেটা। কিলারকে লক্ষ্য করে তিনটে গুলি করলেন তিনি। প্রথমটা লাগল না। দ্বিতীয়টা নাকের উপরদিকে ছোট্ট একটা খোঁচা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুখের কোণে, চোখের পিছনে, লম্বা আর গভীর গর্ত তৈরি করল তৃতীয় বুলেট।

চেঁচিয়ে উঠল কিলার। উপস্থিত সবাই সেই চিৎকার শুনে আতঙ্কে জমে গেল। কিন্তু না, আক্রমণ না করে ওদের চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

পানির নীচে রক্তের ট্রেইল রেখে ছুটছে কিলার, ভয়ানক দিশেহারা ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ডাইভ দিয়ে গভীরে নেমে এল, খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে।

নেটের কাছে পৌঁছাতে মাত্র চল্লিশ সেকেন্ড লাগল, জন্মসূত্রে পাওয়া সোনার-এ নিরেট পাঁচিল হয়ে ধরা পড়ল ওটা। এবার নামছে, তারপর তির্যক রেখা ধরে উঠতে শুরু করল উপরদিকে।

পানির সারফেস ভেঙে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ মাইল স্পিড। সারফেস থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু নেটের মাথা, দৃষ্টিনন্দন মোচড় খেয়ে সেটাকে টপকাল কিলার, তারপর উন্মুক্ত সাগরে আছড়ে পড়ল চারদিকে কয়েক টন পানি ছিটকে দিয়ে।

দুই

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির লন্ডন শাখা।

সকাল ন'টা, ড্রাইভওয়েতে লিমাযিনটা রেখে সুইংডোর ঠেলে অফিসে ঢুকল মাসুদ রানা। কদিন হলো কিছু ফাইল ওয়ার্ক করতে হচ্ছে ওকে। একঘেয়ে কাজ, তবে আশা করছে আজকের মধ্যেই শেষ করতে পারবে।

নিজের চেম্বারে বসল ও। টাইয়ের নট ঢিল করে প্রথমেই কমপিউটার অন করল। প্রায় কোনও শব্দ না করে ভিতরে ঢুকল ওর সেক্রেটারি, এক মিনিট পর বেরিয়েও গেল। ই-মেইল এসেছে কি না চেক করবার সময় সেক্রেটারির রেখে যাওয়া ট্রে থেকে কালো কফি ভর্তি কাপটা তুলে চুমুক দিল সারধানে।

প্রথম মেইলে চোখ বুলাতেই খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া। যেন

তারস্বরে চিৎকার করছে কেউ:

'আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার! নিড ইয়োর হেলপ! প্রফেসর আদনান মনসুর, ফ্রম আর্কটিক আলাস্কা, অ্যাঙ্কারেজ।'

এক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারল না রানা। তারপর মনে পড়ল সব।

প্রফেসর আদনান মনসুর একজন বাঙালি বিজ্ঞানী। চোদ্দো-পনের বছর আগে 'ফুড অ্যান্ড মেডিসিন ইন দ্য কমন আর্কটিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন' নামে একটা বই লিখে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মহলে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সে সময় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বটানি-র প্রফেসর ও গবেষক ছিলেন তিনি।

বইটা ছাপা হওয়ার পর ভার্সিটির পক্ষ থেকে প্রফেসর মনসুরকে গ্রিনল্যান্ড, অ্যামাজন নদী সংলগ্ন রেইন ফরেস্ট ও অ্যান্টার্কটিকায় গবেষণার জন্য পাঠানো হয় একজন সিনিয়র প্রফেসরের অধীনে। একটানা প্রায় বারো বছর অক্সফোর্ড থেকে দূরে থেকেছেন তিনি, নানা বিষয়ে গবেষণা করে অনেক সাফল্যও পেয়েছেন; কিন্তু মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সরল হওয়ায় ওঁর সেই সব সাফল্য সিনিয়র ব্রিটিশ প্রফেসর কৌশলে আত্মসাৎ করেন।

শ্বেতাঙ্গ নন বলে অক্সফোর্ড থেকে প্রাপ্য সম্মান ও ন্যায় বিচার পেলেন না তিনি। বছর তিনেক আগে শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন প্রফেসর মনসুর। ওঁর একমাত্র সন্তান মনিকা মনসুর মানুষ হয়েছে তার নানীর কাছে। বাবার মত মেয়েও খুব মেধাবী, একই সাবজেক্টে অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করছিল তখন।

সে ছোট থাকতেই স্ত্রী এলিজা-র মাথা খারাপ হয়ে যায়, এবং এক পর্যায়ে তিনি ডিভোর্স করেন প্রফেসরকে। তার কিছুদিন পরেই ভদ্রমহিলা মারা যান।

দেশের প্রতি বরাবরই টান ছিল, ঢাকায় আসবার পর প্রফেসর

মনসুর সিদ্ধান্ত নেন, বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় আর্কটিকে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নিয়ে গবেষণা করবেন, আবিষ্কার করবেন ফলন্ত গাছকে বহুকাল বাঁচিয়ে রেখে তার কাছ থেকে বহুবার ফল বা ফসল আদায় করবার এলিকজার—যাতে বিশ্বের জনসংখ্যা যতই বাড়ুক, খাবারের কোনও অভাব দেখা না দেয়।

এরপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলেন প্রফেসর মনসুর—আর্কটিকে গবেষণার সুযোগ করে দিতে হবে ওঁকে। শুনে তখন অনেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছে—এ যেন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

তবে পরিচিত কোনও এক মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে বিসিআই চিফ রাহাত খানের কানে যখন কথাটা গেল, ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেননি তিনি।

রানাকে ডেকে পাঠিয়ে ভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাহাত খান। সেই প্রথম প্রফেসর মনসুরের নাম শোনে রানা।

দু'দিন পর রিপোর্ট করেছে ও: ভদ্রলোক একটু বোধহয় পাগলাটে, তবে তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাবান তাতে কোনও সন্দেহ নেই—ওঁর লেখা একাধিক বই দুনিয়ার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। গবেষণার ব্যাপারে সিরিয়াস, আত্মবিশ্বাসেরও কোনও অভাব নেই, দেশকে সত্যি ভালবাসেন...

রিপোর্ট পড়ে বিসিআই চিফ বলেছেন: আর্কটিকে নুমার বেশ কটা ল্যাব আছে। ওদের সঙ্গে আলাপ করো, দেখো ওদের কোনও ল্যাবে ওঁকে পাঠানো যায় কি না। ওদের ওখানে যদি কোনও ব্যবস্থা না হয় তখন বিকল্প কী করা যায় ভাবা যাবে।

বিকল্প নিয়ে আর ভাবতে হয়নি, নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন রানার মুখে সব কথা শুনে খুশি মনেই প্রফেসর মনসুরকে ওঁদের একটা আর্কটিক রিসার্চ ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করতে দিতে রাজি হয়েছেন। সেটা আলাস্কার শেষ প্রান্তে, আর্কটিক

মহাসাগরের তীরে, বারো-য়।

বারোয় গিয়ে কাজ শুরু করেছেন প্রফেসর মনসুর, এটুকু শুনেছে রানা, গত তিন বছরে আর কোনও খবর পায়নি। তারপর আজ হঠাৎ এই জরুরি মেসেজ...

বারো নয়, মেসেজটা পাঠানো হয়েছে আলাস্কার অন্য এক প্রান্ত, প্রায় ছয়শো মাইল দূরের অ্যাঙ্কারেজ শহর থেকে। রানার মনে প্রশ্ন জাগল, রিসার্চ ফ্যাসিলিটি থেকে এত দূরে কী করছেন প্রফেসর মনসুর? বলেছেন বিপদের মধ্যে আছেন, অথচ ব্যাখ্যা করে বলেননি কী বিপদ।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। প্রথমে নুমা হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে কথা বলল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে। ওঁর কাছ থেকে বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেল।

বারোর রিসার্চ ফ্যাসিলিটি উড়ে গেছে প্রচণ্ড ঝড়ে, প্রফেসর মনসুরের অ্যাঙ্কারেজে চলে আসবার পিছনে সেটা একটা কারণ। তবে চিন্তার কিছু নেই, একটা নতুন রিসার্চ ফ্যাসিলিটি দাঁড় করাতে যা যা লাগে নুমার সাপ্লাই ডিপো থেকে তার সবই অ্যাঙ্কারেজ শহরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো নিয়ে আবার বারোয় ফিরে যাবেন প্রফেসর মনসুর।

তবে অ্যাঙ্কারেজ শহরে আরও একটা কাজ আছে ওঁর। মাসখানেক আগে সহকারী দরকার বলে একটা বিজ্ঞাপন ছেপেছিলেন। চাকরিটার জন্য অনেকে আবেদন করলেও, অক্সফোর্ড থেকে সদ্য পাস করা নিজের মেয়ের আবেদন-পত্রই গ্রহণ করেছেন তিনি। ইন্টারভিউ নেয়ার জন্যে অ্যাঙ্কারেজে ওকে ডেকেছেন প্রফেসর।

রানা বলল, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার কি সরাসরি কথা হয়েছে, সার?'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তিনি আপনাকে কোনও বিপদের কথা জানাননি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, জানিয়েছেন। বললেন, কয়েকটা দেশের এসপিওনাজ এজেন্ট ওঁর ওপর চাপ দিচ্ছিল—কী আবিষ্কার করেছ দেখাও, তা না হলে খবর আছে। ঠিক এই সময় ঝড়টা এসে সব একেবারে তছনছ করে দিয়ে গেছে।'

'কিন্তু গোপন করার মত কী জিনিস তিনি আবিষ্কার করলেন যে...'

সেল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'প্রফেসর মনসুরের কথা শুনে আমি যতটুকু বুঝলাম, খাবারের নতুন উৎস আবিষ্কার করার জন্যে নানা ধরনের বিপজ্জনক কেমিকেল নিয়ে কাজ করতে হচ্ছিল ওঁকে। দুর্ঘটনাবশত কিছু কেমিকেলের সংমিশ্রণ ঘটে যায়, আর তা থেকে কাকতালীয়ভাবে তৈরি হয়ে গেছে মারাত্মক একটা রাসায়নিক অস্ত্র। তিনি সে-ফরমুলা কাউকে দিতে চান না।'

এক মুহূর্ত বাকরুদ্ধ হয়ে থাকল রানা, তারপর বিড়বিড় করল, 'কী সর্বনাশ!'

'হ্যাঁ, বিপদের কথা,' বললেন নুমা চিফ।

'এরকম পরিস্থিতিতে ওঁর তো বারোয় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না,' মন্তব্য করল রানা।

'সেটা তিনিও জানেন,' বললেন নুমা চিফ। 'আমি ওঁর প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে চাইলে বললেন, তার দরকার নেই, কারণ তুমি ওখানে যাচ্ছ। এ-কথা শোনার পর দুশ্চিন্তামুক্ত হই আমি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে আলাপ শেষ করল রানা। মোবাইল অফ করে এক মুহূর্ত বসে থাকল ও, ভাবছে। প্রফেসর মনসুর ধরেই নিয়েছেন, মেসেজটা পেয়ে আলাস্কায় যাবে ও। শুধু তাই নয়, নুমা চিফের সাহায্যের প্রস্তাবও গ্রহণ করেননি তিনি। তার মানে কি

বিশেষ করে ওকেই তাঁর দরকার?

আবার সেল ফোনের বোতাম টিপল রানা। এবার কথা হলো ওর বস্ বিসিআই চিফের সঙ্গে। পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে কী করতে চায় ব্যাখ্যা করল।

ধৈর্য ধরে সব শুনলেন রাহাত খান, তারপর এককথায় নির্দেশ দিলেনঃ 'গো অ্যাহেড।'

আবার নুমায় যোগাযোগ করে ওর বন্ধু জুনো-র সঙ্গে কথা বলল রানা। আলাস্কা ও উত্তর কানাডার সীমান্তে জন্ম, ডট জুনো ওর একমাত্র এস্কিমো বন্ধু।

সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে কয়েক বছর হলো নুমায় রয়েছে জুনো। রানার নেতৃত্বে কয়েকটা এক্সপিডিশনেও অংশ নিয়েছে। ধীরে ধীরে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

একটা কাজে আলাস্কায় যাচ্ছে, জুনো কি সময় বের করে ওর সঙ্গী হতে পারবে? জানতে চাইল রানা। এ-ও জানাল যে ওখানে বিপদের আশঙ্কা আছে।

প্রস্তাবটা শুনে অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় এস্কিমো তরুণ এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ল, পারলে লাফ দিয়ে ওয়াশিংটন থেকে লন্ডনে চলে আসে। 'আমি তোমার গাইডের চাকরিটা নিলাম, দোস্ত,' সহাস্যে বলল ও। 'আর্কটিক তো হাতের উল্টোপিঠ, আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। কবে রওনা হচ্ছি আমরা?'

'কাল,' বলল রানা। 'তুমি ওয়াশিংটনেই আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ফ্লাইটের সময় পরে জানাচ্ছি।'

প্লেনের জানালায় কপাল ঠেকিয়ে নীচে তাকিয়ে আটলান্টিকের তীরে নিউ ইয়র্ক শহরটাকে দেখতে পেল মনিকা। এখানে নয়, ওদের প্লেন ল্যান্ড করবার কথা ওয়াশিংটনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল, তবে জানে, ঘুম আসবে না। ভাবলেই কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ছে. কত বছর পর আবার দেখা

হবে মানুষটার সঙ্গে!

অ্যাঙ্কারেজ শহরে এমন একজনের কাছে যাচ্ছে মনিকা, যাঁকে ভাল করে চেনে না ও, অথচ ভালবাসে নিজের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে, যাঁর লেখা প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি হরফ ওর পরিচিত, যাঁর উজ্জ্বল ক্যারিয়ার দূর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে এসেছে, যাঁকে আজ প্রায় বারো বছর হলো একবারও দেখেনি ও। তিনি ওর জন্মদাতা পিতা।

সিটের উপর বারবার নড়াচড়া করছে মনিকা। মায়ের কাছ থেকে পাওয়া একরাশ সোনালি চুল মাথার পিছনে পনিটেইল করে বাঁধা। চোখ খুলে কোলের উপর পড়ে থাকা ভারী বইটার কাভারে আরেকবার চোখ বুলাল। সপ্তম সংস্করণ এটা:

ফুড অ্যান্ড মেডিসিন ইন দ্য কমন আর্কটিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন

এস এ মনসুর

ড্যাডিকে শেষবার দেখেছে মনিকা ওর তেরো বছর বয়েসে, মম্-কে কবর দেওয়ার সময়। কালো কোট গায়ে দিয়ে কবরস্থানের এক কোণে একা দাঁড়িয়ে ছিল, তিন বছর পর হঠাৎ দেখতে পেয়ে ড্যাডির দিকে ছুটে যায় ও।

ওকে এগোতে দেখে ইতস্তত একটা ভাব করে ড্যাডি, পরে ও বুঝতে পারে, অন্যমনস্ক মানুষটা চিনতে পারেনি ওকে। পরে অবশ্য ওর সঙ্গে বসে কফি খেয়েছে, বিদায় নিয়ে আবার চলে যাওয়ার সময় ওর কপালে চুমো দিয়েছে। সেই ওদের শেষ দেখা।

তবে চিঠি-পত্র এসেছে, এসেছে জন্মদিনের উপহারও। ওর ষোলোতম জন্মদিনে ড্যাডি অ্যামাযনে ফাংগাস স্টাডি করছিলেন; রিয়ো থেকে লেখা চিঠিতে এমন সব শব্দ আর প্লান্ট-এর নাম ছিল, ওর নতুন বটানি বইয়ে একটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কলেজে উঠে ক্লিয়োপেট্রা নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে খুব প্রশংসা পেয়েছে মনিকা, কলেজের ম্যাগাজিনে পাঁচ কলাম জুড়ে ওর গুণকীর্তন করা হয়; সেটা কেটে আর্কটিকে পাঠিয়ে

দিয়েছে ও।

উত্তরে ড্যাডির কাছ থেকে পাঁচ পাতার একটা আর্টিকেল পেয়েছে। আর্টিকেলটা 'লন্ডন টাইমস' ছেপেছে, তাতে প্রফেসর মনসুরের সারাজীবনের লেখালেখি আর গবেষণার পরিষ্কার একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে, এবং উপসংহারে বলা হয়েছে—সংশ্লিষ্ট মহলে ছড়ানো গুজব সত্যি কি না তদন্ত করে দেখা উচিত, যদি প্রমাণিত হয় যে প্রফেসর মনসুরের আবিষ্কার অন্য কেউ আত্মসাৎ করেছে, তা হলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

অক্সফোর্ড থেকে স্কলারশিপ পেল মনিকা, ড্যাডি তখন অ্যান্টার্কটিকায়। চিঠি লিখে জানিয়েছে ও, তবে সেটা বোধহয় ঠিকানামত পৌঁছায়নি—উত্তর না পাওয়ায় তা-ই ধরে নিয়েছে ও।

তারপর অনার্স পাশ করেছে মনিকা, প্রায় প্রতিটি বিষয়ে ত্রিশ বছর আগে ড্যাডির করা রেকর্ডের কাছাকাছি নম্বর পেয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে হইচই ফেলে দিয়েছে।

এখন ফ্যাকাল্টি অভ সাইন্সের সবচেয়ে মেধাবী পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রী মনিকা; স্টাফ, সার ও ম্যাডামদের চোখের মণি।

মাসখানেক আগে হঠাৎ করেই এক সকালে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে যায় মনিকার। তাতে সাড়া দিয়ে ড্যাডির অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে ও। এক হপ্তা পর মেয়েকে অ্যাঙ্কারেজে ডেকে পাঠিয়েছেন প্রফেসর, বলে দিয়েছেন সঙ্গে করে সার্টিফিকেট আর মার্কশিট নিয়ে আসতে হবে।

শুরুতে ব্যাপারটাকে ভারী মজার একটা অ্যাডভেঞ্চার মনে হলেও, অ্যাঙ্কারেজ যত কাছে চলে আসছে ততই অস্বস্তি ভর করছে মনিকার মনে—ড্যাডি এবারও যদি ওকে চিনতে না পারে?

আবার চোখ বুজল মনিকা। শেষবার দেখা ড্যাডির চেহারাটা স্মরণ করছে। চোখে পানি নিয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। জানে না ঘুমের ভিতরও কাঁদছে ও।

তিন

প্রথমে মনে হলো ওদেরকে স্বপ্নের ভিতর দেখছে। একজন যদি ছ'ফুট হয়, দ্বিতীয় লোকটা পাঁচ ফুট হবে কি না সন্দেহ—এই লোকটার চেহারা এস্কিমোদের মত। একজন সুপুরুষ, সুদর্শন; আরেকজন মুখ হনুমানের কাঁধে বসিয়ে দিলেও মানিয়ে যাবে।

ঘুম আর জাগরণের মাঝখানে, রহস্যময় একটা আলো-ছায়ার ভিতর রয়েছে মনিকা, ওর পাশে ওরা দুজন যেন ঝুলে রয়েছে।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল সুদর্শন প্রথম লোকটা। ইতিমধ্যে ওর নাম জানা হয়ে গেছে মনিকার। 'তুমি দেখছি ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে, জুনো!' ওর পাশে কুঁজো হলো রানা, মনিকা অনুভব করল ওর কোলের উপর কী যেন নড়াচড়া করছে।

'এই...' পুরোপুরি চোখ মেলে ঝট করে সিধে হয়ে বসল মনিকা, কোলের উপর পড়ে থাকা বইটা আঁকড়ে ধরল।

'মেঝেতে এটা পড়ে গিয়েছিল,' বলল রানা, অত্যন্ত মার্জিত ও পরিশীলিত লাগল মনিকার কানে। কোমল একটা সুর আছে কণ্ঠস্বরে, যে শুনবে তারই হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। ইংরেজি উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

'ওহ্,' বলল মনিকা, দিশেহারা বোধ করছে, ঘুমটা এখনও পুরোপুরি ছাড়েনি ওকে। 'ধন্যবাদ।'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'এ বইটার লেখককে আমি চিনি, খুব বড় একজন বাঙালি বিজ্ঞানী।'

'ওঁর কাছেই যাচ্ছি আমি.' বিড়বিড় করে বলল মনিকা।

'আপনার নামটা জানতে পারি, প্লিজ?' রানার অনুসন্ধিৎসু মন কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'মনিকা।'

'জানতে পারি ঠিক কী কাজে আপনি ...'

'ওকে আগে রুমাল দাও,' মৃদু তিরস্কারের সুরে রানাকে বাধা দিয়ে বলল জুনো। 'আমারটা পরিষ্কার নয়।' তারপর মনিকার দিকে ফিরল। 'আপনি আসলে স্বপ্নের মধ্যে কাঁদছিলেন।'

রানার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে পরিষ্কার সাদা রুমালটা নিয়ে চোখ-মুখ মুছল মনিকা, সঙ্কোচে ওদের দিকে তাকাতে পারছে না। বিড়বিড় করে আবার বলল, 'ধন্যবাদ।'

'কিছু যদি মনে না করেন,' বলল রানা, 'আপনি কাঁদছিলেন কেন? মানে, কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

এই সময় আইল ধরে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল নীল ইউনিফর্ম পরা স্মার্ট স্টুয়ার্ডেস। 'আপনারা যে যার সিটে বসে সিটবেল্ট বেঁধে নিন, প্লিজ। আমরা টেক অফ করতে যাচ্ছি।'

রানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল মনিকা, যেন বোঝাতে চাইল, প্রসঙ্গটা নিয়ে আলাপ করতে রাজি নয়।

সিধে হলো রানা, সরে গিয়ে সামনের সারির সিটে বসে পড়ল।

নীচের ঠোঁট কামড়ে রানার মাথার পিছনে তাকিয়ে আছে মনিকা। ওর খুব জানতে ইচ্ছে করছে, সুপুরুষ ভদ্রলোকটির পরিচয় কী। বলছে ড্যাডিকে চেনে...কীভাবে চেনে? কীরকম পরিচয়?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মনিকা, নীচেই টারমাক দেখে বুঝল ওয়াশিংটনে ল্যান্ড করেছে ওরা। তার মানে এরপর শিকাগোতে যাত্রাবিরতি নিয়ে অ্যাঙ্কারেজ শহরে পৌঁছাবে।

আধঘণ্টা পর গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন, গতি পেল প্লেন, তারপর টারমাক ছেড়ে আবার আকাশে উঠল ওরা।

কোল থেকে তুলে নিয়ে আব্বুর বইটা আবার খুলল মনিকা।

আর্কটিক বরফের তলায় সিঙ্গেল-সেল প্লান্ট-এর কী পরিণতি হয় তার বর্ণনা পড়ছে।

শিকাগো থেকে কোনও প্যাসেঞ্জার উঠল না। এরপর অ্যাঙ্কারেজ শহর, রাতের দীর্ঘ যাত্রা শুরু হতে নীরবতা নেমে এল প্লেনের ভিতর। ছাপান্ন ইঞ্চি মনিটরে সিনেমা দেখানো হচ্ছে, তবে মনিকা দেখছে না। ও ভাবছে, ড্যাডির ক্যাম্পটা দেখতে কেমন? আর কারা আছে সেখানে?

চোখ বুজে আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল মনিকা।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে অ্যারাইভাল লাউঞ্জে ঢুকল মনিকা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে আব্বুকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। এত লোক, অথচ ওকে কেউ খুঁজছে বলেও মনে হলো না। বাড়ি থেকে দশ হাজার মাইল দূরে এসে বিপদে পড়তে হবে নাকি!

মনের দ্বিধা আর অনিশ্চয়তা ঝেড়ে ফেলে টার্মিনাল ভবনে চলে এল মনিকা, খোঁজ নিল ইনফরমেশন ডেস্কে। ডেস্ক ক্লার্ক জানাল, তাদের কাছে ওর নামে কোনও মেসেজ নেই।

মেসেজ যদি না থাকে, নিশ্চয়ই ওর জন্য অপেক্ষা করছে কেউ। ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে পরামর্শ করে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহায্য নিল মনিকা। একটু পরেই ওর মিষ্টি কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল অ্যারাইভাল লাউঞ্জের ভিতরে ও বাইরে:

'মনিকা মনসুর বলছি। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একশো বারো নম্বর ফ্লাইটে ইংল্যান্ড থেকে এখানে পৌঁছেছি। ড. আদনান মনসুর কিংবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি যদি এসে থাকেন, দয়া করে টার্মিনাল ভবনের ইনফরমেশন ডেস্কে চলে আসুন...'

প্রবীণ একজন মানুষ, অথচ জনস্রোত ঠেলে এগিয়ে আসবার ভঙ্গিটা এমনই, যেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দিচ্ছে কোনও টাগবোট। চুল আছে শুধু মাথার দু'পাশে, ধবধবে সাদা

দেয়াল যেন, মাঝখানে তামাটে রঙের চকচকে করিডর। চশমার ভিতর কালো চোখ দুটো আজও সেই একই রকম অন্তর্ভেদী। চামড়ার জ্যাকেট দুশো বছরের পুরানো বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না। দাঁতে চেপে ধরা পাইপ থেকে কারখানার চিমনির মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ওঁর স্মরণশক্তির প্রশংসা না করে পারল না রানা, ওকে দেখামাত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভদ্রলোকের চেহারা।

তারপর প্রায় উড়ে কাছে চলে এলেন প্রফেসর আদনান মনসুর। 'তুমি আমাদের সেই ছেলে, মাসুদ রানা—দেশের অতন্দ্র প্রহরী, অ্যাম আই রাইট?' রানার হাতটা ধরে প্রবলবেগে ঝাঁকাচ্ছেন। কাছাকাছি জুনো এসে দাঁড়াতে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

'আমার বন্ধু,' বলল রানা। 'ডট জুনো।'

জুনোর হাতটাও বেশ জোরে ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার প্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ তুমি। ইগলু বানাতে আমি হয়তো তোমার সাহায্য চাইব...'

প্রফেসরকে নিয়ে টার্মিনাল ভবনের নির্জন এক কোণে সরে এল রানা, তারপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারপাশটা। 'মেসেজে আপনি বিপদের কথা লিখেছেন, কিন্তু বিস্তারিত কিছু জানাননি,' কাজের কথা তুলল ও।

'বিপদটা কী বলার আগে, আমাকে বলতে দাও বিপদটা কেন,' বলে লেকচার শুরু করলেন প্রফেসর মনসুর।

ওঁর কথা শুনে রানা যা বুঝল তার সারমর্ম হলো:

বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও বড় বড় বিজ্ঞানীরা যা পারেননি, সাধারণ ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে প্রোটিন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন প্রফেসর আদনান মনসুর।

ওঁর আসল কৃতিত্ব হলো, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন থেকে পাওয়া বিশেষ ধরনের প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান যোগ-বিয়োগ করে, মাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে, শূন্য তাপমাত্রার দশ ডিগ্রি নীচে নির্দিষ্ট সময়

পর্যন্ত রেখে একটা এলিকজার আবিষ্কার। ওঁর এই আবিষ্কার শুধু প্ল্যান্টলাইফ-এর কাজে আসবে। সব জাতের গাছের সম্ভাব্য সব রোগ সারা যাবে ওটা দিয়ে। শুধু তাই নয়, কিছু গাছকে পরমায়ুও দেওয়া সম্ভব বলে আশা করছেন, অন্তত থিওরি বলছে সম্ভব—ধানগাছ একবার মাত্র ধান দিয়ে মরে যাবে না।

এ-সব বিপদের কোনও কারণ নয়।

বিপদের কারণ হলো, অকপটে স্বীকার করলেন প্রফেসর মনসুর, ওঁর অদূরদর্শিতা। দুর্ঘটনাবশত তিনি যে রাসায়নিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছেন সে-কথা নিশ্চয়ই নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটনের কাছে শুনেছে রানা? রাসায়নিক মিশ্রণটা যে মারাত্মক ক্ষতিকর, প্রথম ধরা পড়ে ল্যাবে সংরক্ষিত গম-ভুট্টা-ধান ইত্যাদি গাছের চারা ওটার সংস্পর্শে এসে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে দেখে। ওঁর প্রথম ভুল ছিল, কথাটা গোপন রাখবার কোনও চেষ্টাই করেননি। আশপাশে বেশ কটা দেশের রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে, পরস্পরের ফ্যাসিলিটিতে আসা-যাওয়াও আছে, ফলে অনেক লোকই ব্যাপারটা জেনে ফেলে।

দ্বিতীয় ভুলটা আরও মারাত্মক। কানাডায় বসবাস করেন ওঁর এক বন্ধু, তাঁর গম খেতে ছিটাবার জন্য ওই মিশ্রণের খানিকটা নমুনা একজন পাইলটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন তিনি।

ওঁর বন্ধু দুই একর জমিতে আধ লিটার মিশ্রণ স্প্রে করেন। পরদিন সকালে উঠে খেত দেখতে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত! দেখেন খেতের সমস্ত তাজা চারা শুকিয়ে একেবারে খড় হয়ে গেছে। এক হপ্তা পর এই ফলাফলের খবর সেই পাইলটই নিয়ে আসে বারোতে, আসার পথে কথায় কথায় অনেককেই ব্যাপারটা জানিয়েছে সে।

এরপর থেকেই আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্সসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের ল্যাব থেকে তুখোড় সব ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ এজেন্টরা এসে চাপ দিচ্ছে—কী আবিষ্কার করেছ দেখাও, তা না হলে তুলে নিয়ে যাব।

এই সময় ঝড় এসে গোটা ক্যাম্প, অর্থাৎ রিসার্চ ফ্যাসিলিটি তছনছ করে দিয়ে গেছে। প্রায় কিছুই রক্ষা পায়নি। প্রথম সুযোগেই আহত ক্যাম্প ডিরেক্টরকে নিয়ে নুমার সাপ্লাই সংগ্রহ করবার জন্য চলে এসেছেন তিনি।

'আপনার আবিষ্কার?' জানতে চাইল রানা। 'ফর্মুলাগুলো? বিশেষ করে রাসায়নিক মিশ্রণের?'

'ল্যাব কমপিউটারের হার্ডডিস্ক থেকে যদি কিছু উদ্ধার করতে না-ও পারি, চিন্তার কিছু নেই,' রানাকে আশ্বস্ত করলেন প্রফেসর মনসুর। আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখালেন। 'এখানে সব তোলা আছে—দুটোর ফর্মুলাই।'

অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে মনিকার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ঘোষণাটা শেষ হতে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। 'অক্সফোর্ড থেকে আমার মেয়ে এসেছে, থ্যাঙ্ক গড! আমি যাই, নিয়ে আসি ওকে।'

ড্যাডিকে হনহন করে হেঁটে আসতে দেখে মনিকার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ওর উপর একবার চোখ বুলালেন প্রফেসর, কিন্তু চিনতে পারলেন না মেয়েকে। ইনফরমেশন ডেস্কের কাছাকাছি আর কেউ নেইও, তাই মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে আরেকবার তাকালেন ওর দিকে।

আবেগের লাগাম ছিঁড়ে যাওয়ায় লাফ দিয়ে এগোল মনিকা, ড্যাডির গলা ধরে ঝুলে পড়ল। 'ড্যাডি!'

আড়ষ্ট হলেন প্রফেসর, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যাচ্ছেন। হঠাৎ থমকে গেলেন, তারপর মেয়েকে চিনতে পেরে হেসে উঠলেন। দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন ওকে। 'আরে, মনিকা! আমার মনিকা!'

'ড্যাডি...'

'আচ্ছা, একটা কথা—তুই অ্যাপ্লাই করলি, আমিও চলে আসতে বললাম,' মেয়েকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন

প্রফেসর, 'ব্যাপারটা কীরকম হলো বল্ দেখি!'

'জানতে চাইছ কেন এলাম? আংশিক কারণ, আমার থিসিসের জন্যে। ওটার বিষয়—নির্দিষ্ট কিছু শ্যাওলার ওপর চরম শীত কীরকম প্রভাব ফেলে। তবে আসল কারণ তোমাকে দেখা।'

'কিন্তু মেয়ে নয়, আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার!'

'কিন্তু মেয়ের যদি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার যোগ্যতা থাকে?' জিজ্ঞেস করল মনিকা। 'অক্সফোর্ডে আমি ডায়াটম-এর প্রোটিন লেভেল আর ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন নিয়ে রিসার্চ করছিলাম।'

পাইপ ধরালেন প্রফেসর। 'তার মানে বটানির ফাইনাল পেপারে তুই-ই ছিয়াশি পেয়েছিস?'

'না, ড্যাডি, ওটা তোমার নম্বর। আমি পেয়েছি পঁচাশি তোমার রেকর্ড এখনও অটুট আছে।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রফেসর বললেন, 'মাই গড, বারোয় এমন লোকও আছে, দশ বছর কোনও মেয়েকে দেখেনি!'

'আই ক্যান টেক কেয়ার অভ মাইসেলফ, ড্যাডি।'

'আই হোপ সো। ঠিক আছে, অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা না হয় তোর আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা?'

'নরওয়ে আর গ্রিনল্যান্ডে ফিল্ড ট্রিপস্—চলবে না?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে রানাকে দেখতে পেলেন প্রফেসর, জুনোকে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। 'মনিকা, আয়, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মাসুদ রানা, ডট জুনো। আর এ হলো আমার মেয়ে লিজা আফরোজা, ওরফে মনিকা। ...মনিকা, আমাদের রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওদিকটা দেখতে এসেছে ওরা।'

'আপনার মেয়ের সঙ্গে প্লেনেই আমাদের পরিচয় হয়েছে,' বলল রানা। 'মনিকা, হাউ ডু ইউ ডু?'

মনিকা অনুভব করল তার নরম হাতটা দৃঢ় একটা মুঠোর ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারছে, নার্ভাস হয়ে পড়ায় ওর

চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, গরম হয়ে উঠছে কান দুটো।

রানা হাতটা ছেড়ে দিতে জুনোর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল মনিকা। না, এখন কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

'এবার জরুরি একটা কথা,' বললেন প্রফেসর। 'নুমার প্লেনে আমাদের সাপ্লাই তোলা হচ্ছে, জুনোকে নিয়ে আমি দেখতে যাচ্ছি জনের কোনও সাহায্য লাগবে কি না। মনিকা, তুমি রানার সঙ্গে কফি খেতে যাও।'

'কী?' হতচকিত দেখাল মনিকাকে। 'কেন, ড্যাডি...'

'আমার টিমের যে-সব লোকজন বারোয় আছে তারা যদি জানে যে তুমি আর রানা বন্ধু, তা হলে অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই পাব আমরা।' সচল কনভেয়ার বেল্টের দিকে তাকালেন। 'তোমার ব্যাগটা দেখিয়ে দাও।'

'ওই তো, কালো সুটকেস।'

'গুড। এবার যাও, ওর সঙ্গে কয়েক মিনিট থাকো,' তাগাদার সুরে বললেন প্রফেসর। 'টারমাকে ঢুকবে উত্তর গেট দিয়ে। নুমার নাম লেখা আছে, দেখলেই চিনতে পারবে প্লেনটা।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে রানার পাশে পৌঁছানোর জন্য দ্রুত পা চালাল মনিকা, নার্ভাসনেস যাতে ওকে কাবু করতে না পারে।

ছোট একটা কফি শপে বসে অর্ডার দিল ওরা। কাপে মাত্র চুমুক দিয়েছে, মনিকা দেখল ভিড় ঠেলে হন হন করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে জুনো।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল মনিকা।

চোখে-মুখে রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল জুনো। 'রানা, বিপদ হয়েছে। ওখানে জন অস্টিনকে দেখলাম।'

স্থির হয়ে গেল রানা, তারপর ঝট করে ঘাড় ফেরাল। 'কোথায়?' হঠাৎ করে ওর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠেছে।

মনিকার দিকে চোখ রেখে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল জুনো, তারপর বলল, 'প্লেনে।'

'প্লেনে মানে?'

'নুমার প্লেনে,' বলল জুনো। 'গত দু'বছর ধরে বারোয় নুমার ক্যাম্প ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে অস্টিন। অর্থাৎ...বুঝতে পারছ?'

'হুঁ, আমার সঙ্গে সেই গোলমালটা হবার পর,' বলল রানা, 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কাউকে কিছু না জানিয়ে ওকে তা হলে এই শাস্তিই দিয়েছেন—যাও, ঠাণ্ডা নরকে গিয়ে মরো?'

'নিশ্চয়ই তা-ই।'

'আমি দেখি ড্যাডি কী করছে,' চেয়ার ছেড়ে বলল মনিকা, কারও ব্যক্তিগত ঝগড়া-ফ্যাসাদ শুনতে চায় না। কিন্তু ওর কথা দুজনের কারও কানে গেছে বলে মনে হলো না।

উত্তর গেট দিয়ে টারমাকে ঢুকল মনিকা। নুমার প্লেনটা ছোট। ওটাই ওদেরকে উত্তরে, বারোয় নিয়ে যাবে। সাপ্লাই তোলার কাজ এরইমধ্যে শেষ হয়েছে।

মনিকা দেখল, এখানকার পরিবেশেও উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে; স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী এক লোক তর্ক করছে ওর ড্যাডির সঙ্গে। লোকটার চোখের নীচে কালি জমেছে, বাম গালে তাজা ক্ষত, ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ।

'আমাকে কিছু না জানিয়ে কাজটা কেন আপনি করতে গেলেন, প্রফেসর?' জানতে চাইল লোকটা, গলায় অসন্তোষ। 'আমি আপনার ক্যাম্প ডিরেক্টর, আমাকে আপনি জানাবেন না সিকিউরিটির দিকটা দেখার জন্যে আপনার একজন এক্সপার্ট ইনভেস্টিগেটর দরকার? কিংবা কাকে আপনি ক্যাম্পে ডাকছেন?'

'তোমাকে জানানোটা গুরুত্বপূর্ণ, আমার তা মনে হয়নি,' বললেন প্রফেসর মনসুর। 'তা ছাড়া, যদি জানাতামও, তা হলেই বা কী হত? মাসুদ রানাকে ডাকছি শুনে তুমি আপত্তি করতে? কিন্তু কে বলল তোমার সেই আপত্তি আমি কানে তুলতাম?'

'শুধু আপত্তি তুলতাম না, কারণটাও ব্যাখ্যা করতাম,' বলল লোকটা। 'তা হলে আপনিও বুঝতে পারতেন, রানা আর আমি কী কারণে কোনও প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করতে পারব না।'

'ঠিক আছে, দেরিতে হলেও শোনা যাক কারণটা,' বললেন প্রফেসর। 'সত্যি যদি বোঝাতে পার কেন তোমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না, আমি বিকল্প উপায় খুঁজে নেব।'

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে,' বলল লোকটা। 'তা ছাড়া, একজন ভদ্রমহিলার সামনে সে-সব বলা উচিত হবে না।'

এতক্ষণে মনিকার উপস্থিতি টের পেলেন প্রফেসর মনসুর। 'এসো, মনিকা, তোমার সঙ্গে আমার ক্যাম্প ডিরেক্টরের পরিচয় করিয়ে দিই। জন অস্টিন, আমার মেয়ে মনিকা—ওকে আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি।'

ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটাই মনিকার দিকে বাড়িয়ে ধরল অস্টিন।

'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করল মনিকা।

'তুমি আমাকে জন বললেই খুশি হব, মিস মনিকা,' বলল অস্টিন, গলার আওয়াজ থেকে ক্ষোভের সুর দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। 'যেমন দেখছ তেমনি আছি—মচকেছি, তবে মাথা নোয়াইনি।' মনিকার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখছে সে—আচরণটা অশোভন হলেও গ্রাহ্য করছে না।

'আপনার মুখেও ব্যান্ডেজ দরকার, অস্টিন,' বলল মনিকা।

'আচ্ছা, ফার্স্ট এইডেও ট্রেনিং নেয়া আছে বুঝি? তুমি আমাদের বিরাট অ্যাসেট হতে যাচ্ছ। হ্যাঁ, ডাক্তারও বললেন কথাটা। ধন্যবাদ। তবে তোমার ড্যাডি এ-সব খেয়াল করেন না। ওঁর তো দুনিয়ার কোনও ব্যাপারেই আগ্রহ নেই, শুধু ভাসমান ফুলগুলো ঠিক থাকলেই হলো।'

'ড্যাডির কাজের ধারা আপনি অপছন্দ করেন বুঝি?' জানতে চাইল মনিকা।

'গড হেভেনস্, নো! তোমার ড্যাডির কাজ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই আমার জানা নেই। প্ল্যাঙ্কটন থেকে পপিকে আলাদা করতে বললে পারব না, এত কম জানি। তবে এটা ঠিকই জানি, রাবার বোটে চড়ে সচল আইস শিট থেকে দুধের বোতলে সবুজ আঠালো পদার্থ সংগ্রহ করা স্রেফ পাগলামি। তাও আবার প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে।'

'ওখানে কি সব সময় ঝড় হচ্ছে?'

নিঃশব্দে হাসল অস্টিন। 'সব সময় নয়। আর দুধের বোতলও আমরা ব্যবহার করি না।'

প্রফেসর মনসুরের নরম একটা হাত পড়ল অস্টিনের কাঁধে। 'অস্টিন...'

লম্বা-চওড়া শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, চোখ থেকে মুছে যাচ্ছে হাসি, ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অস্টিন। প্রফেসরের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে হেঁটে আসছে রানা ও জুনো।

শান্ত থাকল অস্টিন, তবে মনিকা দেখল একটু একটু কাঁপছে ওর শরীর।

কাছে এসে হাত বাড়ালো রানা। 'হাই, অস্টিন। তুমি যে বারোর ক্যাম্প ডিরেক্টর, সেটা আমার জানা ছিল না।'

হাতটা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল অস্টিন। 'আমাকেও কেউ জানায়নি তোমাকে এখানে ডাকা হয়েছে,' বলল ও, গলার আওয়াজ কাঁপা কাঁপা, ঘৃণা মেশানো। জুনোর দিকে হাত বাড়াল। 'কেমন আছ, জুনো?'

'ভাল, অস্টিন,' বলল জুনো, বাড়ানো হাতটার দিকে চাইল, কিন্তু নিজের হাত বাড়াল না। 'তোমাকে ভয়ানক দেখাচ্ছে। ক্যাম্পে সমস্যা?'

'আর বোলো না।' হাতটা নামিয়ে নিল অস্টিন। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে জুনো কার দলে।

এরপর নীরবতা।

রানার নির্বিকার চোখের দিকে অস্টিন এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন হিংস্র কোনও জন্তু আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'শোনো,' প্রফেসর মনসুর বললেন, হঠাৎ করে কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল ওঁর কণ্ঠস্বরে। 'তোমরা দুজন চিন্তা করে দেখো একসঙ্গে কাজ করতে পারবে কি না। অতীতে যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, সেটা ভুলে যাওয়া সম্ভব?'

কেউ কথা বলছে না।

'ফর গড'স সেক,' আবার বললেন প্রফেসর, 'তোমাদের দুজনকেই আমার দরকার। অস্টিনের মত সৎ, দক্ষ আর পরিশ্রমী ক্যাম্প ডিরেক্টর আমি পাব না। আর রানাকে ডাকার উদ্দেশ্য হলো, আমার সারাজীবনের সাধনার ফল ওর হাতে তুলে দেব, ও যাতে সেটা দেশে পৌঁছে দিতে পারে। তোমাদেরকে আমি বন্ধু হতে বলছি না, বলছি একসঙ্গে কাজ করতে। পারলে ভাল। না পারলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'আমার কোনও অসুবিধে হবে না,' বলল রানা।

'অস্টিন? তুমি কি হেডকোয়ার্টারে ফিরবে, না বারোয়?'

'বারোয়,' বিড়বিড় করে বলল অস্টিন।

'গুড। তোমাদের মধ্যে যা-ই হয়ে থাকুক, সেটা আপাতত ভুলে থাকাই ভাল।'

গলার ভিতর দুর্বোধ্য, হিংস্র একটা আওয়াজ করল অস্টিন। 'অসম্ভব! আমার যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা কোনওদিন পূরণ হবার নয়, কক্ষনো আমি...' প্লেনের দিকে এগোল ও, কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'অস্টিন, এখনই সিদ্ধান্ত নাও রানার সঙ্গে তুমি কাজ করতে পারবে কি না,' ওর পিছন থেকে আবার বললেন প্রফেসর। 'না পারলে বারোয় যাবার দরকার নেই তোমার।'

অস্টিন তাকাল না, তবে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

ওর ঘাড়ের পিছনদিকে তাকিয়ে আছে রানা, কপালে চিন্তার রেখা।

চার

অ্যাঙ্কারেজ এয়ারপোর্ট থেকে সাপ্লাই ও প্যাসেঞ্জার নিয়ে রওনা হলো নুমার প্লেন। কো-পাইলট বব হোমার চালাচ্ছে।

পাইলট নাথান রিড একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারেন, যেমন এই মুহূর্তে চুইংগাম চিবাবার ফাঁকে শিস দিচ্ছেন আর ধূমপান করছেন।

দুজনের বয়স আর অভিজ্ঞতায় বিরাট ফারাক, সেজন্যই বোধহয় পিতা-পুত্রের মত একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে; পাইলট শেখাচ্ছেন আর অথর্ব হয়ে পড়ছেন, কো-পাইলট শিখছে আর পরিণত হচ্ছে।

কেবিনে আরাম করে বসে আছে পাঁচজন প্যাসেঞ্জার। ঊনত্রিশ ফুট লম্বা ওটা; প্রতি সারিতে ছ'টা করে সিট, সব মিলিয়ে তিনটে সারি, দুটো সারি প্লেনের বাম দিকে, একটা ডানদিকে। ওদের বেশিরভাগ লাগেজ পিছনের খালি সিটের উপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে।

জোড়া ইঞ্জিনের একটানা গুঞ্জনে মাথা ধরে গেল মনিকার। নরম সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকল ও।

রানার কথা ভাবছে মনিকা। আশ্চর্য মানুষ! যেই বুঝেছে কাছাকাছি এলে ওর ভিতর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়, সেই থেকে সতর্কতার সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখছে।

জন অস্টিনকে খারাপ লাগেনি ওর। আত্মবিশ্বাসী মানুষ। সপ্রতিভ। চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা-শরম কি একটু কম? হলেও, সেটা খুব একটা দোষের বলা যায় না, বিশেষ করে বছরের পর বছর যদি একা থাকতে হয়।

আচ্ছা, রানার সঙ্গে ওর দ্বন্দ্বটা কী নিয়ে? থাক, এ-সব নিয়ে ওর মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

জুনোর কথা ভাবল। এ-ধরনের মানুষকে খোলা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, চোখ বুলাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি চেনা যায়। মুখের হাসি কখনও ম্লান হয় না, চোখে কৌতুকের ঝিলিক, শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর—কল্পনায় একজন এস্কিমোকে যেমন দেখেছে, হুবহু তেমনি একজন মানুষ।

আর ড্যাডি। সামান্য উত্তেজনা আর অমূলক ভয় নিয়ে মনিকা ভাবল, এক্ষেত্রেও কি ওর স্বপ্নের চরিত্র বাস্তবে রূপ নিচ্ছে? সহৃদয়, অমায়িক, ক্রিয়েটিভ, কিন্তু নিজের বিষয় ছাড়া বাকি সব ব্যাপারে আনাড়ি। যেন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে উর্বর একটা মস্তিষ্ক।

রিফুয়েলিঙের জন্য ফেয়ারব্যাঙ্ক এয়ারপোর্টে নামল প্লেন। সময়ের অপচয় বলে মনে হলো মনিকার। অ্যাঙ্কারেজ থেকে ট্যাংকে আরও বেশি ফুয়েল ভরে নিলে এই অপচয় ঠেকানো যেত। ওর ধারণা কাঠের বাক্সগুলোতে এমন অনেক ফালতু জিনিসও আছে, যেগুলো ফেলে গেলে ওর ড্যাডির কোনও সমস্যা হত না।

পেট্রলভর্তি ট্রাকের পিছু পিছু আরেকটা গাড়ি এল স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে। প্লেন থেকে না নেমেই খাওয়াদাওয়া সারল ওরা।

রিফুয়েলিং সেরে আবার ফাঁকা আকাশে উঠে এল প্লেন। গ্যাঙওয়েয়ের ওদিকের সিটে বসা প্রফেসর মনসুরের দিকে তাকাল রানা। একটা বইয়ের ভিতর নাক ডুবিয়ে আছেন।

'ক্যাম্পটার এখন কী অবস্থা, সার?' জানতে চাইল ও।

'এখন তো স্রেফ আবর্জনার স্তূপ,' বই থেকে মুখ তুলে বললেন প্রফেসর মনসুর। 'ঝড়টা সব একেবারে তছনছ করে দিয়ে গেছে।

তার ওপর আগুন...'

'আগুন লাগল কীভাবে?'

'নিশ্চয়ই স্টোভ থেকে লেগেছে,' বললেন প্রফেসর। 'প্রথমে ভয়ের কিছু ছিল না, শুধু দুটো হাট-এ লাগে; কিন্তু তারপর একটা জেনারেটর পুড়ে গেল। আর্কটিক ঝড়ের মধ্যে আগুন যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তারচেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। একজন মারা গেল। দুজন লোক মারাত্মক আহত হলো। আমরা সবাই কম-বেশি জখম হয়েছি, শুধু অস্টিন একটু বেশি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সকালে দেখি সমস্ত জিনিস-পত্র চারদিকে ছড়িয়ে আছে, বেশিরভাগই জমে বরফ। সাহায্য পৌঁছাতে দেরি হয়নি, বছরের এ-সময়টায় অনেকেই ক্যাম্প করে ওখানে। কিন্তু বেশিরভাগ সাহায্যই ফিরিয়ে দিতে হয়েছে—যারা আমাকে হুমকি দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে তো আর সাহায্য নিতে পারি না।'

'যেটুকু রক্ষা পেয়েছে,' বলল রানা, 'আপনি চলে আসায় চুরি হয়ে যাবে না? কেউ যদি আবর্জনার স্তূপ থেকে একটা হার্ডডিস্ক বের করে নেয়?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর মনসুর। 'কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে পাহারায় রেখে এসেছি।'

'ড্যাডি, সাপ্লাই বলতে কী কী নিয়ে যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল মনিকা।

'তাঁবু,' বলল অস্টিন, যেন কাগজে চোখ রেখে একটা তালিকা পড়ছে, 'কলাপসিবল ক্যানু, স্লিপিং ব্যাগ, কম্বল, পারকা, রাইফেল, অ্যামিউনিশন, সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, পোর্টেব্‌ল টয়লেট, রশি, হার্পুন গান, হার্পুন, নেট, ডিনামাইট। খাবারের মধ্যে আছে—টিনে ভরা মাংস, ভেজিটেবল, মাছ, ফল, জুস, কোল্ড ড্রিঙ্কস ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় দু'টন। বারোর জন্য মাত্র হপ্তাখানেকের রসদ।'

'সত্যি কথা বলতে কি, নুমার এই জেটটাই আমাদেরকে

বাঁচিয়ে রেখেছে,' সস্নেহে বললেন প্রফেসর মনসুর, আঠারোটা সিটসহ প্লেনের ভিতরটা একবার দেখে নিলেন। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম। শুধু পরিবহন নয়, স্টাফসহ সমস্ত ফ্যাসিলিটি নুমার কাছ থেকে পাচ্ছি। তবে সাপ্লাই-এর টাকা বাংলাদেশ সরকার বহন করে।'

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'সারাজীবন শুধু ঋণই করে গেলাম, জানি না সে-সব কীভাবে কতটুকু শোধ করতে পারব।' তারপর সম্ভবত আকস্মিক আবেগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন।

দু'মিনিট পর মনিকা দেখল পকেট ক্যালকুলেটার খুলে অঙ্ক কষছেন প্রফেসর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। নীচে আদিগন্ত তুন্দ্রা অঞ্চল—মাইলের পর মাইল গাছবিহীন জলা।

দেড় ঘণ্টা পর বারোয় ল্যান্ড করবার জন্য প্লেন যখন বাঁক নিচ্ছে, নীচের একঘেয়ে দৃশ্যটা বদলে গেল। সামনে আর্কটিক মহাসাগর। পরিষ্কার আকাশের একেবারে মাথায় উঠে এসেছে সূর্য।

দৃষ্টি তুলে দিগন্তের দিকে তাকাল মনিকা। হঠাৎ করেই উজ্জ্বল একটা আলো ওর চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিল। চোখ মিটমিট করল ও, তারপরেও আলোটা সয়ে এল না। ওদের প্লেন বাঁক ঘোরাটা সম্পূর্ণ করছে, ফলে কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা হয়ে যাচ্ছে আলোর রঙ। ওর মনে হলো, দুর্লভ নীলকান্তমণি আর সবুজ পান্না দিয়ে তৈরি একটা মুকুট দুনিয়ার মাথার উপর বসিয়ে দিয়ে গেছে কোনও দানব।

'কী ওটা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল মনিকা, দৃশ্যটার সৌন্দর্য মুগ্ধ করে ফেলেছে ওকে। এক সবুজই কত বিচিত্র রূপে ধরা দিচ্ছে, কোথাও অসম্ভব গাঢ়, কোথাও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, কোথাও ম্লান, আবার কোথাও অনেক বেশি গভীর, অথচ ভিতরে দৃষ্টি চলে; আর নীলেরও কতরকমের বাহারি রূপ, এক জায়গায় আকাশী, কোথাও প্রায় সবুজ হয়ে ওঠার প্রবণতা—সবগুলো রঙই নৃত্যরত

শিখা, সূক্ষ্ম সোনার কাজ দিয়ে ঘেরা।

'ওটাই তো প্যাক,' বলল রানা, মনিকার পিছনে চলে এসেছে।

'আজ তোর জন্মদিন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর মনসুর। 'মনিকা, আমাকে মনে করিয়ে দিসনি কেন?'

'ড্যাডি, ওটাকে আমি আরও ভাল করে দেখতে চাই,' ব্যাকুল সুরে আবেদন জানাল মনিকা, এখনও যেন সেই ছোট্ট খুকিটি।

'কী? ও। হ্যাঁ। উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই। সোজা পাইলটের কাছে চলে যা। গিয়ে বল আমি পাঠিয়েছি।'

জানালার কাছ থেকে সরে এসে সিট ছাড়ল মনিকা, সাবধানে সিধে হয়ে ককপিটের দিকে এগোল। প্যাসেজের শেষ মাথায় নীল পরদা ঢাকা দরজা, চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দু'দিকে দুটো দরজা দেখল—একটা টয়লেটের, অপরটা ককপিটের। স্লাইডিং ডোরটা সামনে, ওটা দিয়ে ককপিটে ঢোকা যায়।

নক করে ককপিটে ঢুকে মনিকা দেখল ছোট্ট কামরাটা ধোঁয়ায় ভরে আছে। পাইলটের ঠোঁটের বাম কোণ থেকে সিগারেট ঝুলছে, চোখ সরু করে প্লেন ল্যান্ড করাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি, একটা হাত কন্ট্রোল প্যানেলে, দ্বিতীয় হাত থ্রটলে।

কো-পাইলট রেডিও অন করে কথা বলছে বারো ফিল্ডের সঙ্গে, সেই সঙ্গে ফ্ল্যাপ ও ল্যান্ডিং-গিয়ার নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'এক্সকিউজ মি,' বলল মনিকা, খানিকটা বিভ্রান্ত। ককপিট একটু কাত হয়ে আছে। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে অপরূপ দেখাচ্ছে প্যাক আইস, ধীরে ধীরে এক কোণে সরে যাচ্ছে।

'ইয়েস, ম্যাডাম?' ঘাড় ফিরিয়ে মনিকার দিকে তাকাল কো-পাইলট বব হোমার। 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। প্যাক আইস কি খুব কাছ থেকে দেখা সম্ভব?'

এক পলকের জন্য কন্ট্রোল প্যানেল থেকে চোখ তুলে সামনেটা দেখে নিলেন পাইলট নাথান রিড। কোনও রকম দ্বিধা না করেই বললেন, 'কেন সম্ভব নয়। ওকে, বব, বারোকে জানাও।

আপনি কি ককপিটে থাকবেন, মনিকা? এখান থেকে খুব ভাল দেখতে পাবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এখান থেকেই দেখতে চাই।'

বাল্কহেডের গায়ে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়াল মনিকা। প্যাকটা দ্রুত ফিরে আসছে দৃষ্টিপথে। একসময় ওটার দিগন্ত চিহ্নিত করা গেল। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে কয়েক শো মাইল জুড়ে ছড়ানো বিরাট সব ভাসমান আইসফিল্ড নিয়ে তৈরি পোলার প্যাক।

ঘণ্টায় চারশো নট স্পিডে ছুটছে প্লেন, পথ তৈরিতে সহায়তা করছে দখিনা বাতাসের বিরতিহীন প্রবাহ। অপলক দৃষ্টিতে নীল-সবুজ আগুনটাকে কাছে চলে আসতে দেখছে মনিকা। খানিক পর দৃশ্যটা বদলে যেতে শুরু করল; প্রথমে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আগুন, আত্মপ্রকাশ করল প্রকাণ্ড আকারের অসংখ্য বরফ, সাগরে গা ডুবিয়ে আছে প্রতিটি—অনেক দূরে বলে তরল ফোঁটার মত দেখাচ্ছে।

কোনটা ছোটখাট পাহাড়, কোনটা স্টেডিয়ামের মত সমতল, এরকম কোটি কোটি বরফের খণ্ড দিয়ে প্যাকটা তৈরি। প্যাকের সারফেস দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্গম জায়গা।

নরওয়ে আর গ্রিনল্যান্ড অভিযানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে মনিকার—তাঁবু আর ইগলুতে জীবনযাপন, সিল ও পোলার বিয়ার শিকারে বেরিয়ে বিপদে পড়া, সিলস্কিনে মোড়া কাইয়্যাক-এ চড়ে একা মাছ ধরতে যাওয়া। আর সেই এস্কিমোরা—চ্যাপ্টামুখো, হাসিখুশি, অতিথিবৎসল, সামাজিক। পায়ের পাশে গর্ত কিংবা ফাটল, তাকিয়ে থাকলে সি-লায়ন, সিন্ধুঘোটক বা তিমি দেখা যায়।

এ-সবই বিপুল পরিমাণে আছে প্যাকে, আর সেই প্যাকই রাজকীয় ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ করে ডান দিকে, প্যাকের একেবারে কিনারায়, জলকণার ঝকমকে একটা বিস্ফোরণ লাফিয়ে উঠল শূন্যে।

কেবিনের ভিতর থেকে বিজ্ঞানীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে

এল, 'ওই দেখো পানি ছিটাচ্ছে!'

'আমরা ওটার পিছু নিতে পারি না?' পাইলটকে জিজ্ঞেস করল মনিকা।

'ওকে,' বললেন রিড। 'বব, তুমি প্লেন চালাও। খানিকটা নীচে নামো, তা হলে ভাল ভাবে দেখা যাবে।'

তির্যক একটা পথ ধরল প্লেন। মুহূর্তের জন্য গায়েব হয়ে গেল দিগন্ত। সাগরের আরও একটু কাছাকাছি চলে এল ওরা। অকস্মাৎ উথলে উঠল পানি, বিপুল আলোড়নের মধ্যে দৈত্যাকার তিমিটার ইস্পাত-নীল পিঠ দেখা গেল, এখনও জলস্রোতে ঢাকা।

'এত বড় নীল তিমি আগে কখনও দেখিনি আমি,' কেবিন থেকে ভেসে এল রানার বিস্মিত গলা।

'একশো ফুটের বেশি, একশো টনেরও বেশি,' বলল জুনো।

ঠিক ওই মুহূর্তে ওদের ভাগ্যে নেমে এল বিপর্যয়, তবে কেউ ওরা খেয়াল করল না।

কো-পাইলট বব হোমার দেখল ককপিটের উইন্ডস্ক্রিন হিসাবে কাঁচের বদলে যে পারসপেক্স ব্যবহার করা হয়, তাতে বরফের সূক্ষ্ম কণা ঘষা খাচ্ছে। পাইলট নাথান রিড ঘাড় ফিরিয়ে মনিকার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন।

তিমিটার উপর দিয়ে উড়ে এল ওরা। বাঁক নিতে শুরু করল কো-পাইলট।

কোনও কারণ ছাড়াই এয়ার-স্পিড ইন্ডিকেটরের কাঁটা উপর দিকে উঠে গেল। ওটায় চোখ বুলাল কো-পাইলট, দেখল উপরে উঠলেও স্থির হয়ে আছে কাঁটাটা। ল্যান্ড-গিয়ার নামাল ও, ফ্ল্যাপও নামাল। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়বার নীল তিমির উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় প্লেনের স্পিড যতটা পারা যায় কম রাখা। ধীরে ধীরে থ্রটল পিছিয়ে নেওয়ায়, ইঞ্জিনে ফুয়েল সাপ্লাই কমে যাচ্ছে। থ্রটল-ভালভ আর জেট-এর মাঝখানে রয়েছে ফিল্টার সিস্টেম, ফুয়েলের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এল সেখানেও।

বিপর্যয় বয়ে নিয়ে এল রুদ্রমূর্তি উত্তুরে ঝঞ্ঝা, প্যাকের উপর দিয়ে ধেয়ে আসছে, ভরাট হয়ে আছে শূন্যাঙ্কের চেয়েও বহু ডিগ্রি বেশি ঠাণ্ডা সূক্ষ্ম বরফ কণায়।

মনিকার উপর থেকে চোখ সরিয়ে তিমিটার দিকে তাকালেন পাইলট। হঠাৎ করেই মনের কানাচে অস্বস্তিকর একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধল। নিরাপদ, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হোমারকে প্লেন ল্যান্ড করাবার দায়িত্ব দিতে কখনোই ইতস্তত করেন না তিনি। কিন্তু আজ প্লেনের মতিগতি লক্ষ করে ওঁর হাতের তালু শিরশির করে উঠল, প্লেনের নিয়ন্ত্রণ এই মুহূর্তে হোমারের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার তাগাদা অনুভব করলেন। তবে ককপিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবার পরেই কেবল উপলব্ধি করলেন কী ধরনের সংকটে তাঁরা পড়েছেন।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আইস-ক্রিস্টাল লেগে ঝাপসা হয়ে গেল জানালা।

'সর্বনাশ! আমরা জমে যাচ্ছি!' কাত হয়ে বাইরে, প্লেনের পিছনদিকে তাকালেন পাইলট রিড। ডানাগুলোর কিনারায় এরইমধ্যে পুরু হয়ে বরফ জমেছে, ইঞ্জিন ইনটেকগুলোকে মোটা আর পিচ্ছিল দেখাচ্ছে।

'বব। প্লেন ওপরে তোলো...' আতঙ্কিত নন পাইলট। বরফ এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বিপজ্জনক, তবে মারাত্মক নয়। 'মনিকা, কেবিনে ফিরে গিয়ে আরাম করে বসুন, প্লিজ,' বললেন তিনি। 'উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। বব, ফ্ল্যাপ টেনে নাও, প্লিজ। আন্ডারক্যারিজ আপ...'

কেবিনে ফিরে এসে সামনের জোড়া সিটটায় ধপ করে বসে পড়ল মনিকা। চোখ-মুখ কালো হয়ে আছে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর মনসুর, মেয়ের দিকে তাকালেন প্যাসেজের ওদিক থেকে।

'জানি না। এখন বোধহয় ঠিক হয়ে...' ইঞ্জিন খক্‌খক্‌ করে

ওঠায় থেমে গেল মনিকা।

প্লেন ঝাঁকি খেল না, সাবলীল গতিতে এতটুকু বিঘ্নও সৃষ্টি হলো না; শুধু জোড়া ইঞ্জিনের ধারাবাহিক যান্ত্রিক গুঞ্জনে মাঝে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী অথচ স্পষ্ট ছেদ পড়ছে। প্রতিটি ইঞ্জিন আলাদাভাবে খক্‌খক্ করছে, তবে ধীরে-সুস্থে, যেন দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বক্তা গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে। তারপর-সাবলীল ভঙ্গিতে, অগভীর বাঁকা পথ ধরে আরও উপরে উঠতে শুরু করল প্লেন।

নীরব কেবিনে জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকম, যেন নখ দিয়ে বোর্ড আঁচড়াল কেউ। 'সত্যি আমরা দুঃখিত, লেডি অ্যান্ড জেন্টেলমেন—সামান্য একটু সমস্যা দেখা দিয়েছিল...'

আবার কেশে উঠল ইঞ্জিন, আওয়াজটা আগের চেয়ে চড়া, যেন মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

'অ্যান্টি-আইসিং,' ধমকে উঠলেন পাইলট, ইন্টারকম খোলা কি বন্ধ গ্রাহ্য করছেন না। 'ওকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

নিজের কন্ট্রোল কলাম রিলিজ করে দিল হোমার, হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। 'ফুয়েল-ফিল্টার অ্যান্টি-আইসিং অন।'

ফুয়েল ফিল্টার রয়েছে ইঞ্জিনের নীচে, থ্রটল কন্ট্রোল আর জেটগুলোর মাঝখানে। ওই ফিল্টারে অতি সূক্ষ্ম জাল দিয়ে তৈরি ছাকনি ফিট করা আছে, সেই ছাকনির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় ফুয়েল।

ফিল্টারকে গরম রাখে তেল। এই উষ্ণতা, উদ্ভট কোনও পরিস্থিতি দেখা না দিলে, ফুয়েলের প্রবাহ বজায় রাখবার জন্য যথেষ্ট। ওদের দুর্ভাগ্য, এই মুহূর্তে সেই উদ্ভট পরিস্থিতিই দেখা দিয়েছে।

'ইনটেকে আইস জমতে দেখছি, সার,' কো-পাইলট বলল। 'তবে সিস্টেমটা মনে হচ্ছে ঠিকমতই কাজ করছে।'

ফিল্টারের চারপাশে প্রবাহিত হচ্ছে তেল, সূক্ষ্ম ছাকনির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় উষ্ণ হচ্ছে। দুই ডানার ভিতরে রাখা ট্যাংক

তেলে ভরাট হয়ে আছে; কেবিনের সিল করা এনভেলাপ-এর ভিতর এক ইঞ্চি মোটা সারি সারি পাইপ দিয়ে সারাক্ষণ অবাধগতিতে ছুটছে, রক্তের মত। তবে সমস্ত ফুয়েলেই, প্রকৃতির নিয়মে, পানি আছে। এই পানি ফুয়েল ট্যাংকের তলায় জমা হয়।

ট্যাংক নিয়মিত পরিষ্কার করে শুকানো উচিত, তা না হলে ওই পানি জমে বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যেতে পারে। সম্ভবত এই জরুরি কাজটা সময়মত করা হয়নি।

তা ছাড়া, ডিনামাইট থাকায় ফেয়ারব্যাঙ্কে ল্যান্ড করবার পর লোডিং বে পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি প্লেনটাকে, তার বদলে রি-ফুয়েলিঙের জন্য ওদের কাছে ব্যারেল পাঠানো হয়েছে। হতে পারে ওই ব্যারেলগুলোর ফুয়েলে মাত্রার চেয়ে বেশি ছিল পানি।

যে কারণেই হোক, প্লেনের ফুয়েল সিস্টেমে এখন পানি আছে। এবং হঠাৎ চলে আসা মারাত্মক উত্তুরে বাতাসের প্রভাবে পানিটুকু খুদে বরফ কণায় পরিণত হচ্ছে। ওই কণাগুলো সিস্টেমের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে ফিল্টারে জমছে, অথচ উষ্ণ তেলের স্রোত ওগুলোকে ছাকনির ভিতর দিয়ে পার করে নিয়ে যেতে পারছে না। সূক্ষ্ম ছাকনির গায়ে রক্তের মত জমাট বাঁধছে ওগুলো, জেটগুলোয় ফুয়েল পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে ফুয়েলের অভাবে অচল হয়ে পড়বে ইঞ্জিন দুটো।

খক্ খক্ কাশি এখন আরও জোরালো, যেন খোলাখুলি বিদ্রূপ করছে।

ওদিকে কেবিনের ভিতর চরম উত্তেজনাকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ককপিটে ঢুকতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা।

ককপিট থেকে মনিকার ফিরে আসা দেখে আর ইঞ্জিনের কাশি শুনে আগেই বিপদের আভাস পেয়ে গেছে ও। পাইলটদের কোনও রকম সাহায্য লাগবে কি না জানার জন্য ককপিটের দিকে এগোচ্ছে, নিজের সিট ছেড়ে ওর মুখোমুখি হলো অস্টিন।

'জানতে পারি, রানা, কোথায় যাচ্ছ তুমি?' শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে প্রশ্ন

করল ও।

'প্লেনে সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওদের হয়তো কোনও সাহায্য লাগবে,' বলে অস্টিনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা।

কিন্তু দ্রুত সরে গিয়ে আবার ওর পথ আগলাল অস্টিন। 'রিড আর হোমারকে অনেকদিন ধরে চিনি আমরা, দুজনেই খুব দক্ষ পাইলট,' বলল ও। 'ওরা কি তোমার সাহায্য চেয়েছে?'

'অস্টিন, রানার পথ ছাড়ো, তারপর নিজের সিটে ফিরে যাও,' বিরক্ত হয়ে বললেন প্রফেসর। 'তোমার এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়।'

'ইয়েস, প্রফেসর, এখনই যাচ্ছি,' বলল অস্টিন, কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না। রানার দিকে চোখ গরম করে তাকাল। 'রানা, পরের কাজে নাক গলানো, সুযোগ পেলেই মাতব্বরি ফলানো, এ-সব তোমার পুরানো বদভ্যাস। মনে আছে, এরকম নাক গলাতে গিয়েই নিজেকে তুমি আমার শত্রু বানিয়েছ?'

উত্তরে রানা কিছু বলবার আগেই ইন্টারকম থেকে পাইলটের ঘোষণা ভেসে এল।

'প্যাসেঞ্জারদের বলছি, প্লিজ, যে-যার সিট-বেল্ট বাঁধুন। নো স্মোকিং। কাপড়চোপড় থেকে চশমা ও তীক্ষ্ণ জিনিস-পত্র সরিয়ে ফেলুন। সামনের দিকে ঝুঁকে বসার প্রস্তুতি নিন—হাঁটুর উপর ক্রস করে রাখা হাতের উপর কপাল রাখুন। বব—বারোর সঙ্গে কানেকশন পাইয়ে দাও, তারপর প্লেনটাকে ওপরে রাখতে সাহায্য করো আমাকে।'

'রানা,' বললেন প্রফেসর। 'তোমরা শান্ত হয়ে বসো।'

চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা গেল না, 'ইয়েস, প্রফেসর,' বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের সিটে এসে বসল রানা।

রেডিওতে কথা বলছে কো-পাইলট, প্রতি মুহূর্তে ওর উদ্বিগ্ন গলা চড়ছে। তারপর মাউথপিসটা পাইলটের দিকে বাড়িয়ে ধরে

বলল, 'সার! বারোয় ব্ল্যাকআউট শুরু হয়েছে! দৃষ্টিসীমা মিনিমামের চেয়েও নীচে, আরও কমছে। কীভাবে হলো এটা?'

ইঞ্জিন কেশেই চলেছে।

নির্দেশ অনুসারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে আরোহীরা। মনিকা ওর হাতব্যাগ মেঝেতে নামিয়ে রেখে সামনের দিকে ঝুঁকল। নিজের ডান দিকে তাকাল ও, দেখল প্যাঁচার মত চোখ মিটমিট করছেন ওর ড্যাডি। তারপর শুনতে পেল কে যেন ফিসফিস করছে...নিশ্চয়ই জুনো, আন্দাজ করল—প্রার্থনা করছে। ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে কাগজ হয়ে গেছে।

ইন্টারকম খোলা রেখে কো-পাইলটের সঙ্গে কথা বলছেন পাইলট।

'এটা আইস, হোমার। আর কোথায় আইস পাওয়া যাবে বলে মনে করো তুমি?'

'ফিল্টার অ্যান্টি-আইসিং?'

'লাইট অন করা। ওখানে কোনও সমস্যা হবার কারণ নেই।'

'সিস্টেমে পানি?'

'মনে হয় না। ট্যাংকে পানি আছে কি না, শেষ কবে রুটিন চেক হয়েছে?'

'তা বলতে পারব না। তবে গ্রাউন্ড ফিটার ওটা শেষবার সার্ভিসিং করেছে বলে জানি...'

'অর্থাৎ দু'দিন আগে। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা আসলে কিছু না। শোনো, কী যেন কানে বাজল একবার...'

'হ্যালো, বারো? বারো, দিস ইজ...' অকস্মাৎ ইঞ্জিন গর্জে উঠতে চাপা পড়ে গেল ওদের কথাবার্তা। আরও একবার সামান্য উপর দিকে উঠল প্লেনের নাক।

আরোহীদের কারও একবারও মনে হলো না যে প্লেনটা ক্র্যাশ করতে যাচ্ছে।

কোল থেকে মুখ তুলল মনিকা, ড্যাডির সঙ্গে চোখাচোখি হতে

মৃদু হাসল।

হঠাৎ অচল হয়ে গেল ইঞ্জিন দুটো। এইমাত্র নতুন পাওয়া শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে গর্জন করছিল, পরক্ষণে একদম বোবা।

'ঠিক শুনেছ, বারো, প্যাক ধরে এগোচ্ছি...' ধীরভঙ্গিতে একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে প্লেনের মেঝে। ডানায় বাধা পেয়ে হাহাকার জুড়ে দিয়েছে বাতাস। 'ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং, বারো, ফাইনাল পজিশন জানাব...'

'ওহ্ নো! ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং নয়, হোমার, এটা ক্র্যাশ!'

শান্ত কেবিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে যান্ত্রিক কথাগুলো। বিশেষ করে শেষ শব্দটা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল ওদেরকে, সবাই বুঝতে পারছে কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে পড়েছে ওরা।

তবে শুধু পাইলট আর কো-পাইলট জানে আসলে কী ঘটছে। দুজনের সামনে আর নীচে সবুজাভ-সোনালি সাগর আর সবুজাভ-সাদা বরফের বিস্তৃতি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, দুটোর দিকেই এত দ্রুতবেগে ছুটছে প্লেন যে পলকের জন্য কন্ট্রোল প্যানেলে তাকাবার সময়ও যেন নেই কারও।

সোজাসুজি পতন শুরু হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু প্লেন খসে না পড়ে টানা একটা বাতাসের কোলে চড়ে উড়ে চলেছে, যদিও সেটা নীচের দিকেই।

প্লেনটার মতই শান্ত ভঙ্গিতে আলটিচ্যুড অ্যাডজাস্ট করলেন পাইলট, ওঁর খয়েরি চোখ দুটো ছুটে আসা মহাসাগরে খুঁজে বেড়াচ্ছে আদর্শ একটা স্পট, যেখানে প্লেনটাকে নামাতে পারবেন তিনি।

আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করছে মনিকা। ভয় পাচ্ছে যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। চোখে পানি চলে আসায় নিজের উপর রাগ হচ্ছে ওর, এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলবার জন্য দোষ দিচ্ছে ভাগ্যের।

ইচ্ছে হচ্ছে গলা ছেড়ে কাঁদে, কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে

রেখেছে নিজেকে। হাঁটুর উপর রাখা হাতে কপালটাকে এত জোরে চেপে ধরেছে, হাড় পর্যন্ত ব্যথা করছে ওর।

সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে জন অস্টিনও, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে রানার উপস্থিতিতে সেটা যাতে প্রকাশ না পায়। হঠাৎ করেই ওর মনে হয়েছে, মারা যাচ্ছে ও। ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও, প্লিজ! আর কারও কথা জানি না, কিন্তু আমি বাঁচতে চাই! যদি কারও বিনিময়েও হয়, আমি যেন এ-যাত্রায় রক্ষা পাই! ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে অস্টিন।

জুনোর প্রার্থনা ভারি অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ এতদিনের মেথডিস্ট শিক্ষা ভুলে, জীবনের সম্ভবত শেষ প্রার্থনায়, কায়মনোবাক্যে সে তার পুরানো দেবতাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে। আকাশের দেবতা কাইলা-কে ডেকে বলছে—আমাদেরকে উপরেই থাকতে দাও, নীচে নামতে দিয়ো না! ধ্বংসের দেবতা আইপালুকভিক-কে বলছে—আমাদের উপর দয়া করো!

প্রফেসর মনসুর কিছুই অনুভব করছেন না। এরকম একটা কিছু যে ঘটছে সেটাই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। মানুষটা পার্থিব দুনিয়ার বাসিন্দা, অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল, ওঁর প্রতিভা ওঁকে চরম স্বার্থপর করে তুলেছে।

নিজের প্রতিভা সম্পর্কে যখন সচেতন হলেন, যখন বুঝলেন দুনিয়ায় চলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল তাঁর জানা আছে, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—এই দুটো গুণকে তিনি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে গড়ে তোলা একটা চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখবেন—অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড প্রফেসর।

তখন ওঁর মনে হয়েছিল, দেশ ও মানুষের সেবা করবার জন্য যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁকে পেতে হবে তা পাওয়ার এটাই একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। কিন্তু এই মুহূর্তে চারিত্রিক কোনও বৈশিষ্ট্য ওঁকে রক্ষা করবে না। ওঁকে নয়, ভাবলেন তিনি, ওঁর মেয়েকেও নয়।

ভয় নয়, তার চেয়ে বেশি হতাশায় ভুগছে রানা। মৃত্যুকে নিয়ে, মৃত্যুর সঙ্গেই ওর খেলা; প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ থাকে ওর নিজের হাতে। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছে ও। অন্য লোকের হাতে নিজের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ ও নয়, অথচ ঠিক সেই পরীক্ষাটাই দিতে হচ্ছে। ঠোঁট কামড়াচ্ছে, ডান বাহুর উপর কপাল ঠুকছে, অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বব হোমার এই মুহূর্তে পাথরে খোদাই করা মূর্তি। ফ্ল্যাপ আর আন্ডারক্যারিজ আগেই তুলে নিয়েছে ও, আলটিমিটারের ঘুরন্ত কাঁটার উপর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আর কিছু করবার নেই ওর। আলটিমিটারের সাদা সংখ্যাগুলো বলছে, সি লেভেল থেকে মাত্র একশো ফুট উপরে রয়েছে প্লেন। পাশের আরেকটা রিডিং জানাচ্ছে, প্লেনের স্পিড এখনও ঘণ্টায় একশো মাইলের বেশি।

পাইলট নাথান রিডের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি জীবনের একটা চরম পরীক্ষা। যেন ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তটির জন্য ওঁর মেধা, প্রবণতা আর ভাগ্য এতদিন ধরে তৈরি করেছে ওঁকে। পুরানো একটা ডগলাস ডিসিথ্রি নিয়ে প্রথম ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করেন তিনি। পাঁচ কি ছয় বছর আগে টারবো-প্রপ এয়ারক্রাফট নিয়ে দ্বিতীয়বার। জেট নিয়ে একবারও নয়। পানিতেও এই প্রথম।

অথচ কী করতে যাচ্ছেন পরিষ্কার ধারণা আছে ওঁর। পিঠ, ঘাড়, কাঁধ, বাহু, কবজি ও হাত কঠিন নিয়ন্ত্রণে; এমন একটা প্লেনকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যেটার ওড়ার আর কোনও ক্ষমতাই নেই। খসে পড়া একটা জিনিসকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন, রাখবেনও—যতক্ষণ না ওটাকে নামাবার জন্য ভাল একটা জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন।

আকাশছোঁয়া প্যাকের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে ছুটছে প্লেন. যে বিশাল নীল তিমিকে দেখবার জন্য বাঁক নিয়েছিল ওরা সেটার আধ মাইল সামনে চলে এসেছে। প্যাক আইস বিস্তৃত হয়ে আছে

সেই নর্থ পোল ছাড়িয়ে আরও বহুদূর, পাইলটের ডানদিকে।

আইস ব্লকগুলো কোনও কোনওটা এক-দেড়শো ফুট উঁচু, কিনারাগুলো ধারাল। ল্যান্ড করবার কোনও সুযোগ নেই ওদিকে। উজ্জ্বল আলোয় চোখ কোঁচকালেন তিনি।

ওদিকে! এক হাজার গজ সামনে! হয়তো কোনও রকমে... সাগরের উপর প্লেনটাকে এরইমধ্যে বামদিকে ঘোরাতে শুরু করেছেন, নিচু করাচ্ছেন নাকটাকে।

বাতাসের চাপে উঁচু হলো ডানদিকের ডানা, ফলে ওদের নীচে নামাটা দ্রুত হলো আরও, সেই সঙ্গে প্রায় আশি ডিগ্রি কাত হয়ে চওড়া একটা বৃত্ত রচনা করছে।

আলটিমিটারে চোখ পড়ল। মাত্র পঁচিশ ফুট, দ্রুত আরও কমছে। ঈশ্বর! নাহ্, পৌঁছাতে পারবেন না! নাকটা অসম্ভব নিচু হয়ে যাওয়ায় প্লেনের সমস্ত ওজন যেন ওঁর পিঠের পেশিতে চেপে বসেছে।

বিশ গজ সামনে বরফের কিনারা দেখতে পেলেন তিনি, কিন্তু না তাকিয়েও জানেন প্লেনের তলায় প্রয়োজনীয় বাতাসের প্রবাহ নেই। চেঁচিয়ে ওঠার জন্য মুখ খুললেন, ঠিক তখনই একশো মাইল স্পিডে সাগরে আছড়ে পড়ল প্লেন।

খানিক আগে এক হাজার গজ দূরে পাইলট আসলে প্যাক রেখা থেকে বেরিয়ে আসা বরফের একটা বাহু দেখতে পেয়েছিলেন।

অতীতে কোনও একসময় বাতাস আর স্রোতের অদ্ভুত আচরণ চাপ দিয়ে বরফটার আকৃতি বদলে ফেলেছে—অস্বাভাবিক লম্বা আর একসারি ছোট পাহাড় তৈরি হয়েছে ওটার উপর। গ্রীষ্মের বরফ গলা শুরু হতে প্যাকের কিনারা পিছু হটতে শুরু করল, পাহাড়গুলো রয়ে গেছে তখনও, ওটার সঙ্গে থেকে গেছে বাহুর বাকি অংশও, পাঁচশো গজ লম্বা, বরফের সমতল প্ল্যাটফর্মসহ।

প্যাকের সারফেস ঢেউ খেলানো, কোথাও আবার ফাটল ধরা,

সেজন্য প্রায় মসৃণ বাহুতেই প্লেনটাকে নামাতে চেষ্টা করেছেন পাইলট। টার্গেট বিশ গজ দূরে থাকতে পানিতে পড়েছে প্লেন। পানিতে চ্যাপ্টা কিছু ছুঁড়লে যেমনটি দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে না ডুবে লাফ দিতে থাকে; চারদিকে বিপুল পানি আর রাজ্যের বিধ্বস্ত বরফ ছড়িয়ে প্লেনটাও তাই করল।

ড্যাডির দিকে তাকাল মনিকা। ওঁর মাথাটা হাতের উপর, হাঁটুর উপর ওগুলোকে চেপে রেখেছে। পা ছুঁড়ে জুতো খুলে ফেলল ও. তারপর ড্যাডির ভঙ্গিটা অনুকরণ করল। ওর চারদিকে শব্দের বিস্ফোরণ হচ্ছে। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ছিটকে পড়তে চাইছে ওর শরীরটা।

এখনও অক্ষত, এক লাফে দশ ফুট শূন্যে উঠল প্লেন, এক পলকে পার হয়ে এল বিশ গজ দূরত্ব, তারপর খসে পড়ল বরফের বিশাল বাহুটার কিনারায়।

উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে ঢুকে পড়া বরফ আর জলকণার ঝাপটায় প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন পাইলট, বাম দিকে শুধু কুঁজো হয়ে থাকা আকৃতিহীন পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন।

মনিকার পেটের ভিতরটা মোচড় খাচ্ছে। শব্দের বিকট বিস্ফোরণ আর প্রচণ্ড ঝাঁকি দিশেহারা করে তুলল ওকে। প্লেনের পিছনদিক থেকে ছুটে আসা বাক্সগুলো ওর চারপাশে ভেঙে যাচ্ছে. স্রেফ ভাগ্যগুণে ভারী কিছু আঘাত করল না ওকে। আকস্মিক ভাইব্রেশনে হাঁটু কেঁপে ওঠায় হাত দুটো লাফিয়ে উঠল, এত জোরে বাড়ি মারল মুখে যে নাক দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

আর্তনাদ করছে প্লেন। গা রিরি করা আওয়াজ, শুরু হওয়ার পর আর থামছে না।

এখনও জ্ঞান হারাননি পাইলট, লক্ষ করলেন পোর্টসাইডের পাহাড়গুলো আরও কাছে সরে আসছে। ওঁর হিসাবে সেকেন্ডের এক দশমাংশ সময়ের মধ্যে ডানার ডগা স্পর্শ করবে ওগুলোকে। ধাক্কাটা সামলাবার জন্য নিজেকে শক্ত করলেন তিনি, একই সময়ে পাক খেতে শুরু করল প্লেন।

অকস্মাৎ ডানদিকে ছিটকে গেল কেবিনটা। পরমুহূর্তে লেজের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল ফিউজিলাজ।

'পেরেছি,' নাক উঁচু হতে দেখে ভাবলেন পাইলট, গতি কমে আসায় বরফের ভঙ্গুর ঢাল ভেঙেচুরে উপরে উঠে যাচ্ছে প্লেন। গর্বে ভরে উঠল ওঁর বুক। পরমুহূর্তে সেই বুকেই বিস্ফোরিত হলো উইন্ডস্ক্রিন।

থরথর করে কেঁপে উঠে খাড়া হয়ে গেল কেবিন। মনিকা দেখল দেয়াল ভেঙে প্রকাণ্ড হার্পুনের ডগার মত কী যেন একটা ওর সামনে চলে আসছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

নড়াচড়া, শব্দ, কম্পন, সবকিছু থেমে গেল।

পাঁচ

প্লেন অ্যাক্সিডেন্টের ধাতব আওয়াজটা আর্কটিক মহাসাগরের বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, প্রকাণ্ডদেহী নীল তিমির কানে খুব সহজেই পৌঁছে গেল সেটা; তবে না ওটা তদন্ত করতে এল, না সাঁতরে দূরে সরে গেল। অন্য কোনও কারণ নেই, স্রেফ ক্লান্ত বোধ করছে। পিঠের বিরাট সব প্যাঁচানো পেশি, ঝুলে থাকা কম্বলের মত পেটের চামড়া অবিরত ভোঁতা মেসেজ পাঠাচ্ছে মগজে—শক্তি নেই।

দুই অংশে বিভক্ত প্রকাণ্ড লেজ, চওড়ায় বিশ ফুটেরও বেশি, মাঝে-মধ্যে পানিতে বাড়ি মেরে একশো ফুট লম্বা অসম্ভব ভারী শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখছে, সেই ফাঁকে দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে ওটা। পানির সারফেস ভেঙে আবার উঁচু হলো পিঠ, আর্কটিক আকাশকে লক্ষ্য করে সগর্জনে ছুঁড়ে দিল পানির ঝরণা

আর বাষ্পের মেঘ।

ডুব দিল আর্কটিক মহাসাগরের দৈত্য। আজ প্রায় চোদ্দোদিন পর আবার চোখ বুজল। ঘুমাচ্ছে।

চোদ্দোদিন আগে পুব প্রশান্ত মহাসাগরে অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নীল। স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে পাঁচশো মাইল পশ্চিমে তিন কি চার নট গতিতে সাঁতরেছে, মাঝে-মধ্যে ডাইভ দিয়ে নেমে গেছে দু'হাজার ফুট নীচে, কখনও বা লাফ দিয়ে পানি ছেড়ে পুরোপুরি উঠে পড়েছে শূন্যে—সুখী ও সন্তুষ্ট।

কানে চেঁচামেচি, সঙ্গীত আর ক্লিক ক্লিক আওয়াজ ঢুকেছে, তিমিদের ভাষা বুঝতে পেরে কখনও সাড়া দিয়েছে, কখনও দেয়নি। দশ বছর আগে হলে একজন সঙ্গিনীর খোঁজে থাকত, কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছে, আর্কটিক থেকে নিরক্ষবৃত্তের দিকে বাৎসরিক অভিযানে রওনা হতে পেরেই খুশি।

তারপর একদিন ওগুলোর আওয়াজ পেয়েই চিনতে পেরেছে: একদল কিলার। চেঁচামেচি শুনে বুঝেছে সংখ্যায় চব্বিশটা, পাঁচটা ওর পিছনে, ছয়টা ওর আর তীরের মাঝখানে, বাকি তেরোটা পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে টহল দিচ্ছে। প্রথমে দশ নটের কিছু উপরে স্পিড তুলেই সন্তুষ্ট থেকেছে সে। পরদিন সকালে দুশো মাইল উত্তরে পৌঁছে উপলব্ধি করেছে, ওকে খুন করতে চাইছে কিলাররা।

সেই যে পিছু নিয়েছে, কিছুতেই আর খসানো যাচ্ছে না।

তবে যে-কোনও কারণেই হোক তার খুব কাছাকাছি আসেনি খুনিরা।

দশদিন পর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা দ্বীপের কাছে, অগভীর পানিতে, আত্মগোপন করেছে সে। সেদিন প্রায় দশ ঘণ্টা পুবদিকে ছুটতে হয়েছে তাকে, মাঝে মধ্যে ওগুলোর সঙ্গে বিপজ্জনক লুকোচুরি খেলতে হয়েছে। ফিরতি আওয়াজের সাহায্যে অতগুলো দ্বীপের মাঝখান থেকে ঠিকই তার প্রকাণ্ড শরীরটাকে আলাদা করতে পেরেছে খুনিরা।

ওখানে প্রায় ধরে ফেলেছিল ওকে। পালাবার সময় এই প্রথম ওগুলোকে দেখেছে সে। লিডার তিমিটা প্রকাণ্ড, নীলের দেখা অন্য যে-কোনও কিলারের চেয়ে অন্তত তিনফুট বেশি লম্বা। দুটো ক্ষত আছে ওটার মুখে—একটা নাকের ডগায়, দ্বিতীয়টা উপরের ঠোঁট থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ডান চোখের পিছনে। দ্বিতীয় ক্ষতটা ঠোঁটের উপরের অংশকে খাটো করে দিয়েছে, ফলে মুখটা পুরোপুরি বন্ধ করতে পারে না লিডার—সাদা দাঁতগুলো সারাক্ষণ বেরিয়ে থাকে।

আজ দুপুর থেকে স্থির হয়ে আছে নীল, শুয়ে আছে বরফের কিনারায়, বোধহয় ঘুমাচ্ছে। কিলার বাহিনীকে পথ দেখিয়ে ধীরে ধীরে ওর কাছাকাছি নিয়ে আসছে লিডার। নীলের মত সে-ও প্লেন ক্র্যাশের আওয়াজ পেয়েছে, তবে গ্রাহ্য করেনি। এদিকের পানিতে এত বেশি প্ল্যাঙ্কটন যে দৃষ্টিসীমা মাত্র কয়েক ফুট, তা সত্ত্বেও শিকার দানবটার ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে সোনার ব্যবহার করতে চাইছে না লিডার।

তার বদলে দলটাকে পিছনে রেখে পরিস্থিতি বোঝার জন্য লালচে অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে একা এগোচ্ছে ওটা। মাঝে মধ্যে পানির উপর পিঠ তুলে শ্বাস নিতে হচ্ছে, লক্ষ রাখছে যাতে কোনও শব্দ না হয়। তারপর হঠাৎ একটা স্রোত এসে প্ল্যাঙ্কটনের পরদাকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, একশ' ফুটেরও কাছে ঘুমন্ত নীলকে দেখতে পেল ওটা। ওখানেই এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর বাঁক নিয়ে ফিরে এল নিজ দলের কাছে। এতদিন পর খুন করবার সময় হয়েছে।

বাচ্চাটাকে ধরলে সংখ্যায় ওরা সব মিলিয়ে চব্বিশটা, ছয় ভাগে ভাগ করল লিডার। বাচ্চাসহ এক মা আর একজন গর্ভবতী তরুণী দূরে সরে থাকবে, তবে এত দূরে নয় যে দেখে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বাচ্চাটা।

বাকি পাঁচটা ফাইটিং গ্রুপ। এক, দুই, চার, পাঁচ—প্রতি গ্রুপে

চারজন। তিনে পাঁচজন। লিডার আর তার সঙ্গিনী পাঁচ নম্বর গ্রুপে থাকছে।

পাঁচটা গ্রুপ নিঃশব্দে ঘিরে ফেলল ঘুমন্ত নীল দানবকে। প্ল্যাঙ্কটন না থাকায় স্বচ্ছ পানিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটাকে। এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে, অসহায় ও শক্তিহীন।

গ্রুপ এক নীলের পিছনে চলে গেল। গ্রুপ দুই দু'ভাগ হয়ে পৌঁছাল ওটার দু'পাশে। চার আর পাঁচ রয়েছে মাথার দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবাই তারা ঘুমন্ত শিকারের চারধারে পজিশন নিল।

প্রকাণ্ড মুখটার কাছ থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে লিডার, শিরায় শিরায় নাচানাচি শুরু করছে খুনের নেশায় উত্তেজিত রক্ত। মুখটা বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, নীচে নেমে আসা সূর্যের আলো লেগে মোমের শিখার মত জ্বলজ্বল করছে সাদা দাঁতগুলো। অপেক্ষা করছে সে। তারা সবাই অপেক্ষা করছে।

তারপর হঠাৎ পানিতে লেজ আছড়াল কিলার, চোখের পলকে পৌঁছে গেল নীলের গলার কাছে, ওটার চর্বিতে চোয়াল ডুবিয়ে দিয়েছে। লিডারের দেখাদেখি ছুটে এল গ্রুপ এক, কয়েক প্রস্থ দাঁত এক কি দুই কামড়েই শিকারের পেটের তিন-চার মণ চর্বি ছিঁড়ে নিল। চমকে উঠে জাগল নীল; তীক্ষ্ণ ব্যথায় ও আতঙ্কে দিশেহারা।

গ্রুপ দুইও দু'দিক থেকে হামলা শুরু করেছে। ওগুলো নীলের প্রতিটি ফ্লিপার-এর গোড়া কামড়ে ধরল, টেনে ছিঁড়ে আনবার চেষ্টা করছে শক্ত টিস্যুর কর্ড, যেগুলো পেশিকে মাংসের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

ডাইভ দিল আক্রান্ত নীল। এক মিনিটেরও কম সময়ে ছয়শো ফুট নীচে নেমে এসে সাগরের তলায় আশ্রয় খুঁজছে। নামবার সময় পাথরের একটা পাঁচিল দেখতে পেল। কাত হলো সে, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে পাঁচিলের গায়ে বাড়ি খেল। ওটার পাঁজরে সেঁটে থাকা দুটো কিলার সঙ্গে সঙ্গে ফাটা বেলুনের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল।

লিডারের দেখাদেখি সব গ্রুপের কিলাররাই নীলকে ছেড়ে দিয়েছিল, শুধু ওই দুটো ছাড়া।

নিরাপদ দূরত্বে পনের মিনিট অপেক্ষা করল লিডার। তারপর দেখল ধীরে ধীরে আবার সারফেসের দিকে উঠে আসছে তাদের শিকার, পিছনে রেখে আসছে লাল তিনটে ট্রেইল—গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে পেট, গলা ও ফ্লিপার থেকে।

নীলকে পানির সারফেস ভাঙতে দেওয়া হলো না। লিডারের নির্দেশে চারদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরল কিলাররা। গ্রুপ চারের খুনিরা চর্বির চাদর ছিঁড়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল গলার ভিতর, লিডারের জন্য পথ তৈরি করছে।

দশ মিনিট পর সঙ্গিনীকে পিছনে নিয়ে সদ্য তৈরি টানেলের ভিতর দিয়ে জ্যান্ত নীলের শরীরে ঢুকে পড়ল লিডার। ভিতরে ঢুকে প্রকাণ্ড জিভটাকে একেবারে গোড়া থেকে ছিঁড়ছে সে, আকারে সেটা পাঁচটনের কম হবে না। তাকে সাহায্য করল সঙ্গিনী।

আনন্দে-উল্লাসে গান গাইতে গাইতে ফিরে যাচ্ছে কিলার বাহিনী। এক জায়গায় থেমে জিভটাকে সবাই মিলে গোগ্রাসে খেল। প্যাকের কিনারায় একা পড়ে থাকল মৃত্যুপথযাত্রী নীল।

দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল লিডার, অনুসরণ করছে সঙ্গিনীকে। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই যখন ঘুমাচ্ছে, একা শুধু সেই জেগে থাকল; তিমির জিভের নেশা ধরানো স্বাদ অন্য একটা স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে তার মনে।

ওরিগনের অ্যাঙ্কারেজে মানুষকে খুন করবার পুরস্কার হিসাবে এইরকম কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হত তাকে। স্মৃতিটা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি যন্ত্রণাদায়কও বটে।

রাত যত বাড়ছে, ততই একটা নেশা চাপছে তার। লম্বা করা সেরকম একটা হাত যদি আবার দেখতে পেত! আবার যদি দেখবার সুযোগ হত আহত মানুষ কীরকম হাত-পা ছোঁড়ে!

যত বিপদই থাকুক, মানুষ শিকারের চেয়ে মজার খেলা আর

হয় না।

এই সময় একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ওদের বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি করল। শুধু বিস্ফোরণ নয়, আগুনের বিরাট শিখাও জ্বলে উঠল দূর আকাশে।

সবাইকে নিয়ে তদন্ত করতে যাচ্ছে লিডার।

ছয়

জ্ঞান ফেরার পর রানা অনুভব করল নিজের উপর রেগে আছে ও। পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে ফলাফল সব সময় একই হয়, কেউ না কেউ মারা যাবে।

চোখ খুলল। এখনও প্লেনের পিছনে, বামদিকে বসে রয়েছে, তবে সিটটা এতটাই কাত হয়ে পড়েছে যে, ও যেন বসে নেই, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর পা দুটো শূন্যে। প্লেনের শরীর ওকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে, ও যেন সরু একটা টাওয়ারের নীচে শুয়ে তাকিয়ে আছে উপরদিকে। ব্যাপারটা বুঝতে আরও এক মুহূর্ত সময় লাগল, কীভাবে যেন লেজের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লেনটা।

অকটেন ফুয়েলের গন্ধটা খারাপ না লাগলেও, ওটার তাৎপর্য ধরতে পেরে; তার সঙ্গে অপ্রীতিকর আরও দু'একটা গন্ধ যোগ হওয়ায়, শিরদাঁড়া বরাবর ঠাণ্ডা একটা শিহরন বয়ে গেল। এই প্রথম টের পেল নড়াচড়া করতে পারছে ও, তবে গোটা শরীরে ব্যথা, ভারী কিছু দিয়ে যেন থেঁতলানো হয়েছে ওকে।

বাকি গন্ধ ঘাম আর রক্তের। মাথা ঘুরিয়ে ওর ঠিক উল্টোদিকে তাকাল রানা। একদম স্থির হয়ে রয়েছে জুনো। মাথা আর বুক উঁচু

করবার সময় ব্যথাটা আরও বাড়ল রানার, তবে বুকের ভিতরটা সেজন্য ধড়ফড় করছে না।

একটু ভাল করে তাকাতে বুঝতে পারল, রক্তের গন্ধটা জুনোর ওদিক থেকে আসছে না। বুক আর মাথা ধীরে ধীরে আবার নামিয়ে আনল ও, সামান্য হাঁপাচ্ছে—ঠিক এই সময় ওর সামনের সিটের মাথায় দেখতে পেল জিনিসটা, সাদা হেডরেস্টের ডানদিকে—লম্বা ও চকচকে লাল দাগ। ও তাকিয়ে আছে, দাগটা ফুলে উঠে একটা ফোঁটায় পরিণত হলো, তারপর খসে পড়ল ওর চোখের দিকে।

ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। ফোঁটাটা ওর কানের পাশে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। এরপর ওর সামনের দু'নম্বর সিটের পিছনে রক্তের দাগ দেখল ও। শুধু ওখানে নয়, প্রতিটি বামদিকের আল ঘেঁষা সিটের পিছনে রক্ত দেখা যাচ্ছে, প্লেনের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে—একেবারে সেই মনিকার সিট পর্যন্ত।

উপর থেকে নীচে, সিটের সারি এভাবে সাজানো। প্রতি সারিতে ছ'টা করে সিট। রানার দিকে পাশাপাশি দুই সারিতে মোট বারোটা সিট। জুনোর দিকে এক সারিতে ছয়টা সিট।

রানার পেট মোচড় দিয়ে উঠল। বড় করে শ্বাস নিল ও। অনুভব করল আরেকটা ফোঁটা পড়ল কানের পাশে।

প্লেনের বাইরে হিসহিস করছে বাতাস। পানি ছলকানোর শব্দ ভেসে আসছে। অস্থির চড়চড় আওয়াজ করে বরফ ভাঙছে অবিরাম। হঠাৎ, প্লেনের ভিতর, কে যেন গুঙিয়ে উঠল। ডানদিকে ঘুরে গেল রানার মাথা, চটচটে আঠাল রক্ত লাগল গালে। জুনো নড়াচড়া করছে।

'জুনো!'

'উহ্।'

'জুনো?'

'আমি আহত।'

'আমিও।'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জুনো। 'আমি সামান্য। তুমি?'

সদ্য তৈরি রক্তের একটা ফোঁটার দিকে তাকাল রানা, ভাবল ওখানে যে আহত হয়েছে তার আঘাত সামান্য নয়। 'ও কিছু না...'

'দোস্ত,' ফিসফিস করল জুনো। 'আমি রক্তের গন্ধ পাচ্ছি।' রানার দেখাদেখি সিট-বেল্ট খুলছে ও।

'মনিকার রক্ত?' আবার প্লেনের উপর দিকে তাকাল রানা।

'কী জানি।' মাথা নাড়ল জুনো। 'দেখতে পাচ্ছি না।'

হাত বাড়িয়ে ওর উপরের সিটটার পিঠ ধরল রানা, নিজের সিট থেকে ধীরে ধীরে শরীরটাকে তুলতে চেষ্টা করছে। জুনোও তা-ই করছে, নিজের সিট থেকে এরইমধ্যে প্রায় বেরিয়ে পড়েছে ও।

সিটের পিঠ আর হাতলে পা রেখে উঁচু হলো রানা। ওর দিকের পরবর্তী জোড়া সিটে কেউ নেই। আরও উপরে ওঠার চেষ্টা করছে, ওর কাঁধ ধাক্কা খেল জুনোর পিঠের সঙ্গে। মুখ তুলে তাকাতে দেখল অস্টিনের উপর ঝুঁকে রয়েছে জুনো।

'কী অবস্থা ওর?'

'ভালই আছে,' জবাব দিল জুনো।

শ্রাগ করল রানা, আবার সিট বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল, ওগুলোর পিঠকে ধাপ হিসাবে ব্যবহার করে। যত উপরে উঠছে হেডরেস্টের রক্ত ততই পুরু আর গভীর দেখছে ও।

দ্বিতীয় সিটকে ছাড়িয়ে আসবার পর থামল রানা, কারণ প্লেনের মাথার দিক থেকে একটা পরদা ঝুলে থাকায় সামনেটা দেখতে পাচ্ছে না। মনে পড়ল ওটা আসলে ছোট্ট এন্ট্রি-কমপার্টমেন্টকে আড়াল করে রেখেছিল।

নড়াচড়া করায় আচ্ছন্ন বোধ করছে রানা, গলার কাছে বমি বমি ভাব। জুনো ওর পিছনে চলে এসেছে বুঝতে পেরে জানতে চাইল, 'অস্টিনের কী করলে, জুনো?'

'আমার কী করার আছে! যেমন ছিল তেমনি রেখে এসেছি, সময় হলে জাগবে।'

'ভাল করে দেখেছ, কোথাও চোট পায়নি?'

'হাড়গোড় ভাঙেনি, কোথাও একটু রক্তও দেখিনি।'

'তা হলে ঠিক আছে,' বলল রানা। 'পরদাটা সরাই, দেখি কী অবস্থা ওদিকে।'

নড়ে উঠল ঝুলন্ত কাপড়টা, টান টান হলো, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছিঁড়তে শুরু করল। 'প্রফেরস মনসুর মনে হচ্ছে ঠিকই আছেন,' কাজের ফাঁকে ওঁর উপর চোখ বুলিয়ে বলল রানা। 'তবে...'

'তবে?'

বিজ্ঞানীকে পরীক্ষা করল রানা। 'প্রফেসর ভাল আছেন,' বলল ও। 'তবে মনে হচ্ছে রক্ত ঝরছে ওঁর মেয়ের শরীর থেকে। খুবই মর্মান্তিক, এত দূর থেকে এসে...' পরদার কাপড়টা খুলে এল। 'এই যাহ্!'

এখনও খুব বেশি কিছু রানা দেখতে পাচ্ছে না। একটা হাত, আঙুল থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে; লম্বা সোনালি চুল, এখন মরচে রঙা, রক্তে মাখামাখি হয়ে জট পাকিয়ে গেছে।'

'আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ!'

উপরের দরজা বিস্ফোরিত হলো, কম্পানিওনওয়ে ধরে ভারী বস্তার মত নেমে আসছে কো-পাইলট বব হোমার।

সিটের পিঠে পা দিয়ে কোনও রকমে ভারসাম্য রক্ষা করছে রানা, নামার পথে ওকেও সেখান থেকে অনায়াসে খসিয়ে নিল হোমার। অসুস্থকর আওয়াজের সঙ্গে প্লেনের লেজের দিকে পড়ল ওরা।

ভোঁ ভোঁ করছে রানার কান। মাথা দপ্ দপ্ করছে। চোখের সামনে অসংখ্য উজ্জ্বল সরষে ফুল।

'রানা! রানা!' যেন দূর থেকে ভেসে আসল ডাকটা, কাছে চলে আসছে। ওর পাশে নেমে এল জুনো, হোমারের হাত-পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শরীরটাকে ছাড়াচ্ছে।

‘উফ! না, মারাত্মক কিছু হয়নি। ওর কী অবস্থা?’

‘অজ্ঞান হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে না মারাত্মক কোনও আঘাত পেয়েছে। কিন্তু এভাবে খসে পড়ল কেন?’

‘জানতে হলে ওপরে উঠে দেখতে হবে কী হচ্ছে ওখানে,’ বলল রানা। ‘এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।’

‘আচ্ছা, যাবার কোনও জায়গা আদৌ কি আছে আমাদের?’ জিজ্ঞেস করল জুনো।

‘আছে—খোলা প্যাক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। চারপাশে প্রচুর ফুয়েল, প্লেন এখন একটা বোমা। মিরাকল যে, এখনও বিস্ফোরিত হয়নি।’ মনে মনে ভাবল রানা, দরকার শুধু এক-আধটা আগুনের ফুলকি।

ধীরে ধীরে সিধে হলো, দাঁড়াল সিটগুলোর পিছনে হেলান দিয়ে। ওর মাথার পাশে আরেক ফোঁটা রক্ত পড়ল। ‘এসো, জুনো, আবার উঠি।’

যেন মই বেয়ে উঠছে রানা। খাড়া প্লেনটার আগের জায়গায় পৌঁছাতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। রক্তাক্ত একটা সিটে শক্তভাবে পা রাখতে চেষ্টা করছে, মনিকার অসাড় একটা হাত ঘষা খেল ওর কাঁধে। ধীরে ধীরে আরও খানিক উঁচু হলো ও, এই মুহূর্তে মেয়েটার উপর ঝুঁকে রয়েছে।

মনিকার মাথা আর ধড়ে জমাট বাঁধা রক্ত দেখে মন খারাপ হয়ে গেল রানার। তবে সার্চ করে শরীরে কোথাও ক্ষত খুঁজে পেল না। ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে পালস দেখল। নিয়মিত লাফাচ্ছে।

কিন্তু মনিকা আহত না হলে, এই রক্ত কার? চারদিকে তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার সামনের দেয়ালে একটা গর্ত দেখতে পেল। কিছু একটা আড়াল করে রাখলেও, অলস স্রোতের মত ওটা থেকেই রক্ত বেরিয়ে আসছে। ককপিটে একা শুধু পাইলট নাথান রিডের থাকার কথা, কাজেই রক্তটা ওঁরই।

‘জুনো!’

'বলো।'

'মেয়েটা আহত নয়, তবে সারা শরীরে রক্ত লেগে আছে। এখান থেকে সরিয়ে গরম কিছু দিয়ে জড়াতে হবে ওকে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আসছি আমি।'

দুজন ধরাধরি করে সিট থেকে তুলল মনিকাকে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, প্লেনের নীচের দিকে নামিয়ে আনছে। শেষ দু'এক ফুট বাকি থাকতে অজ্ঞান শরীরটাকে পিছলে কো-পাইলটের পাশে পড়তে দিল ওরা।

'এবার ওকে ঢাকো, তা না হলে নিউমোনিয়ায় ধরবে,' বলল রানা। 'আমি ককপিটটা দেখতে যাচ্ছি।'

কো-পাইলট খসে নীচে পড়বার সময় ওর পিছনে ককপিটের দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওটা খুলে ককপিটে ঢুকতে চেষ্টা করছে রানা। কাঠের ফ্রেম ক্যাচক্যাচ করে উঠল, ওর পা দুটো শক্ত করে ধরে আছে জুনো।

রানার মাথা ও কাঁধ ককপিটে ঢুকে গেল। ডানদিকটা দেখতে পাচ্ছে, সবকিছু ভেঙেচুরে আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে—কাঁচ, ইকুইপমেন্ট, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল, তার; সবই চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় চকচক করছে।

মাথাটা ঝাঁকাল রানা, সরু চোখ মিটমিট করে তাকাল। বিধ্বস্ত উইন্ডস্ক্রিনের ভিতর দিয়ে দেখল বরফের একটা স্তূপ ঢেউয়ের চূড়ার মত বাঁকা হয়ে ওদের উপর ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে। ওটার পিছনে সোনালি, প্রায় তামাটে, ভৌতিক নক্ষত্রখচিত আকাশ।

ঘুরল রানা, বামদিকের সিটের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল ও।

'কী দেখছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল জুনো, ওর ঠিক নীচেই রয়েছে সে।

'পাইলট...' শুরু করল রানা।

'মারা গেছেন,' প্লেনের লেজের দিক থেকে কো-পাইলট

হোমারের বেসুরো গলা ভেসে এল। সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও, মাথাটা দু'হাতে ধরা, তাকিয়ে আছে পাশে শুয়ে থাকা নিঃসাড় মনিকার দিকে। 'প্রফেসরের মেয়ে, মিস মনিকা কেমন আছেন? এত রক্ত...'

'পাইলটের,' বলল জুনো। 'মনিকা ভালই আছেন। কিন্তু পাইলট মারা গেলেন কীভাবে?'

'জিনিসটা সোজা ভেতরে ঢুকে পড়েছে,' বিড়বিড় করল রানা। 'ককপিট কাভার করে কিছুটা কেবিনেও চলে এসেছে,—মনিকা পর্যন্ত।'

'কী বলছ তুমি? কী জিনিস ঢুকে পড়েছে?' গলা চড়াল জুনো।

'ওকে বলবেন, প্লিজ?' হোমারকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সহজ।'

'অল্প কথায় বলি,' শুরু করল হোমার।

ফুয়েল ছাড়া কোনও প্লেনকে গ্লাইড করানো যায় না, ব্যাখ্যা করছে সে, খসে পড়বে ওটা। কিন্তু ওর পাইলট মিস্টার রিড যেভাবেই হোক প্লেনের নাক উঁচু করে রেখেছিলেন। ওঁর জায়গায় আজ অন্য কেউ থাকলে এতক্ষণে বরফের নীচে কবর হয়ে যেত সবার।

কিন্তু একপাশে সারি সারি পাহাড় ছিল, বাম ডানাটা ওগুলোর একটায় ঘষা খায়। তাতে বাঁয়ে ঘুরে যায় ওরা, প্লেনের নাক ঢুকে পড়ে পাহাড়ের ঢালে, ওই সময় স্পিড ছিল ঘণ্টায় একশো নট।

তারপর সোজা শূন্যে উঠে যায় নাক। পাহাড়টার চূড়ায় একটা ওভারহ্যাঙ ছিল—বিশাল আকারের ঝুলে থাকা বরফ, প্রায় একশ' টন ওজন—সেটা থেকে সারি সারি ঝুলছিল বিরাট সব ঝুরি...দশ ফুট, কিংবা আরও বেশি লম্বা...

জুনো জানতে চাইল, বরফের ঝুরি?

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হোমার। বরফের ওই একটা ঝুরিই ভেতরে ঢুকে গেঁথে ফেলেছে পাইলটকে।

রানা বলল, 'নেহাতই ভাগ্যের জোর, একটুর জন্যে মনিকার

শরীরে ঢুকতে পারেনি ওটা। আপনার নাম হোমার না? আপনি অনেক করেছেন, ধন্যবাদ। মনিকার ওপর খেয়াল রাখবেন, প্লিজ? কারও জ্ঞান ফিরলে তাকেও দেখে রাখতে হবে, পারবেন না?'

'বব হোমার। ইয়েস, সার, অবশ্যই!'

'ওহ্, মিস্টার হোমার!' আবার ওর দিকে ফিরল রানা। 'রেডিওর কী অবস্থা, কোনও আশা আছে?'

'না, সার।' মাথা নাড়ল হোমার। 'তবে পড়ে যাবার আগে আমাদের পজিশন প্রচার করেছি আমি। আমাদেরকে খুঁজতে বেরুবে ওরা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্লেনটার পাশে থাকতে পারলে...'

'খুব কাছাকাছি থাকাটা বিপজ্জনক...'

জুনোর কথা শেষ হয়নি, নাক কুঁচকে বাতাসের গন্ধ শুঁকল হোমার। 'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ও। 'ফুয়েল...হ্যাঁ, সার, তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে! ওপরের দরজা ঠিক আছে?'

'তেমন সমস্যা হবে না,' আশ্বস্ত করল রানা।

রানার পিছু নিয়ে ককপিটে ঢুকল জুনো। দেখল বরফের ঝুরিটা, বল্লমের মত, উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে সরাসরি পাইলট, ওঁর সিট, সিটের পিছনের দেয়াল ভেদ করে কেবিনে ঢুকে পড়েছে। বল্লমটার গায়ে প্রচুর খুদে ফাটল আর গর্ত, সেগুলো জমাট বাঁধা রক্তে ভরাট হয়ে আছে, ফলে মসৃণ, চকচকে মোজাইকের একটা ভাব চলে এসেছে ওটার মধ্যে।

মাথাটা ঘুরিয়ে নিল জুনো। 'ওহ্, কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু!'

রানা বলল, 'প্রায় সব মৃত্যুই ভয়ঙ্কর।'

ককপিট থেকে বাইরে বেরুবার দরজার কাছে চলে এল ওরা। ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেলটা ঘোরাল রানা, মৃদু ঝাঁকি খেয়ে গোটা সেকশন মুক্ত হলো, ডানা বেয়ে নেমে এল রাশি রাশি বরফের টুকরো। আগুনের ফুলকি তৈরি হওয়ার আশঙ্কায় রানা ও জুনো দুজনকেই আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

ফাঁকটা দিয়ে হালকা বাতাস ঢুকছে। গায়ে পারকা না থাকায় ঠাণ্ডায় হি হি করে উঠল রানা। 'উহ্, কী শীত!'

হেসে উঠল ওর এস্কিমো বন্ধু। 'দোস্ত, আইস-প্যাকে রয়েছি আমরা, ভাঙা একটা প্লেনের ভেতর, কাছেই উত্তরমেরু। যে বাতাসটা গায়ে লাগছে ওটার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর আমরা পরে আছি ওয়াশিংটনের কাপড়।'

'সেজন্যেই ভাবছি,' বলল রানা, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে সাহায্য না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব কি না।'

মাথা নাড়ল জুনো। 'আমি এস্কিমো, পুড়ে ছাই হবার চেয়ে জমে বরফ হওয়াটাই বেশি প্রেফার করব। আর এখানে থাকলে পুড়েই মরতে হবে।'

'ঠিক। আমি বেরুচ্ছি, বাইরেটা দেখে আসি,' বলল রানা, সাবধানে চৌকাঠের দিকে এগোচ্ছে। বাইরে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল ও।

বাইরে প্যাক, অন্য এক জগৎ। বরফের একটা বাহু দেখতে পাচ্ছে রানা, সম্ভবত পাঁচশ' গজ লম্বা। একদিকে এক সারি ছোট বরফের পাহাড়, চূড়াগুলোর কিনারা ধারাল। আরেকদিকে সমতল মাঠ, প্রায় দুশ' গজ দূরে অস্থির সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

বরফের বাহুটা ধনুকের মত সামান্য বাঁকা, প্লেন ক্র্যাশ-এর ট্র্যাক দূরের নিচু চূড়াগুলো থেকে রওনা হয়ে একটা সরল রেখা তৈরি করেছে, তারপর বাধা পেয়ে থেমেছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে।

পাহাড়-প্রাচীরের গা স্বচ্ছ-সবুজ, ভোঁতা চেহারা, ওর অনেক উপরে উঠে গেছে। চূড়ার কাছে তৈরি হয়েছে বিরাট ওভারহ্যাঙটা, আর ওই ওভারহ্যাঙ থেকে বরফের ঝুরি নেমে এসেছে। ওগুলোর একটাই প্লেনের সামনে দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। সেটা শুধু পাইলটকে বিদ্ধ করেনি, প্লেনটাকেও লেজের উপর আঁটসাঁটভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

পাহাড়-প্রাচীরগুলো বাঁকা হয়ে সাগরের দিকে নামার সময়

ভেঙে গিয়ে এক সারি নিচু ও তীক্ষ্ণ চূড়ায় পরিণত হয়েছে; নিয়মিত টানা বাতাস প্রতিটি চূড়ায় স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফের পতাকা ও ব্যানার উড়িয়ে দিয়েছে। ওগুলোর পিছনে কমলা রঙের রোদ মাখা বরফ প্রান্তর, সোনালি সাগর আর তামাটে আকাশ।

নীচে তাকাল রানা। 'কোনও সমস্যা নেই,' জুনোকে বলল ও। 'প্লেন ক্র্যাশ করায় চূড়া থেকে প্রচুর তুষার নেমে এসেছে। ডানা থেকে পিছলে নামা যাবে।'

দরজার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ও। পা দুটো ডানার সামনের কিনারা স্পর্শ করবার পর ওগুলোর উপর সাবধানে শরীরের ওজন চাপাল, চৌকাঠ ছেড়ে দিয়ে বরফ ঢাকা মেটালের উপর টলমল করছে। ধীরে ধীরে চূড়াগুলোর দিকে পিছন ফিরে ডানার উপর বসল, তারপর পিছলে নিরাপদেই নেমে পড়ল বরফের সারফেসে।

প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে এখন রানা, নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে জুতো সহ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আলগা তুষারে ডুবে গেছে। চারদিকে তাকাল ও।

প্রথমে একটা ক্রেইট দেখতে পেল, গায়ে আটকানো মেটাল প্লেটে স্টেনসিল করা। জিনিসটা কী হতে পারে ভাবছে, হঠাৎ অস্টিনের একঘেয়ে কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল, যেন কাগজে চোখ রেখে একটা তালিকা পড়ছে, তাঁবু, কলাপসিবল ক্যানু, স্লিপিং-ব্যাগ, কম্বল, পারকা...

ও, আচ্ছা, সাপ্লাই!

বিপজ্জনক বরফের উপর আছাড় খাওয়ার উপক্রম করছে রানা, প্রতি মুহূর্তে পা পিছলাচ্ছে, তারপরও কুঁজসদৃশ্য পোর্ট ইঞ্জিনকে ঘুরে লেজের রুপালি ফিন-এর কাছে চলে এল। ডানার তলায় জেটটা যেন ডিম পাড়বার চেষ্টা করছে, স্তূপ হয়ে আছে আরও অনেক ক্রেইট।

কাছাকাছি আসতে দেখতে পেল রানা কী হয়েছে। বরফের

বাহু বরাবর পিছলে নামার সময় তীক্ষ্ণ কিছুর সঙ্গে ঘষা খেয়ে চিরে গেছে প্লেনের পেট, বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়েছে লিডিং ডোর। বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়ায় আলগা হয়ে গিয়েছিল কার্গো, ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পাঁচটা বাক্সের এলোমেলো একটা স্তূপ দেখতে পাচ্ছে ও। বাকিগুলো ভিতরে—তবে উদ্ধার করা সম্ভব!

রানার খুব ভাল করে জানা আছে ওদের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার তার সব ওই বাক্সগুলোয় আছে। শুধু একটু কষ্ট করে হোল্ড থেকে সরিয়ে আনতে হবে, খুলে ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট বের করতে হবে, তারপর সাহায্য না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা।

খুশি মনে জেটের গা চাপড়াল রানা। 'জুনো, জুনো, বেরিয়ে এসো, হে!'

চাপড়ের আওয়াজ ভাঙা ফিউজিলাজের ভিতর প্রতিধ্বনি তুলল, ঝাঁকিয়ে দিল মোটা তারগুলোকে, ফুয়েল-লাইন কেঁপে উঠল। প্লেন ক্র্যাশ ল্যান্ড করবার সময় দু'টুকরো হয়ে গেছে যে তারটা, সামান্য শব্দেই দোল খেতে শুরু করল, তারপর পেট্রল ভর্তি বাতাসে উড়িয়ে দিল নীল একটা ফুলকি। বাক্সগুলো, বিদঘুটে ভঙ্গিতে পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়ে আছে, একটু নড়েচড়ে গেল। প্লেনটাও নিজের জায়গায় আরেকটু আঁটসাঁট হলো।

থেমে গেল তারটার দোল খাওয়া।

চড়চড় আওয়াজ করে রানার পায়ের ঠিক নীচেই ফুটখানেক উন্মুক্ত হলো বরফ, কালো পানির কিনারায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে ও। খানিক আগে আধ ইঞ্চি সরু একটা ফাটল ছিল ওখানে; প্লেনের লেজ থেকে শুরু, বিশ ফুট দূরে সাগরে গিয়ে মিশেছে।

হঠাৎ দ্রুত চওড়া হতে শুরু করেছে সেই ফাটল। প্লেনের লেজের কাছে এখনও সেটা সরু ও অগভীর, চওড়া হচ্ছে সাগরের দিকে যাওয়ার পথে মাঝামাঝি দূরত্বে—পানির উপর ভাসছে চকচকে ফুয়েল।

ফাঁকটা এত দ্রুত বড় হচ্ছে, লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা, পা পিছলে আছাড় খেল সরাসরি ফাঁকটার উপরেই। গলা থেকে চিৎকার বেরিয়ে এল: 'জুনো!'

দু'ফুট চওড়া ফাঁকে উপুড় হয়ে পড়েছে রানা। মাথাসহ বুকের অর্ধেক বরফে, উরুর মাঝখান থেকে পা দুটোও বরফে, শরীরের মাঝখানটা ফাঁকা জায়গায়—সদ্য তৈরি নালার সরাসরি উপরে।

নালাটা আরও বড় হচ্ছে; যেন নিঃশব্দ হাসি ছিল, হাই তুলতে যাচ্ছে। হাতের নাগালে বাক্সগুলোকে দেখতে পেয়ে ওগুলোর একটাকে ধরে নালার এপারে চলে আসবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ওর শরীরের নীচে ফাঁকটা আরও বড় হলো, ফলে হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে বাক্সটা।

জুনো পৌঁছাতে দেরি করলে ফাঁকটা আরও বড় হবে, হাই তোলার বদলে ঢোক গিলবে বরফ, তারপর বন্ধ হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ঠোঁট। এই কাপড়ে পানির মধ্যে দু'মিনিট বেঁচে থাকতে পারাটাও ভাগ্যের ব্যাপার। আলগা বরফে বারবার পিছলে যাচ্ছে হাঁটু আর হাত, কোনওমতেই শক্ত কিছুতে আটকানো যাচ্ছে না। ফাঁকের ভিতর ডেবে যাচ্ছে শরীরের মাঝখানটা। পেট ও কাঁধের পেশি ব্যথা করছে ওর।

'রানা? কোথায়, হে, তুমি?'

'এদিকে, জুনো, জলদি!' যেন প্রচণ্ড জ্বরে কাঁপছে রানা।

প্লেনের ভিতর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খোলার চেষ্টা করছে মনিকা, কিন্তু পারছে না। অনুভব করল ঠাণ্ডা আর থকথকে কী যেন রয়েছে ওর কপালে। ঝট করে হাত উঠে এল মুখে, চটচটে কী যেন ঠেকল আঙুলে। কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কী? নিজেকে বোঝাল, আতঙ্কিত হওয়া চলবে না। চোখের পাতায় আঙুল বুলাল, তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঘষল। অবশেষে ফাঁক হলো পাতা। চোখ মিটমিট করল ও।

সবকিছু উল্টোপাল্টা আর এলোমেলো হয়ে আছে। সিটগুলোর পিছনদিক দেখা যাচ্ছে। নড়াচড়া করতে গিয়ে টের পেল ঠকঠক করে কাঁপছে শরীরটা—ভয়ে নয়, শীতে। সারা শরীরে আঘাতের অসংখ্য দাগ, কোথাও নীলচে কোথাও লালচে, এখানে ফোলা তো ওখানে থেঁতলানো।

'ব্যাপারটা এমন হঠাৎ করে হয়েছে, চেঁচিয়ে ওঠারও সময় পাননি তিনি।' কো-পাইলটের গলার আওয়াজ, চিনতে পারল মনিকা।

'অত্যন্ত মর্মান্তিক। আপনার কি মনে হয় বরফ...' এটা ড্যাডির গলা।

'ড্যাডি?'

'মনিকা? গুড, তোমার তা হলে জ্ঞান ফিরেছে।'

মনিকা দেখল ওর মাথার উপর থেকে কথা বলছেন ড্যাডি। বুঝতে পারছে, প্লেনের লেজে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে ও, তাকিয়ে রয়েছে ককপিটের দিকে। ডানদিকে এক সারি সিট, বাম দিকে দু'সারি। ডানদিকের একটা সিট থেকে নীচে তাকিয়ে ওকে দেখছেন ড্যাডি, ড্যাডির এক সিট উপরে রয়েছে কো-পাইলট।

'প্লেনটা ক্র্যাশ করেছে,' বললেন ড্যাডি।

সিটগুলোয় পা দিয়ে নীচে নামছে কো-পাইলট। 'ভয় পাবেন না— এ রক্ত আপনার নয়, আপনি আহত হননি। অনেস্ট।'

ভ্রু কোঁচকাল মনিকা। তা হলে কার রক্ত?

'কাপড় পাল্টানো দরকার, আপনার ব্যাগ...'

ব্যাগটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। প্রফেসর আর কো-পাইলট নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, কাপড় পাল্টে জিনস আর শার্ট পরল মনিকা, শার্টের উপর ভারী পুলওভার চড়াল, সবশেষে ব্রাশ চালাল চুলে।

মনিকার ডান সারির সিটে, মাঝামাঝি দূরত্বে, আরও একজন নড়ে উঠল। 'সর্বনাশ!' বলল অস্টিন। 'কী ভয়ঙ্কর! এ কী ঘটে

গেছে!' অনেক আগেই জ্ঞান ফিরেছে ওর, এতক্ষণ আধো ঘুমে ছিল। সিট-বেল্ট খুলে ক্রল শুরু করল।

গ্যাংওয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চুলে ব্রাশ চালাচ্ছে মনিকা, মুখ তুলে দেখল নিজের উপরের সিট ধরে শরীরটাকে উঁচু করছে অস্টিন, তারপর প্লেনের সামনের ফাঁকটা দিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ করে নিজেদের অনিশ্চিত পজিশনের কথা ভেবে অসহায় বোধ করল মনিকা। প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে এই বেঁচে যাওয়ার কি কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে? খাবার আর আশ্রয় ছাড়া বরফের রাজ্যে কদিন টিকবে ওরা?

সাত

প্লেনের লেজ ঘুরে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে আসছে জুনো। আলগা তুষারে পা পিছলাল দু'তিনবার, আছাড় খেল, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে সিধে হয়ে আবার ছুটল, পায়ে যেন স্প্রিং লাগানো আছে। বাঁক ঘুরেই দেখল বন্ধুর পেটের নীচে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে বরফ। কোনও কিছু চিন্তা না করে, ছুটে এসে রানার গোড়ালি দুটো শক্ত করে ধরে টান দিল ও।

রানার হাত থেকে ছুটে গেল ভারী বাক্সটা, হাঁ করা ফাঁকের উপর দিয়ে উড়ে চলে এল ও, জুনোর পাশে একটা স্তূপের মত পড়ে থাকল। কালো চোখে যেন দৃষ্টি নেই, মুখ হয়ে আছে সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে। 'উফ, হাতে খুব লেগেছে,' বিড়বিড় করল ও।

'লাগবেই তো,' নরম সুরে বলল জুনো, দাঁড়াচ্ছে।

আরও এক মুহূর্ত পর মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে পেল রানা, চোখেও ফুটল সচেতন দৃষ্টি। 'বাক্স!' বলল ও, দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ওগুলোয় ইকুইপমেন্ট আছে। আমরা একটা ক্যাম্প...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে অস্টিন বলল, 'তোমরা দুজন কী ষড়যন্ত্র করছ এখানে? নিশ্চয়ই বাক্স ভেঙে রাইফেল চুরি করছ, প্রয়োজন হলে লোকসংখ্যা কমিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে? নাকি খাবার চুরি করছ, ভাবছ যদি কম পড়ে যায়?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তুমি চিরকালই আত্মবিশ্বাসী মানুষ, অস্টিন। ঠিক আছে, দায়িত্ব নাও, বাঁচাও আমাদের।'

রানার অপ্রত্যাশিত আচরণে এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে থাকল অস্টিন। 'আমি ক্যাম্প ডিরেক্টর, কাজেই দায়িত্বটা আমারই, ঘটা করে কেউ সেটা না দিলেও চলবে,' বলল সে। 'বেশিরভাগ বাক্সের গায়েই স্টেনসিল করা আছে, জানা যাবে কোন্‌টার ভেতরে কী আছে। জুনো, কী ওগুলো?'

'সবই খাবার।'

'শুরুটা দারুণ। প্রথমে আমাদের কী দরকার?' প্রশ্নটা অস্টিন নিজেকে করলেও, জবাব দিল রানা।

'কাপড়চোপড়।'

'ঠিক। কাপড়চোপড় আর আশ্রয়।' নিজেকে বোঝাচ্ছে অস্টিন, উজ্জ্বল আর্কটিক রাতে সারভাইভ করা প্রায় অসম্ভব, কাজেই রানার সঙ্গে আপাতত বিরোধে না জড়ানোই ভাল। 'তাঁবুগুলো এদিকের হোল্ডেই ভরা হয়েছিল, আছে নিশ্চয়...'

'প্লেনটা এখানে পিছলে আসার সময় পথেও কোথাও পড়ে গিয়ে থাকতে পারে,' বলল জুনো।

'ঠিক আছে, চেক করে দেখতে হবে। না, তোমরা দুজন যা করছিলে তা-ই করো, এখান থেকে বের করো সব।' কথা শেষ করে প্লেনের গায়ে একটা ঘুসি মারল।

হোল্ডের ভিতর বিচ্ছিন্ন তারটা দোল খেল, ফুলকি ওড়াল বাতাসে।

'কো-পাইলট! হোমার! ও হে, তোমাকে এখানে দরকার আমার।'

'আসছি,' ভোঁতা শোনাল জবাবটা।

জুনো আর রানা কাজ শুরু করল। খাবার ভর্তি দুটো বাক্স বিধ্বস্ত প্লেনের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্যাকের প্রথম সারির নিচু পাহাড়গুলোর দিকে এগোচ্ছে, পায়ের নীচে বরফ হয়ে উঠল ভেজা ভেজা, ফাঁপা আর ভঙ্গুর। ওদের পা আরও গভীরে ডুবে যাচ্ছে।

'এভাবে যাওয়া যাবে না,' আরও কয়েক গজ যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এগুলো ওদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওদিকের বরফ শক্ত।'

মাথা ঝাঁকাল জুনো। দুজন একযোগে ঘুরে ফিরতি পথ ধরল। প্লেনটার লেজের কাছে ফিরে এসে সাবধানে সরু ফাঁকটা টপকাচ্ছে ওরা, দেখল পোর্ট ইঞ্জিন ঘুরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন বিক্ষুব্ধ প্রফেসর, বরফের উপর খুব জোরে পা ফেলায় খ্যাচ্ খ্যাচ্ আওয়াজ হচ্ছে।

ওদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন তিনি। 'এভাবে ওখানে আমাদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে...আচ্ছা, সে যাক, আমি সে-কথা বলতে আসিনি...'

কাঁধের বাক্সটা কমকরেও মণ দুয়েক ওজন হবে, পিচ্ছিল বরফে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। 'প্রফেসর, পরে কথা বলি আমরা? বাক্সটা পড়ে গেলে কয়েকদিনের খাবার নষ্ট হবে।'

'খাবার? তুমি **খাবার** রক্ষা করছ? আমার ইকুইপমেন্ট কোথায়? হয়তো খিদেও পাবে না, তার আগেই আমাদেরকে উদ্ধার করা হবে: কিন্তু ইকুইপমেন্টগুলো এত দামী, নতুন করে আনাতে কয়েক

মাস লেগে যাবে। কী আশ্চর্য, তোমাদের সেন্স অভ প্রায়োরিটি নেই?'

ডানা থেকে পিছলে নেমে এল কো-পাইলট হোমার।

রানার মাথায় হঠাৎ একটা আইডিয়া ঢুকল। 'আমার ধারণা, প্রফেসর, প্লেনটা ক্র্যাশ করার শুরুতেই আপনার বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট ছিটকে পড়ে গেছে। আপনি বরং মিস্টার হোমারকে নিয়ে ওদিকটা সার্চ করে দেখুন। বরফে ঢাকা পড়ার আগেই বাক্সগুলো উদ্ধার করা দরকার।'

দূরে তাকালেন প্রফেসর, যে ট্রেইল তৈরি করে প্লেনটা এখানে পৌঁছেছে সেটার পাশে পড়ে থাকা বাক্সগুলো দেখতে পেলেন। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা। 'দারুণ আইডিয়া!' সঙ্গে সঙ্গে জোর কদমে রওনা হয়ে গেলেন তিনি, হোমারও ওঁর পিছু নিতে দেরি করল না।

বাক্স দুটো নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এসে নামিয়ে রাখল রানা আর জুনো।

'সার!' পিছন থেকে ডাকল রানা, শুনতে পেয়ে ওর দিকে খানিকটা ঘুরলেন প্রফেসর মনসুর। 'শুধু মনে রাখবেন, সাতশ' ফুট ফ্রিজিং ওয়াটার ছাড়া আমাদের নীচে আর কিছু নেই, আর বরফের স্তরটা খুব বেশি পুরু নয়।' একটা পা উঁচু করে সবেগে নামিয়ে আনল বরফে, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল।

হাত ঝাঁকালেন প্রফেসর, জানাতে চাইলেন ব্যাপারটা বুঝেছেন তিনি, কিন্তু আবার সেই জোর কদমেই হাঁটতে শুরু করলেন। তবে ওঁর পিছু নিয়ে এত সাবধানে এগোচ্ছে হোমার, যেন ডিমের খোসার উপর দিয়ে হাঁটছে।

জুনোকে নিয়ে অস্টিনের কাছে ফিরে এল রানা। হোমারকে না পেয়ে একাই খাবারভর্তি বাক্সগুলোর সঙ্গে কুস্তি লড়ছে সে। ওগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে পিছিয়ে আনার ফলে হ্যাচওয়ের ডোরটা আংশিক দেখা যাচ্ছে। আরও কয়েকটা বাক্স সরালে সহজে আসা-

যাওয়া করা যাবে।

'অনেক সময় নিলে,' বলল অস্টিন।

'প্রফেসর আর হোমারের সঙ্গে দেখা হলো। পেছনের ট্রেইলটা দেখতে পাঠিয়েছি, ইকুইপমেন্টের বাক্স পেলে তুলে আনবে,' বলল রানা।

'বেশ করেছ। শোনো, এ-সব বাক্স বেশি দূরে নিয়ে যাবার দরকার নেই। প্লেনের কাছেই থাকব আমরা, কারণ এরকম পরিস্থিতিতে সেটাই স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজিয়ার। তবে ওদিকটায় চলে যাওয়া দরকার আমাদের, এদিকটা বড় বেশি নোংরা...'

'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না...' শুরু করল রানা।

'তা হলে কোরো না!'

'তুমি বাধ্য করছ,' বলল রানা। 'কারণ প্লেনের কাছাকাছি থাকাটা একদম উচিত হবে না। চারদিকে প্রচুর ফুয়েল, যে-কোনও মুহূর্তে প্লেনটা বিস্ফোরিত হবে।'

'ননসেন্স! এখনও ওটায় আগুন ধরেনি, পরে ধরারও আমি কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে...ইঞ্জিন বন্ধ। সবই খুব নিরাপদ লাগছে।' সিলভার ফিউজিলাজে চাপড় মারল অস্টিন। অন্ধকার হোল্ডে দোল খেল বিচ্ছিন্ন তার। পেট্রলের ঝাঁঝ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে ধনুকের আকৃতি তৈরি করে ছুটল আগুনের একটা ফুলকি।

কথা আর না বাড়িয়ে শ্রাগ করল রানা। জুনোকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে আরও একটা ভারী বাক্স কাঁধে তুলল ও। দুজন দুটো বাক্স নিয়ে ফাটলের ওদিকে, নিরাপদ দূরত্বেই রেখে এল।

দূর থেকে ভেসে এল প্রফেসর মনসুরের ভারী গলা। 'আরে, ধ্যাত্, এটার মধ্যে তো দেখছি ডাইনামাইট!'

মাথা নাড়ল রানা। থমথমে গলায় জুনো বলল, 'ঈশ্বর এই অভাগাদের অত্যন্ত ভালবাসেন; তা না হলে অনেক আগেই মরে যাবার কথা ছিল আমাদের।'

ঘুরে হাঁটা ধরল ওরা। পোর্ট ইঞ্জিনকে পাশ কাটাচ্ছে, শুনতে পেল, 'হাই, মিস্টার রানা! হাই, মিস্টার জুনো!'

ঘুরল ওরা, দেখল প্লেনের দরজা থেকে ঝুলছে মনিকা, পা দুটো একটুর জন্য ডানা ছুঁতে পারছে না। দ্রুত ওর নীচে চলে এল ওরা। 'চৌকাঠ ছেড়ে দিন,' বলল রানা। 'আমরা আপনাকে ধরব।'

'ঠিক আছে।' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো মনিকা। 'এই ছাড়ছি!' ডানার উপর পড়ল ও, সবেগে পিছলে এসে ওদের দুজনকে এত জোরে ধাক্কা মারল যে তিনজনই ছিটকে পড়ল পিচ্ছিল বরফে।

সবার আগে উঠে বসল মনিকা। 'আপনাদের ক্রিকেট খেলা উচিত,' বলল ও। 'কাউন্টিতে এরকম ফিল্ডারের খুব চাহিদা।'

'আর আপনার স্পোর্টস, কী হতে পারে সেটা?' জিজ্ঞেস করল রানা, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। 'ওয়েট-লিফটিং? শটপুট? হেভিওয়েট বক্সিং?'

'সেরকম কিছু হলে,' বলল মনিকা, চোখে ঝিক করে উঠল দুষ্টামি, 'প্রথমেই আপনাকে ধোলাই দিতাম—কথা দিয়েও আমাকে ধরতে না পারায়।'

রানা লক্ষ করল নার্ভাস ও আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠেছে মনিকা। শুধু তাই নয়, জট খুলে ব্রাশ করেছে চুল, কাপড়ও পাল্টেছে। ওকে নিয়ে অস্টিনের কাছে চলে এল ওরা।

ইতিমধ্যে হোল্ডে ঢোকার পথটা পরিষ্কার করেছে অস্টিন। মনিকাকে দেখে তার চোখ জোড়া চকচক করে উঠল। আচরণে স্মার্ট একটা ভাব এনে বলল, 'আরে, আপনাকেই তো দরকার আমার! লক্ষ্মী মেয়ের মত এই গর্তটার ভেতরে ঢুকে পড়ুন, তারপর ভেতরের বাক্সগুলোকে ঠেলে দরজার মুখে নিয়ে আসুন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' বাক্সগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে অন্ধকার হোল্ডের ভিতর ঢুকে পড়ল মনিকা। চোখ বুজল, অন্ধকারটা যাতে সয়ে আসে। সেজন্যই ওর মাথার উপর অকস্মাৎ জ্বলে ওঠা ক্ষণস্থায়ী নীল আগুনের ফুলকিটা দেখতে পেল না।

কয়েক সেকেন্ড পর অন্ধকার সয়ে এল চোখে। মনে হলো আজেবাজে জিনিসে ভর্তি একটা চিমনির তলায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আলো আসছে শুধু এক জায়গা থেকে, ফিউজিলাজের গা যেখানে সামান্য ছিঁড়ে গেছে। দেয়ালগুলোকে ভয় লাগছে, যেন চেপে আসছে ওর দিকে। বদ্ধ জায়গার ভিতর ক্লস্ট্রফোবিয়া-র হামলা হবেই, জানা আছে, তাই প্রথমেই গলা টিপে মারল ভয়টাকে, তারপর টান দিয়ে বাক্স সরাবার কাজে হাত দিল।

ওর ঠেলে দেওয়া বাক্সগুলো টেনে নিয়ে বরফের উপর সাজিয়ে রাখছে অস্টিন, সেখান থেকে ওগুলো তুলে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসছে রানা আর জুনো।

আরও দূরের বরফ থেকে দু'একটা বাক্স বয়ে নিয়ে এল প্রফেসর মনসুর আর হোমারের টিম, এরইমধ্যে খিদে পেয়ে যাওয়ায় বিজ্ঞানী ভদ্রলোক স্বীকার করলেন রানার কথায় যুক্তি ছিল। অবশেষে একটা তাঁবু পাওয়া গেল, আরও পাওয়া গেল বাক্সভর্তি গরম কাপড়চোপড়।

'তাঁবুটাকে টেমপোরারি চেঞ্জিং রুম হিসাবে ব্যবহার করা হবে,' বলল রানা। 'এসো, এখনই ওটা টাঙিয়ে ফেলি—কখন অচল হয়ে পড়ব কে জানে।'

সময় সত্যি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওদের সমস্ত শক্তি শুষে নিচ্ছে প্রচণ্ড শীত। জুনোর দক্ষ হাতও সহজ একটা কাজ করতে গিয়ে হাতড়াচ্ছে। তাঁবুটা টাঙাতে প্রচুর সময় লাগিয়ে দিল ওরা। ছোটখাট একটা পিরামিড, নীচটা আট বর্গফুট, ছয় ফুট উঁচু। শীতকে ঠেকাবার জন্য গাঢ় রঙের ভারী কাপড়ে যথেষ্ট ইনসিউলেইটার ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্ধকার হোল্ডের দিকে মুখ করে অস্টিন ডাকল, 'মনিকা?'

'বলুন।'

'ওরা একটা তাঁবু টাঙিয়েছে; খুব দরকারী সব জিনিসও পেয়ে গেছি আমরা। আশপাশে কোথাও কি একটা নেট দেখতে পাচ্ছেন?

বান্ডিল করা আছে, কোনও বাক্সে ভরা নয়। কমলা রঙের নাইলন, রশির মত।'

'ঠিক আছে, দেখছি।'

'গুড। এই কাজটা শেষ হলে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।' হেঁটে তাঁবুর কাছে চলে এল অস্টিন, ওদেরকে বলল, 'প্লেন থেকে অনেক বেশি দূর হয়ে গেছে। খোলো আবার, সরাতে হবে।'

'ঝুঁকি নেয়ার কী দরকার?' তাঁবুর ভিতর থেকে বলল রানা। ও আর জুনো কাপড় পাল্টাচ্ছে ওখানে। 'প্লেনটাকে কেউ দেখতে পেলে, আমাদেরকেও দেখতে পাবে। এখানে আমরা বিপদসীমার বাইরে, প্লেনে আগুন লাগলেও ভয়ের কিছু নেই।'

'আগুন লাগবে? কেন আগুন লাগবে? দুটো ইঞ্জিন বন্ধ, তাই না? কী, মিস্টার হোমার? প্লেনটা নিরাপদ নয়? আপনিই বলুন!'

'না...হ্যাঁ, নিরাপদ,' বলল হোমার। 'আপনি যদি...'

'শুনলে! বললাম না...'

'...যদি ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে থাকেন,' কো-পাইলট নিজের কথা শেষ করল।

'ব্যাটারি? সর্বনাশ—মেয়েটা আছে ওখানে!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল অস্টিন। 'মনিকা হোল্ডের ভেতরে!'

তাঁবুর ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, এখনও জ্যাকেটটা ভাল করে গায়ে দিতে পারেনি, ফার দিয়ে কিনারা মোড়া হুডটাও ঠিকভাবে বসানো হয়নি মাথায়। প্লেনের দিকে হনহন করে এগোল ও, পিচ্ছিল বরফের উপর ঘন ঘন পিছলাচ্ছে আর হোঁচট খাচ্ছে। বাকি সবাই এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর একই রকম জরুরি ভঙ্গিতে পিছু নিল ওর।

অস্টিন চলে যাওয়ার পর হোল্ডের কোথাও কোনও কমলা রঙের বান্ডিল খুঁজে পেল না মনিকা। হঠাৎ ভাবল, প্লেনটা বরফের সঙ্গে

ধাক্কা খাওয়ার সময় বান্ডিলটা সামনের দিকে ছিটকে পড়বার কথা না?

হোল্ডের তলায়, একপাশে, দেয়াল জুড়ে রাজ্যের পাইপ আর কেইবল্ রয়েছে। শক্ত হলে ওগুলোয় পা দিয়ে খুব সহজেই উপরে ওঠা যায়। হাত বাড়িয়ে পরীক্ষা করল ও। কী কারণে যেন গরম হয়ে আছে, তবে যথেষ্ট শক্ত।

ওগুলোয় পা দিয়ে অনায়াসে উপরদিকে উঠে যাচ্ছে মনিকা। যে পাইপ বা কেইবলে পা রাখতে যাচ্ছে প্রথম দিকে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করল সেটা যথেষ্ট শক্ত কিনা, কিন্তু যত উপরে উঠল ততই ওর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল—মাত্র তো বিশ ফুটের ব্যাপার, পা পিছলালেও এটা-সেটা ধরবার অনেক কিছু আছে।

যত উপরে উঠছে কেইবল্ আর পাইপ তত বেশি গরম লাগছে ওর, তবে যন্ত্রণাদায়ক কিছু নয়, বরং হাত দুটো এখন আর অসাড় লাগছে না। থামল মনিকা, চারদিকে তাকাল। অন্ধকার গাঢ় এখানটায়, ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। আরেকটু উপরে উঠল, নরম কী যেন ধাক্কা লাগল কাঁধে। নেট!

ওটা ধরে টানল মনিকা, কিন্তু কিছু একটায় বেধে থাকায় নামানো যাচ্ছে না। ঠেলে ওটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আরেকটু উঁচু হলো ও।

নেট ছাড়িয়ে আরও খানিক উপরে মিটমিট করা নীল আলোটা দেখতে পেল মনিকা। ওর মুখের পেশি টান টান হলো। জিনিসটা কী জানে ও—ঈশ্বরের কিরে, বাইরে বেরিয়ে ওই জন অস্টিনকে একহাত নেবে সে। তবে, প্লেনটা যেহেতু বিপজ্জনক, বান্ডিলটা ভিতরে থাকার চেয়ে বাইরে থাকাই ভাল।

একটা প্যাকিং কেসের ভাঙা কিনারায় বেধে আছে নেটের বান্ডিলটা। কেসটায় ওর ড্যাডির কিছু ইকুইপমেন্ট রয়েছে। সবই কাঠের তৈরি।

বান্ডিলটা ছাড়িয়ে নীচে ফেলে দিল মনিকা। নিজেও নামতে

শুরু করেছে, তবে মাথার উপর নীল ফুলকির ছুটোছুটি মুগ্ধ চোখে দেখছে ও। পাঁচ ফুটের মত নেমেছে, এই সময় ওর পুলওভারটা একটা কিছুর সঙ্গে আটকে গেল। থামল ও, খানিকটা উপরে উঠল, দেখল একটা ব্রাকেটে আটকে গেছে পুলওভারের কয়েকটা উল।

এক হাতে ওগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করছে, অপর হাতে ধরে আছে পাইপ আর কেইবল্, এই সময় পায়ের নীচের পাইপটা খসে পড়ল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল শরীর, বাম হাতে ঝুলছে মনিকা।

নড়ে উঠল প্লেন। ওর মাথার উপর নীল আলো আরও উজ্জ্বল ও বিরতিহীন হয়ে উঠল। হাতের ভিতর উষ্ণ তার হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পোড়া একটা গন্ধে ভরাট হয়ে উঠল মাথার ভিতরটা। বিষম খেল, খক্ খক্ কাশছে। গরম তার আর ধরে রাখতে পারছে না, তালুতে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে।

মনিকা বুঝল, তার ছাড়তে হবে। নীচে তাকিয়ে দেখে নিল কোথায় পড়েছে নেটের বান্ডিল। ওটাই ওর টার্গেট। ওহ্ নো, এত ছোট! চোখ বুজে তার ছেড়ে দিল ও।

ঝাঁকি খেল পুলওভার, ব্রাকেটে আটকানো উল ছিঁড়ে গেল। সবেগে নেমে এসে বান্ডিলটার উপর পড়ল মনিকা। পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটাকে, ধাক্কা খেল ইস্পাতের দেয়ালে, তারপর আর কিছু জানে না।

ওর উপরে বিচ্ছিন্ন তারের আবরণ পুড়তে শুরু করেছে। শিখাটা তার ধরে উঠে যাচ্ছে উপরে আটকানো প্যাকিং কেসটার দিকে, যেটায় বেধে গিয়েছিল নেটের বান্ডিলটা। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল ওটায়, একটু পর পাশের কেসেও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্লেনের গোটা নাক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আগুনের শিখা ক্ষতিগ্রস্ত ফুয়েল-পাইপ ধরে এগোচ্ছে, চেষ্টা করছে, যদি কোনওভাবে ট্যাংকে ঢোকা যায়!

আট

হোল্ডের কাছে একা পৌঁছাল রানা, পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। খোলা দরজার ভিতরে লালচে আভা নাচানাচি করছে।

এখানে আসবার পথে প্লেনের মাথার দিকেও এই আভা দেখেছে ওরা, প্লেন বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে কেউ আর সামনে বাড়তে সাহস করেনি।

রানার সঙ্গে শুধু জুনো ছিল, ধমক দিয়ে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে রানা।

আগুনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার, 'মনিকা? মনিকা, শুনতে পাচ্ছেন?'

সাড়া নেই। সামনে কয়েকটা বাক্স পড়ে রয়েছে, লাফ দিয়ে সেগুলোকে টপকে দরজার সামনে পড়ল রানা। দরজাটা ছোট, ভিতরে ঢুকতে কষ্ট হচ্ছে ওর। আগুনের আঁচ খুব বেশি নয়, তবে বিপদের আশঙ্কাটা মারাত্মক। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মনিকাকে দেখতে পাচ্ছে ও, নাগালের অনেক দূরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

ঢুকতে গিয়েও ঢুকছে না রানা, কারণ মনে হলো মেয়েটা মারা গেছে। তারপর দেখল গায়ে একরাশ ফুলকি পড়তে নড়ে উঠল। 'মনিকা! মনিকা, শুনছেন!' নাহ্, কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

'রানা!' দূর থেকে ভেসে এল জুনোর কণ্ঠস্বর। ধমক খেয়ে অদ্ভুত আচরণ করছে ও। এই এক ছুটে রানার কাছাকাছি চলে আসছে, তারপরেই আবার ঘুরে দৌড় দিয়ে খানিকটা দূরে সরে

যাচ্ছে। প্লেন এখন বোমা, সলতেতে আগুন দেওয়া হয়ে গেছে, প্রাণপ্রিয় বন্ধু ওটার ভিতর ঢুকতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না ও।

'সাবধান, কাছে এসো না!' গলা চড়িয়ে সতর্ক করল রানা। 'কেউ তোমরা কোনও সাহায্যে আসবে না। যে-কোনও মুহূর্তে বার্স্ট করবে প্লেন।' নিজে সাহস করে এগিয়ে এলেও, ভয়ে বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে ওর।

তিরস্কার করল নিজেকে রানা—জীবনের প্রতি যার এত মায়া, এরকম সংকটে ইতস্তত করে যে লোক অমূল্য কয়েকটা সেকেন্ড নষ্ট করে, তার তো ছাপোষা জীবন বেছে নেওয়া উচিত ছিল!

আড়ষ্ট ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হোল্ডের ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ওকে ঢুকতে দেখে পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল জুনো, 'আমি আছি, রানা! ওকে তুমি শুধু দরজা দিয়ে বের করে দাও!'

ভিতরে ঢুকে মাথা নিচু করে এগোল রানা। পাঁজাকোলা করে দু'হাতে তুলল মনিকাকে, ঘুরে দরজার দিকে ফিরছে। আগুনের ফুলকি আর জ্বলন্ত কাঠের টুকরো উজ্জ্বল তুষারের মত নেমে আসছে উপর থেকে।

প্লেনের বাইরে বরফে হাঁটু গাড়ল জুনো, দরজার ভিতর থেকেই ওর বাড়ানো দু'হাতে মনিকার অসাড় শরীরটা তুলে দিল রানা। ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় নড়ে উঠল মনিকা। 'নেটটা!' বলল ও, বেশ স্পষ্ট করেই।

'বাদ দিন নেট!' বলল জুনো, মনিকাকে নিয়ে সিধে হচ্ছে। তারপর ওকে একটা বস্তার মত ডান কাঁধে ফেলল, রানা বেরিয়েছে কি না দেখবার জন্য ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

দোরগোড়ায় রানা নেই দেখে হকচকিয়ে গেল জুনো। পরমুহূর্তে দেখল দরজা দিয়ে নেটের বান্ডিলটা বেরিয়ে আসছে, ওটার পিছু নিয়ে রানাও।

প্লেনের লেজের কাছে বরফ ঠিক স্থির নয়। ফাটলটা আর বেশি

চওড়া না হলেও, জোড়া লাগবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করছে না। দুই বন্ধু সাবধানে টপকে এল ওটাকে, তারপর যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যাচ্ছে, যে যার বোঝা সম্পর্কে সাবধান।

ওদের পিছনে আগুনের শিখা সহজ কোনও পথে ফুয়েল ট্যাংকে ঢুকতে না পেরে ফিউজিলাজের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। পেট্রলে ভিজে আছে তুষার, সহজেই জ্বলে উঠল। সরু অনেক ফাটলেও পানির সঙ্গে স্রোতের মত বইছে, আগুন ধরে গেল সেগুলোয়।

মোচড় খেতে শুরু করল বরফ, চচ্চড় আওয়াজ করে ভাঙছে। নৃত্যরত ম্লান শিখায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জেটটা। আগুনের গর্জনে কার সাধ্য কিছু শুনতে পায়। থরথর করে কাঁপছে বরফ, যেন বিরতিহীন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। পঞ্চাশ গজেরও বেশি দূর থেকে ওরা ছ'জন সারভাইভার তীব্র আঁচ অনুভব করছে।

তারপর, অবশেষে, গুরু-গম্ভীর হুঙ্কার ছেড়ে বিস্ফোরিত হলো ট্যাংকগুলো। নিষ্প্রভ আকাশে উঁচু হলো আগুনের একটা স্তম্ভ। জ্বলন্ত ধাতব আবর্জনা বৃষ্টির মত নেমে এল ওদের চারপাশে, তবে কারও গায়ে লাগল না। পুরো একটা চাকা প্রচণ্ড বেগে লাফাতে লাফাতে ছুটছে, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। হঠাৎ করে যেন কোনও দানব উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাঁবুটাকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। চ্যাপ্টা হয়ে গেল ওটা, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বাক্সগুলো, আতঙ্কে উন্মাদ করে তুলল সবাইকে।

প্রচুর ফুয়েল বরফের ফাটলগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে আগুনের তাপ ওগুলোতেই জমাট বেঁধেছে। বরফ গলে চওড়া হলো ওগুলো, এক সময় শুধু নিচু এক সারি পাহাড় বিরাট বাহুটাকে জায়গামত ধরে রাখল।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তি পাহাড়-প্রাচীর আর ওভারহ্যাঙের নীচ থেকে ছড়িয়ে পড়ল, বাহুটার কয়েক হাজার টন মেরুদণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে ছুটল আকাশের দিকে। ভয়ানক একটা গর্জন উঠল, সেই বিকট আওয়াজের সঙ্গে অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাহুটা।

বরফের বিরাট প্ল্যাটফর্ম সামান্য দোল খেল, ঝাঁকি খেল দুই কি তিনবার, তারপর সমুদ্রগামী একটা জাহাজের ভাব-গাম্ভীর্য আর মহিমা নিয়ে এগোতে শুরু করল, বেরিয়ে চলে এল সাগরে। ওদের বিধ্বস্ত প্লেন আর পাহাড়-প্রাচীরগুলোকে বাদ দিয়ে বিশ একরের কিছু বেশি বরফ, কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত পুরু। এরকম আরও অসংখ্য ভাসমান বরফের সঙ্গে একটাই পার্থক্য, এটার ঠাণ্ডা মেঝেতে ছ'জন মানুষ অসাড় হয়ে পড়ে আছে, আর আছে ছড়ানো-ছিটানো সতেরোটা প্যাকিং কেস, ভেঙে পড়া একটা তাঁবু, আর ছিটকে আসা খানিকটা আবর্জনা।

আর্কটিক মহাসাগর ধরে রওনা হয়ে গেল ওরা। প্যাকের দৃঢ় নিরাপত্তা আর শক্ত আশ্রয় থেকে ক্রমশ দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে গেছে কো-পাইলটের।

'মিস্টার হোমার—উঠুন, উঠুন।'

ইংরেজি ভাষা। চোখ মেলেই আবার বন্ধ করল হোমার, তীব্র উজ্জ্বলতা সহ্য করতে পারছে না। মাথাটা বার কয়েক ঝাঁকিয়ে আবার খুলল। সুপুরুষ বাংলাদেশী ভদ্রলোক, মাসুদ রানা, ওকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, কপালে চিন্তার রেখা।

'ঠিক আছে,' বলল হোমার। 'ওকে।' এলোমেলো একটা রেখা তৈরি করে পড়ে রয়েছে দলের সবাই, ওর পরের জন প্রফেসর মনসুর। দীর্ঘদেহী মানুষটাকে তাঁর দিকে হেঁটে যেতে দেখছে ও।

'প্রফেসর মনসুর, আপনি সুস্থ তো?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ।' কাঁপতে শুরু করলেন প্রফেসর।

'এখনই আপনার জন্যে গরম কাপড় আনা হবে,' বলল রানা।

মাথাটা ঘোরালেন প্রফেসর। গা থেকে আলগা বরফ ঝেড়ে ফেলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হতে দেখলেন হোমারকে। ওর খানিক সামনে পড়ে রয়েছে মনিকা, একদম স্থির। উথলে ওঠা আবেগে

বুকে একটা চাপ অনুভব করলেন, বিজ্ঞানী হিসাবে যে জিনিসটার প্রতি তাঁর কোনও সমর্থন নেই। হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল—প্লেন! 'আমার ইন্সট্রুমেন্ট!' বললেন তিনি।

'সব গেছে, কিছুই পাবেন না।'

বাক্সগুলোর দিকে তাকালেন প্রফেসর, শুধু ওগুলোই রক্ষা পেয়েছে। 'পাব না?'

মাথা নেড়ে আরেকদিকে এগোল রানা। অস্টিনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ও, দেখতে পেয়ে নিজেই নিঃসাড় পড়ে থাকা মেয়ের দিকে টলতে টলতে এগোলেন প্রফেসর।

অস্টিন দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে রানা। এই মাত্র জ্ঞান ফিরেছে ওর, সারা শরীর ব্যথা করছে। আধবোজা চোখে দেখতে পেল হাঁটু গেড়ে বসবার সময় রানার মাথা সূর্যটাকে আড়াল করে ফেলল। 'অস্টিন!'

'খবরদার, তুমি আমাকে ছোঁবে না!' বরফের উপর ঘষা খেয়ে শত্রুর কাছ থেকে পিছিয়ে গেল অস্টিন, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। চোখ বুলিয়ে ফ্লো—ভাসমান বরফের মাঠ—দেখছে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে আতঙ্কিত বোধ করল অস্টিন, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। বরফের বাহুটা প্যাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছে, ওরা ভেসে চলেছে স্রোত আর বাতাসের দয়া ও মর্জি মোতাবেক।

অস্টিনের মনে হলো, ওরা কেউ বিপদটা সম্পর্কে সচেতন নয়। মুখ খুলল কিছু বলবার জন্য, কিন্তু চরম একটা অসহায় বোধ গ্রাস করল ওকে, গলা থেকে কিছু বেরুল না। হঠাৎ অসম্ভব ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে। বোকার মত বাকি সবার দিকে পালা করে তাকাচ্ছে।

বাক্সগুলোর মাঝখানে ব্যস্তভাবে কী যেন করছে জুনো। প্রফেসর মনসুর মেয়েকে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন, মনিকার চুল বরফের উপর সোনালি জলপ্রপাতের মত ঝুলে রয়েছে। দৃশ্যটা

অস্টিনের উরুসন্ধিতে একটা পুলক জাগিয়ে তুলল।

হোমারকে দেখা গেল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

অস্টিন আরও লক্ষ করল, শুধু রানা আর জুনোর পরনে মেরু এলাকার উপযোগী পরিচ্ছদ, বাকি সবাই ঠাণ্ডায় জমে মারা যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। রানা যদি ওদেরকে না জাগাত, কারও ঘুমই এ-জীবনে আর ভাঙত না। ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে প্রফেসর আর মনিকার দিকে এগোল ও, শুনতে পেল ওর পিছনে পিচ্ছিল বরফের উপর সিধে হচ্ছে রানা।

'আপনার মেয়ে কেমন আছে?' প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল অস্টিন।

'আমি ভাল আছি,' মনিকা নিজেই জবাব দিল।

'বেশ, বেশ।' এক পলকের নোটিশে অস্টিন যেন ওর সারা মুখে ঝলমলে হাসির আলো জ্বেলে ফেলল। 'প্লেনটার ভেতর একা ওভাবে ঢুকে খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ, তুমি সম্ভবত আমাদের সবার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

উত্তরে মৃদু হাসল মনিকা, বলল, 'ধন্যবাদ, মিস্টার অস্টিন।'

'প্লিজ, আমাকে জন বললেই খুশি হব। ভাল কথা, প্রফেসর, আমাদের সবারই তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টানো দরকার, তা না হলে ভোরের দিকে দেখা যাবে রানা আর জুনোই শুধু বেঁচে আছে।'

'জুনো ওখানে তোমাদের সবার জন্যে কাপড় বাছাই করছে।'

'যাই, ওকে আমি সাহায্য করি,' বলে সেদিকে এগোল অস্টিন। 'তাঁবুটাও আবার খাড়া করা দরকার,' শেষ কথাটা খামোখা বলা, কারণ চোখের কোণ দিয়ে আগেই দেখতে পেয়েছে রানা ইতিমধ্যে টাঙিয়ে ফেলেছে ওটা।

কাজটা সেরে আরেকদিকে চলে গেল রানা। অস্টিনকে এগিয়ে আসতে দেখেও না দেখবার ভান করল জুনো।

দিক বদলে তাঁবুটায় ঢুকল অস্টিন। তাঁবুর দেয়াল কয়েক

জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ায় ভিতরে আলো আছে। বাক্স থেকে বের করা কাপড়ের কয়েকটা বান্ডিল নেড়েচেড়ে দেখল। নিজের জন্য ইনসুলেটেড ওয়াটার-প্রুফ ওভারট্রাউজার, নেকড়ের চামড়া দিয়ে কিনারা মোড়া প্লাস্টিক জ্যাকেট, সিলমাছের চামড়া দিয়ে তৈরি গ্লাভ ও বুট বাছাই করল ও।

ওগুলো পরে বাইরে বেরিয়ে এসে হাত-ইশারায় জানাল, এরপর তাঁবুতে ঢুকবে মনিকা।

একটু দূরে, তাঁবুর আরেক পাশে, কয়েকটা বাক্স পড়ে রয়েছে; মাথায় কুবুদ্ধি ঢুকতে সেদিকে এগোল অস্টিন। প্রথম বাক্সটা খুলছে ও, ভিতরে স্লিপিং-ব্যাগ রয়েছে। ওটা বের করছে, কাজের ফাঁকে চারদিকে সতর্ক চোখ বুলাল—না, ওর দিকে কেউ তাকিয়ে নেই; আর রানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর গায়ের সরু ফাটলটায় চোখ রাখল এবার। বাতাস লাগায় স্থির থাকছে না তাঁবু, তারপরও ওর চোখে নড়াচড়া ধরা পড়ল।

আরেকটা স্লিপিং-ব্যাগ বের করবার জন্য ঝুঁকল অস্টিন, আবার ফাটলটায় তাকাতেই তাঁবুর ভিতর একটা নগ্ন বাহু দেখতে পেল। হঠাৎ করেই তাঁবুর একটা পাশ ফুলে উঠল, মনিকাকে দেখতে পেল, এক পায়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে, আরেক পা আন্ডারপ্যান্টে ঢোকাবার জন্য তৈরি—নিতম্ব, পিঠ আর বাহু সহ নধর নারীদেহ ওর শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

'অস্টিন!' ওর পাশে চলে এসেছে রানা।

অস্টিন ভাবল, জানে ও! রানা জানে! বন করে ঘুরল, চোখে আগুন। 'কী?'

নয়

'শোনো। ফ্লো-র চারদিকটা দেখে এলাম। বিরাট, বিশ একরের কম নয়। ভাল হয় আমরা যদি ওদিকে সরে যাই।' হাত তুলে দেখাল রানা। 'ওদিকটা চওড়া, বরফও অনেক বেশি পুরু, ক্যাম্প ফেলার জন্যে আদর্শ।'

প্রসঙ্গের পরিবর্তন মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত করে তুলল অস্টিনকে। তারপর নিজের উপর রাগ হলো, ওর আগে প্ল্যান তৈরির সুযোগ রানা পায় কীভাবে? ক্যাম্প ডিরেক্টর হিসাবে ওরই তো উচিত ছিল সবার আগে চারপাশটা দেখে আসা। 'আচ্ছা, বোঝা গেল, আমার কাজে সাহায্য করার ইচ্ছে আছে তোমার। আইডিয়াটা মন্দ নয়। ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভেবে দেখব আমি।'

'ব্যাপারটা আমাদের সবাইকে সিরিয়াসলি নিতে হবে, অস্টিন,' বলল রানা। 'আমরা এখানে মারা যেতে পারি...'

'থামো তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল অস্টিন। 'দশ বছর ধরে আলাস্কায় কাজ করছি, আমি এখানকার ক্যাম্প ডিরেক্টর, তোমার কথা আমাকে শুনতে হবে কেন?'

হাসি চেপে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, তারপর ওখান থেকে সরে গেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে মনিকা জানতে চাইল, 'হঠাৎ কী হলো?'

হোমার মাথা হেঁট করল, প্রফেসর অন্যদিকে তাকালেন।

'ব্যাপারটা হলো, মিস মনিকা,' বলল অস্টিন, 'রানা চাইছে আমাদের সবাইকে তার কথামত চলতে হবে।'

'ওঁর এরকম চাওয়ার পেছনে কারণ কী?' জানতে চাইল মনিকা। 'সারভাইভ করার বিশেষ কৌশল জানা আছে বুঝি?'

'মিস মনিকা! আচ্ছা, জবাব দাও, এরকম ক্লাইমেট-এ তুমি আগে কখনও ছিলে কি না।' এই একই প্রশ্ন প্রফেসর আর হোমারকেও করল অস্টিন।

ওদের সবারই প্রচণ্ড শীত সহ্য করার অভিজ্ঞতা আছে। কেউ ছিল গ্রিনল্যান্ডে, কেউ নরওয়েতে বা আইসল্যান্ডে।

উত্তর পেয়ে হাসতে শুরু করল অস্টিন। 'পরিষ্কার হয়ে গেল, এই পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কীভাবে সারভাইভ করতে হবে জানা আছে। তা হলে কেন কারও কাছ থেকে হুকুম শুনতে যাই?'

'আচ্ছা, তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল জুনো। 'আপনারা সবাই এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন? আপনি, প্রফেসর মনসুর—সার, শেষ কবে যেন আপনি প্যাকে ছিলেন, প্লিজ?'

উত্তরের অপেক্ষায় এক কি দুই মুহূর্ত অপেক্ষা করল জুনো। প্রফেসর মাথা চুলকাচ্ছেন দেখে মনিকার দিকে ফিরল ও। 'মিস মনিকা?'

'আমি আসলে কখনোই...'

'মিস্টার হোমার...'

'আমিও না।'

'অস্টিন; তোমাকে আমার জিজ্ঞেস না করলেও চলে। গোপনে না গিয়ে থাকলে, প্যাকে সারভাইভ করার কোনও অভিজ্ঞতা তোমার নেই।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, জুনো...'

'এক মিনিট, প্লিজ, অস্টিন। ব্যাপারটাকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখি। চারদিকে তাকান সবাই, তারপর আমাকে বলুন কী দেখতে পাচ্ছেন।'

মাতব্বরিটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বুঝতে পেরে দ্রুত চিন্তা করছে অস্টিন, চোখে হাতের ছায়া ফেলে চারদিকে তাকাল। 'বরফ দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি বরফের পাহাড়, সাগর, আকাশ, সূর্য...'

'ঠিক বলেছ, অস্টিন। দেখার আর কিছু নেই। কিন্তু যেগুলো আছে সেগুলোকে ঠিকমত চেনো তো? বরফ, পাহাড়, আকাশ আর সূর্যকে? ওগুলো আমাদের শত্রু...'

'ফর গড'স সেক!'

'না, অস্টিন...সাগর গড়ে আমাদের সাতফুট পায়ের নীচে হলেও, আমরা আসলে সি-লেভেল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে রয়েছি: আর পানি আমাদের শত্রু। স্রোত ঠাণ্ডা; লোনা হওয়ার কারণে ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি বেশি ঠাণ্ডা। কারও হার্ট যদি দুর্বল হয়, পানিতে পড়লে শুধু শক-ই সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে তাকে। আর সে যদি স্বাস্থ্যবান আর ফিট হয়, মিনিট দুয়েক বেঁচে থাকতে পারে।'

মনিকা ওর ড্যাডির দিকে একটু সরে গেল।

'আকাশ—যদি পরিষ্কার থাকে, তাপমাত্রা কমিয়ে আনবে; আর যদি মেঘ থাকে, ঝড় ডেকে আনবে। সূর্য—সাবধান না হলে সূর্য তোমাকে অন্ধ করে দেবে। আর বরফ—বরফ সম্ভবত আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ বন্ধুর ছদ্মবেশ নিয়ে আছে ওটা। বলেছি সাতফুট পুরু, ওটা গড় হিসাব। পাহাড়ে অনেক বেশি পুরু, এখানে হয়তো খুবই কম, মাত্র কয়েক ইঞ্চি। তারপরেই সাগর, সাতশ' ফুট গভীর। বরফের ওপর কোনও ভরসা নেই, হাঁটার সময় কখনও ধরে নিয়ো না ওটা তোমার ওজন সহ্য করতে পারবে।'

সবার দিকে একবার করে তাকাল জুনো। 'আমি বলতে চাইছি, সবাইকে মনে রাখতে হবে প্যাক আমাদের শত্রু। সতর্ক না হলে কেউ আমরা বাঁচব না।' ঘুরল এস্কিমো তরুণ, শান্ত পায়ে পিছু নিল প্রিয় বন্ধুর।

ওদের একমাত্র আশ্রয়, বরফের বিরাট বাহুটা ধরে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। এই মুহূর্তে দুই বন্ধু পাশাপাশি হাঁটছে। কিছুক্ষণ পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী বলল ওরা?'

'কী বলবে। ভয় পেয়েছে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জুনো। 'ওদেরকে আরও একটু সময় দিতে হবে আর কী!'

এক সময় থামল রানা। 'তাঁবু ফেলার জন্যে এই জায়গাটা পছন্দ করেছি আমি।'

ফেরার পথে কোনও কথা হলো না। তাঁবুর কাছাকাছি এসে রানা বলল, 'সুপের গন্ধ পাচ্ছি!'

বাতাস শুঁকল জুনো। 'অক্সটেইল!'

ফিরে এসে ওরা দেখল সবাই গরম কাপড় পরেছে। বাক্স আর তাঁবু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অস্টিনের নির্দেশিত জায়গায় ফেলা হচ্ছে ক্যাম্প, বলতে গেলে প্রথমটার পাশেই। ইতিমধ্যে আরেকটা বাক্স খোলা হয়েছে। সাধারণ সারভাইভাল কিট বেরিয়েছে সেটা থেকে—মাছ ধরবার সরঞ্জাম, কয়েক প্যাকেট প্রেসড় মিট, ক্যানভর্তি সুপ, ক্যান-ওপেনার, চকোলেট, একটা ছুরি, কমপাস, ডিস্যালাইনেইশন ইউনিট, স্টেরিলাইজেইশন ট্যাবলেট ও একটা ফায়ার-ট্রে।

শেষটা হলো ইস্পাতের, পাগুলো খাটো, এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে বরফের একটু উপরে যাতে দাঁড় করানো যায়। এই মুহূর্তে মনিকার দখলে রয়েছে ট্রেটা, টিনের সুপ বের করে অ্যালুমিনিয়ামের পটে গরম করছে ও, পাশেই এক লাইনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছ'টা মগ।

রানা ও জুনো ওদের দলে হাসিমুখেই যোগ দিল, এক এক করে সবকটা বাক্স খুলছে আর তাঁবুগুলো টাঙাচ্ছে। ওদেরকে ফিরতে দেখে হাসল মনিকা। না তাকিয়ে নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছে অস্টিন।

সব মিলিয়ে সতেরটা বাক্স; বরফ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে

আটটা, প্লেনের পেট থেকে বের করা হয়েছে ন'টা। এই ন'টার দুটো থেকে পাওয়া গেছে একজোড়া তাঁবু; গ্রাউন্ডশিট—দড়িদড়া ও ধাতব গোঁজ সহ। একটায় আছে ছ'টা স্লিপিং-ব্যাগ; একটায় বারোটা চাদর; একটায় গরম কম্বল; লম্বা বাক্সটায় পাওয়া গেল দুটো রেমিংটন রাইফেল, একটা ওয়েদারবাই, প্রচুর অ্যামিউনিশন আর ফ্লেয়ার; অপর একটা বাক্সে রয়েছে তিনটে কারবাইন, অ্যামিউনিশন সহ। দুটো বাক্সে খাবার জিনিস; একটায় আগেই পাওয়া গেছে সারভাইভাল কিট—রশি, নেট, নেট-স্ট্যান্ড আর তিনফুটী একটা কুড়াল।

বরফ থেকে সংগ্রহ করা বাক্সগুলোর একটায় পাওয়া গেল দুটো তাঁবু; একটায় রয়েছে কলাপসিবল ক্যানু ও একজোড়া কেমিকেল টয়লেট; একটায় সব সাইজের গরম কাপড়চোপড় আর কয়েক জোড়া স্নো-গগল; আরও রাইফেল, অ্যামিউনিশন ও ফ্লেয়ার নিয়ে একটা বাক্স; হার্পুন-গান আর চারটে হার্পুন রয়েছে একটায়; আলাদা বাক্সে রয়েছে ডাইনামাইট; শেষ দুটোয় পাওয়া গেল আরও খাবার জিনিস।

প্রথম তাঁবুটাকে গুদাম বানাল ওরা। ওটার ভিতরে আর বাইরে এমন সব বাক্স রাখা হলো যেগুলো এখনই ব্যবহার করা হবে না। প্রতিটি তাঁবুতে স্লিপিং-ব্যাগ, চাদর ও কম্বল রাখা হলো; শুধু দূরের তাঁবুটায় বাদে, ওটাকে টয়লেট হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

ফায়ার-ট্রের চারপাশে বসে তৃপ্তির সঙ্গে গরম সুপ খাচ্ছে ওরা।

'হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে খানিকটা পানি গরম করি,' নিজের মগটা খালি হতে বলল মনিকা; ওদের প্রায় প্রত্যেকের গায়েই এখনও শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে।

'আইডিয়াটা ভাল, তবে যা করার তাড়াতাড়ি করুন,' বলল রানা। 'তা না হলে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।' কথাটা সত্যি। বিস্ফোরণের পর থেকে শক আর অবসাদে রীতিমত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ওরা, তারপরেও যে এত কিছু করতে পেরেছে সেটাই

আশ্চর্য। সুপের মগে ওরা সবাই আধবোজা চোখে তাকাচ্ছে।

ফায়ার-ট্রেতে পানি গরম করতে দিয়ে মনিকা বলল, 'পানিতে লবণ থাকবে কি না কে জানে।'

'থাকবে না,' বলল রানা। 'প্রথম বছরেই সমস্ত লবণ বেরিয়ে যায়।'

ক্লান্ত মানুষগুলোর মাঝে নীরবতা জাঁকিয়ে বসতে ওভারটাইম খাটতে শুরু করল রানার ব্রেন। সবাইকে সজাগ করা দরকার কী পরিস্থিতিতে পড়েছে ওরা। প্যাক আর ফ্লো সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণাও থাকতে হবে। যেহেতু ওর অভিজ্ঞতা আছে, অবহিত করবার দায়িত্বটা ওকেই নিতে হবে।

মৃদুকণ্ঠে শুরু করল রানা। 'আর্কটিক বিরাট একটা জায়গা...' নিজের কানেই হাস্যকর লেকচার লাগছে। মুখ টিপে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল অস্টিন, অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

আর্কটিক সার্কেলের আকার আশি লক্ষ বর্গমাইল। মাঝরাতে সূর্য দেখা যায় এমন একটা বৃত্তের ভিতর বেশ অনেকটা জমিন থাকলেও, আর্কটিক মহাসাগর এত বিশাল যে সে-সব খুঁজে পাওয়াই দায়। শীতকালে প্রায় সবটুকুই জমাট বেঁধে যায়। গ্রীষ্মে প্যাকের কিনারা পিছু হটতে শুরু করে, আগস্টের দিকে হয়ে ওঠে সবচেয়ে ছোট; তারপরেও সেটা কখনোই ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইলের কম নয়।

চোখে-মুখে ক্লান্তি, এক ধরনের নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে রানার কথা শুনছে সবাই। বোঝা যাচ্ছে না সংখ্যাগুলো কারও মনে কোনও রকম দাগ ফেলছে কি না। ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল মানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বড় একটা এলাকা, এটা হয়তো জানা নেই ওদের। আবার শুরু করল রানা।

গড়ে প্যাকটা সাত ফুট পুরু, তবে ওদের এটার মত সমতল ফ্লো খুবই বিরল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, প্যাক কখনোই স্থির নয়। পোল-এর মাঝখানটাকে ঘিরে ঘড়ির কাঁটার দিকে সারাক্ষণ

ঘুরছে ওটা। বাতাস ও স্রোতই ঘোরাচ্ছে, প্রতিদিন দুই থেকে আট মাইল।

ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল আকারের একটা জিনিসকে নড়াতে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন, আর তাই নড়াচড়ার মধ্যে কোথাও যদি সামান্য দ্বিধা কিংবা অসঙ্গতি দেখা দেয় প্যাক আইস ভাঁজ খেয়ে যায়, ফাটল ধরে, স্তূপ হয়ে একশ' ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে যায়। কোনও সন্দেহ নেই এ-কারণেই ওদিকের নিচু পাহাড়গুলো মাথাচাড়া দিয়েছে, যার ফলে একসময় তৈরি হয়েছে এই ফ্লো।

মাত্র কয়েক গজ দূরে, ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট, অথচ সবুজের নানা রকম শেড নিয়ে কুঁজ আকৃতির ফাঁপা পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল না কেউ। নীরবতার মধ্যে টগবগ করে পানি ফোটার আওয়াজটাই শুধু শোনা যাচ্ছে।

ওদের এই ফ্লো যথেষ্ট বড়, বিশ একরের কম নয়। তবে কিনারাগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক, ভুলেও কেউ যেন ওদিকে না যায়।

ওরা তা হলে কী পেয়েছে? পাঁচশ' গজ লম্বা একটা বাহু, সবচেয়ে চওড়া জায়গাটা আড়াইশো গজ। বাহুটার অংশবিশেষ পাহাড়গুলোর স্প্যাইনাল কর্ড, বাকিটা সমতল মাঠ। পশ্চিমে পাহাড়গুলো ঢালু হয়ে সাগরে নেমেছে। কিছু চূড়া ওভারহ্যাঙ-এর আকৃতি নিয়ে ফ্লোর সমতল প্রান্তের দিকে কাত হয়ে আছে, জোরাল ঝাঁকি না খেলেও খসে পড়বার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আশঙ্কার কথা যখন উঠলই, জেনে রাখা ভাল মাঝখানের কমবেশি দশ একর ছাড়া ফ্লোর বাকি অংশ অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ এই দশ একর যে বিপদ-মুক্ত এলাকা, তা-ও নয়।

এবার উদ্ধার প্রসঙ্গ। কো-পাইলট হোমার রেডিওতে ক্র্যাশ পজিশন প্রচার করেছেন। প্লেন টাচ-ডাউন করবার পর কতটুকু এগিয়েছে ওরা? এক থেকে দুই হাজার গজ। তারমানে ওদেরকে খোঁজা হচ্ছে বর্তমান সাইট থেকে এক মাইলের মধ্যে।

'কিন্তু তখন তুমি বললে,' রানা থামতে প্রশ্ন তুলল অস্টিন, 'প্যাকও ভেসে যাচ্ছে। আর তা ছাড়া, ফ্লোটা আলগা হয়ে যাওয়ায় প্যাকের চেয়ে দ্রুত হবে না এটার স্পিড?'

'অনেক দ্রুত হবে। দিনে প্রায় দশ মাইল। পনেরও হতে পারে।'

তথ্যটা ওদের ক্যাম্প ডিরেক্টরকেও কাঁপিয়ে দিল। সব রক্ত নেমে গেছে মুখ থেকে। 'বলতে চাইছ, এই মুহূর্তে ওরা যদি না পৌঁছায়, ভাসতে ভাসতে বহু মাইল দূরে সরে যাব আমরা?'

সবাইকে উদ্বিগ্ন দেখল রানা। বলল, 'হ্যাঁ।'

'তবে এখনই কারও না কারও চলে আসার কথা, তাই না? একটা প্লেন?' জিজ্ঞেস করল মনিকা; প্রথমে রানা, তারপর হোমারের দিকে তাকাল।

কাঁধ ঝাঁকাল হোমার। 'নির্ভর করে কী আছে ওদের কাছে তার ওপর। বারোয় প্লেন ও কপ্টার, দুটোই আছে বলে জানি। কিন্তু আমি যখন মেডে পাঠাচ্ছি, বারো জানাল ওখানে বড় একটা ঝড় শুরু হতে যাচ্ছে। তার মানে ওরা হয়তো আকাশে কিছু তুলতেই পারেনি...'

'কিন্তু শিপ?' জিজ্ঞেস করল মনিকা। 'ওরা নিশ্চয় জাহাজকে অ্যালার্ট করবে?'

'তা করবে, তবে কোনও জাহাজ আমাদের যদি দেখতে পায় সেটাকে বিরল সৌভাগ্য বলতে হবে। ওরা জানবে আমরা প্যাকে আছি, কাজেই...'

নিরানন্দ পরিবেশটা নীরব হয়ে গেল। গরম পানিতে কাপড় ডুবিয়ে গায়ের শুকনো রক্ত পরিষ্কার করছে ওরা।

পাহাড়গুলো পাল আকৃতির, পুব থেকে আসা টানা বাতাস পেয়ে বিশ একর সমতল মাঠটাকে বোউফার্ট সাগরের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, পুরোদমে সাহায্য করছে জোরাল স্রোত। হোমারের শেষ মেসেজ পাঠানোর পজিশন থেকে ক্রমেই আরও

দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

তাঁবুতে ঢুকে নেতিয়ে পড়বার সময় সূর্য যথেষ্ট উপরেই থাকল। জুনোর সঙ্গে একটা তাঁবু শেয়ার করছে রানা, আরেকটায় থাকছে অস্টিন ও হোমার। প্রফেসর মনসুর আর মনিকা পাশাপাশি দুটো আলাদা তাঁবুতে, সাগরের সবচেয়ে কাছে ওগুলো।

স্লিপিং ব্যাগে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওরা ঘুমিয়ে পড়ল, একা শুধু মনিকা বাদে। ইনসুলেটেড আন্ডারপ্যান্ট পরে আছে ও, সবার মতই বাকি সব কাপড়চোপড় খুলে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে রেখেছে, যাতে গরম থাকে। ওর ঘুম আসছে না কিছুতে, দুশ্চিন্তা পাগল করে তুলছে। একটা ফ্লো ওদেরকে নিয়ে পালাচ্ছে, সভ্যজগতে হয়তো কোনও দিনই আর ফেরা হবে না ওর।

স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঘণ্টা দুয়েক ছটফট করল মনিকা। ওর দুশ্চিন্তা এখন আতঙ্কে রূপ নিচ্ছে। ব্যস্ত হাতে কাপড়চোপড় পরে বাপের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল ও। চোখে পানি, 'ড্যাডি! ড্যাডি!' করে ডাকছে।

গভীর ঘুমে তলিয়ে আছেন প্রফেসর। পাশ ফিরে চোখ খুললেন, সাদা ভ্রূ জোড়া কোঁচকালেন। 'কে তুমি?'

অভিমানে ডুকরে কেঁদে উঠল মনিকা, ঘুরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওর পিছু নিল প্রফেসরের কণ্ঠস্বর, 'মনি? মনিকা?'

থামল মনিকা, ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি দেখছি না। চোখে চশমা নেই, রে, মা। কী দরকার তোমার, মনি?'

মনিকা দেখল স্লিপিং-ব্যাগ থেকে মাথাটা বের করে কাঁপা কাঁপা হাতে চোখে চশমা পরছেন ড্যাডি। স্নেহের কাঙাল হৃদয়টা মোমের মত গলে গেল, জন্মদাতার দিকে হাত বাড়াল ও। ঠিক এই সময় তাঁবুর পিছন থেকে ভিতরে ঢুকল মেরু ভালুকটা।

দশ

বয়সে তরুণ প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক প্যাকের কিনারায় সিল শিকার করতে এসেছে, কিন্তু কপাল মন্দ, একটাও জোটেনি।

আরও আগে, সন্ধ্যার দিকে, একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ওটার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। ব্যাপারটা তদন্ত করতে গিয়ে মাইলখানেক দূরে মানুষ আর সুপের গন্ধ পেয়েছে।

সিল না পেয়ে নিজের পথে ফিরে যেত ওটা, কিন্তু সুপের গন্ধটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত পেট মোচড় দিল।

প্যাক থেকে নেমে রওনা হয়ে গেল ভালুক। গন্তব্যে পৌঁছে দ্রুত এক চক্কর সাঁতরে ভাসমান বরফের দ্বীপটাকে ভাল করে একবার দেখে নিল। পানিতে কীভাবে নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে হয় জানা আছে, চর্বির স্তরগুলো রক্ষা করছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে। নির্জন একটা জায়গা দেখে ফ্লোটায় উঠে পড়ল, ফার ঢাকা থাবার সাহায্যে এগোচ্ছে চুপিসারে।

একটা সাদা ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা; তবে পেশি, থাবা আর দাঁত সহ। নাকে মানুষের গন্ধ এখন তীব্র। একসময় তাঁবুটা দেখতে পেল, কিন্তু বুঝতে পারছে না জিনিসটা কী, কাজেই নিজের ইন্সটিঙ্কট্-এর নির্দেশে হামলা করে বসল।

তাঁবুর পিছনে দু'পায়ে খাড়া হলো, তারপর সামনের বিরাট দুটো থাবা আঁচড়ানোর ভঙ্গিতে নীচের দিকে নামাল, পাতলা কাগজের মত ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল তাঁবুর মোটা ক্যানভাস। সেই সঙ্গে একটা গর্জন ছেড়ে লাফ দিল ওটা।

হামলা করবার আধ সেকেন্ড আগে তাঁবুর গায়ে ওটার ছায়া দেখতে পেল মনিকা। আতঙ্কে ওখানেই জমে গেল, একচুল নড়ার শক্তি নেই। তারপর তাঁবুর ছিন্নভিন্ন দেয়ালের ফাঁকে কুৎসিত চ্যাপ্টা মুখটা দেখতে পেল ও, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, ফাঁক হয়ে আছে কালো ঠোঁট, বেরিয়ে পড়েছে হলুদ দাঁত।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মনিকা, লাফ দিল পিছন দিকে, টেনে নিয়ে চলেছে ড্যাডিকেও। মেয়ের পিছু নিলেন প্রফেসর, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন। আরেকটা গর্জন ছেড়ে তাড়া করল ভালুক, তবে পায়ে তাঁবুটা জড়িয়ে যাওয়ায় বাধা পেল।

মনিকার চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল রানা। কোনও বিপদ হয়েছে বুঝতে পেরে প্রস্তুত হতে শুরু করেছে। বুট জোড়া পায়ে গলাচ্ছে, ভালুকটার হুঙ্কার শুনতে পেল। কী ঘটছে বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'ভালুক,' বলল জুনো, সে-ও বুট পরতে ব্যস্ত।

মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্ল্যাপ সরাল রানা, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। একরাশ আলগা বরফ ছড়িয়ে আধপাক ঘুরল ও, চট করে একবার চোখ বুলাল দৃশ্যটার উপর।

দু'পায়ে ভর দিয়ে যতটুকু পারা যায় খাড়া হয়েছে শ্বেতভালুক, ভেজা টিস্যু-পেপারের মত ছিঁড়ে ফেলছে তাঁবুটাকে। মনিকা আর প্রফেসর মনসুর প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন, যাচ্ছেন আগুনটার দিকে। নিজেদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে অস্টিন আর হোমার।

'রাইফেল!' রানার চিৎকার শুনে দিক বদলে ওদের তিনজন সাপ্লাই তাঁবুর দিকে এগোল। প্যাকিং কেসগুলোকে এদিক সেদিক সরিয়ে তিনটে ক্রেইট খুঁজছে ওরা—ওগুলোয় কারবাইন আর অ্যামিউনিশন আছে।

'এই যে!' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অস্টিন। 'কারবাইন !' বাক্সের ঢাকনি ভেঙে ফেলছে ও। অ্যামিউনিশনের বাক্সটা রানা খুঁজে পেল, ঢাকনিটা দু'ফাঁক করে দিল ওর একটা ঘুসি।

'বাহ্,' বলল হোমার, দ্বিতীয় বাক্সটা খুলছে ও।

একটা কারবাইনে মাত্র ম্যাগাজিন ঢুকিয়েছে অস্টিন, এই সময় চোখে-মুখে জড়িয়ে যাওয়া তাঁবু থেকে নিজেকে মুক্ত করল ভালুক, আবার পিছু নিল প্রফেসর আর মনিকার।

রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির করল অস্টিন, তারপর ট্রিগার টিপল। যেন সাদা একটা পাহাড় ছুটে আসছে, ওটার পাশে লাফিয়ে উঠল বরফ। কিন্তু তারপরেই জ্যাম হয়ে গেল রাইফেলটা।

'যাহ্!' আঁৎকে উঠল অস্টিন, দেখল দ্বিতীয় রাইফেলে ম্যাগাজিন ভরতে গিয়ে হাতড়াচ্ছে হোমার।

বরফের উপর পড়ে থাকা সারভাইভাল-গিয়ার বক্সে পা বেধে যাওয়ায় দড়াম করে আছাড় খেলেন প্রফেসর, ওটা থেকে ধাতব কী যেন একটা বেরিয়ে এসে পিছলে মনিকার দিকে যাচ্ছে। ব্যথায় কাতর, আড়ষ্টভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন প্রফেসর, পিচ্ছিল বরফে আবার আছাড় খেলেন। এই সময় ভালুকটা ওঁর নাগাল পেয়ে গেল। খাড়া হলো ওটা, থাবা মারবার জন্য তৈরি।

পরমুহূর্তে ওখানে পৌঁছে গেল জুনো, ধরাশায়ী প্রফেসরের বুকের দু'পাশে পা রাখল, হাতের কুড়ালটা সবেগে ঘোরাল ভালুকটার মুখের সামনে। থামল ওটা, বিকট গর্জন ছাড়ল। রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠল কুড়ালের ফলা, আঘাত করতে যাচ্ছে বন্য প্রাণীটাকে। কিন্তু লাগল না, থাবার এক ধাক্কায় ওটাকে সরিয়ে দিল ভালুক।

হাত-পা ছড়িয়ে মেয়ের হাঁটুর কাছে পড়ে আছেন প্রফেসর মনসুর। অবস্থা বেগতিক দেখে দৌড় দেওয়ার জন্য ঘুরল জুনো, কিন্তু ওকে ধরে ফেলল ভালুক। ওদের দিকে তীরবেগে ছুটে আসছে রানা, হাতে অস্টিনের অকেজো রাইফেল। সারভাইভাল বক্স থেকে ছিটকে আসা জিনিসটা তুলল মনিকা—একটা ফ্লেয়ার পিস্তল।

'না!' আঁতকে উঠল রানা। 'জুনোকে লাগবে।'

হঠাৎ ওর পিছনে কড়াৎ করে গর্জে উঠল দ্বিতীয় রাইফেল, হোমারের হাতে। থ্যাচ্ করে ভালুকের কাঁধে ঢুকে গেল বুলেটটা। মাথাটা উঁচু হলো, মুখ থেকে লালার মোটা ধারা নেমে আসছে। জুনোকে ধরে পিছনদিকে ভাঁজ করছে ওটা।

আবার গর্জে উঠল রাইফেল। ভালুকের মাংস লাফ দিয়ে উঠতে দেখল রানা। গর্জে উঠল ওটা। ব্যথায় এখন উঁ-উঁ-উঁ করছে জুনো, অসহায়, তবে সচেতন যে জন্তুটা ওকে আরও শক্তভাবে চেপে ধরবার চেষ্টা করছে।

অকেজো রাইফেলটা মাথার উপর তুলল রানা, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল। বাঁটটা আহত কাঁধের উপর লেগে ভোঁতা আওয়াজ করল। আতঙ্কিত জুনোকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরল ভালুক। সঙ্গে সঙ্গে ওটার মুখে আরেকটা বাড়ি মারল রানা, মেরেই লাফ দিয়ে নাগালের বাইরে সরে এল।

কড়াৎ! গরম বাতাসের আঁচ লাগল রানার জুলফির পাশে। থামল ভালুক। রানা ঘুরল। রাইফেলে রেমিংটন সেভেনএমএম ম্যাগনাম বুলেট ভরছে হোমার। ছুটল রানা। পিছু নিল ভালুক। আবার ফায়ার করল হোমার। ভালুকের কাঁধে বুলেটটা যেন ব্যাঙের ছাতা তৈরি করল। কিন্তু আগের মতই রানাকে ধাওয়া করছে ওটা, সামান্য একটু খোঁড়াচ্ছেও না।

বরফের উপর চার পায়ে ছুটে, দ্রুত ব্যবধান কমিয়ে আনছে ভালুকটা। আগুনের কাছে পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় ওর নাগাল পেয়ে গেল ওটা। দশ ফুট উঁচু হলো, হাত বাড়িয়ে থাবা মারতে যাচ্ছে। বিপদ টের পেয়ে ঘুরে শত্রুর মুখোমুখি হলো রানা। ঠিক তখনই আরেকটা গুলি করল হোমার, কিন্তু ভালুকটার গা থেকে এক ফোঁটা রক্তও ঝরল না।

পিঠে মেটাল ট্রের আঁচ পাচ্ছে রানা। উজ্জ্বল, হিসহিসে শিখার দিকে বাম কাঁধটা কাত করল ও। আড়ষ্টভঙ্গিতে দু'এক পা সামনে বাড়ল ভালুক। মুখ নিচু করল। পচা মাছের দুর্গন্ধে বমি পেল

রানার, তবে ওর বাম হাত শিখার নাগাল পেয়ে গেছে। হাতটা আগুনের ভিতরে সেঁধিয়ে দিল। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল: মনিকা।

ভালুকের দুটো হাত ধরতে আসছে রানাকে, ওর মুখের কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে খুলে গেল চোয়াল, খটাস করে বন্ধ হলো আবার। ওটার গায়ে আরেকটা বুলেট বিঁধেছে। চর্বি আর মাংস ঝাঁকি খেতে দেখল রানা। গুলির আওয়াজ কানে প্রায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে: পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক। চেঁচিয়ে উঠল ভালুক। মুখ তো নয়, বিরাট গহ্বর, খুলে গেল আবার—রক্তলাল, ভয়ানক, গভীর।

রানার বাঁ হাতের গ্লাভ পুড়ছে, ফায়ার-ট্রে থেকে জ্বলন্ত একটা বোর্ড তুলে আনল কাঁধের উপর দিয়ে, তারপর সরাসরি ঢুকিয়ে দিল ভালুকের গলার ভিতর।

হিস্‌স্‌স্‌ আওয়াজ ভালুকের চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল, উৎকট পোড়া গন্ধে চাপা পড়ে গেল পচা মাছের দুর্গন্ধ। রানার বাম হাতটাকে টার্গেট করে শেষ একবার কামড় বসাল ওটা, খটাস করে বন্ধ হলো চোয়াল, দু'সারি দাঁতের মাঝখানে পায়নি কিছু। যন্ত্রণায় কাতর, দানবটা অনবরত কাশছে, থাবা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করছে বোর্ডের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশটাকে; তারপর দু'পায়ে হোঁচট খেতে খেতে পানির দিকে ছুটল। জুনোর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ভালুকটাকে লাফ দিয়ে সাগরে পড়তে দেখল ওরা।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, দোস্ত!' কেঁপে গেল জুনোর গলা।

সোনালি সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে পালাচ্ছে ভালুকটা, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাথাটা বারবার পানির উপর তুলে কাতর আওয়াজ করছে।

'হেল,' বলল অস্টিন, 'রাক্ষসটা সহজে মরবে না।' ঠিক ওই মুহূর্তে পানির ঠিক নীচেই ঝাঁকি খেল ভালুকের মাথা।

'কী...' কিছু বলতে গেলেন প্রফেসর।

মাথাটা আবার পানির উপর উঁচু হলো, হাঁ করা মুখ দিয়ে

আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে।

'ইশ্‌শ্‌! মা গো!' ফিসফিস করল মনিকা, কাছের একটা কাঁধে মুখ লুকাল। বোধহয় জানেও না যে ওটা রানার কাঁধ।

উথলে উঠল সাগর। ভালুকের চিৎকার অকস্মাৎ থেমে গেল, কারণ আবার ওটা পানির নীচে ডুব দিয়েছে। রানার আরেক কাঁধে লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল জুনোর হাত। এক হাত দিয়ে মনিকাকে জড়িয়ে ধরল রানা।

আলোড়িত পানির উপর মাথা তুলল ভালুক, হাঁ করা মুখ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল রক্তলাল ঝরনা, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে পড়ছে পনের ফুট দূরে। আবার ডুব দিল, তারপর ওটাকে আর দেখা গেল না।

সবার চোখ সাগরের দিকে, নীরবতার মধ্যে এই প্রথম নতুন একটা জিনিস দেখতে পেল ওরা।

একটা তিমির বিরাট তেকোনা ফিন; পানির সারফেস ভাঙল, সাবলীলভঙ্গিতে দূরে সরে যাচ্ছে। কিলার ওয়েইল!

জুনো বলল, 'ওটা রাক্ষস! ঈশ্বর যেন আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন।'

এগারো

প্রথমে জুনোর ঘুম ভাঙল, কান পেতে চারপাশের বিচিত্র শব্দ শুনছে। অবিরত চড়ুচড়ু শব্দে বরফ ভাঙা চলছে। বরফের ব্যানার আর পতাকায় লেগে সোঁ সোঁ আওয়াজ করছে বাতাস, তাঁবুর অবলম্বন রশিগুলোয় ঘষা খেয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। দূরে, আইস

ফ্লোরের কিনারায় আছড়ে পড়ছে ঢেউ। পানির নড়াচড়া আর উত্থান-পতন মৃদু টুংটাং টুংটাং জলতরঙ্গের বাজনা হয়ে ধরা দিচ্ছে কানে।

আরও দূরে, গভীর সাগরের বুকে অস্পষ্ট ক্লিক-ক্লিক, তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ, কর্কশ গর্‌র্‌র্ আর করুণ সুরে নরম কান্নার মত শব্দ তৈরি করছে।

যতই রোমাঞ্চকর আর সুন্দর মনে হোক, জুনোর খুব ভাল করে জানা আছে কিলার ওয়েইলের দলটা খুব বড় বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। তিমিগুলো যদি মনে করে ফ্লোর উপর এমন কিছু আছে যা তাদের দরকার, সেটা পাওয়ার জন্য ফ্লোটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে একটুও ইতস্তত করবে না।

দৃশ্যটা আবার কল্পনা করল জুনো—পানির উপর মাথা তুলে আর্তনাদ করছে ভালুকটা, দমকলের হোযপাইপের মত বাঁকা হয়ে ছুটছে রক্তলাল ঝরনা। যে হিংস্র জন্তুটা ওদের সবাইকে অতক্ষণ নাকানিচোবানি খাওয়াল, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটাকে ছাতু বানিয়ে ফেলেছে কিলার ওয়েইলের দলটা।

নড়াচড়া করছে রানা, হাই তুলল।

'মর্নিং, দোস্ত,' বলল জুনো।

'মর্নিং। ঠিক তো?'

'না। এখন বিকেল। প্লেন ক্র্যাশ করার পর প্রায় পুরো একটা দিন পার করে দিলাম আমরা।'

'হুম।' স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর শরীরটাকে যতটা পারা যায় ছোট করে আনল রানা, কম্বলটা টেনে কান দুটো ঢাকল। 'এখনও আমি ওদের গান শুনতে পাচ্ছি।'

'আমিও। এসো প্রার্থনা করি। কোনও কারণে ওরা যেন ফিরে না আসে।'

'হ্যাঁ, একেবারে অন্তর থেকে করতে হবে কাজটা।'

একটু পর রানাকে ডেকে সাড়া পেল না জুনো, আবার ঘুমিয়ে

পড়েছে। ভাবল, কী ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করা যাক।

কারও কিছু করবার নেই, বুক ভরা আশা নিয়ে অপেক্ষার পালা শুরু হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি মুখ খুলবে সবাই, নিজেদের মেলে ধরবে, প্রকাশ করবে পরস্পরের সম্পর্কে কার কী ধারণা। তরপর ফ্লোর উপর ছড়িয়ে পড়বে, কেউ কারও কাছাকাছি থাকতে চাইবে না। কিন্তু একা থাকা আরও কষ্টকর আর একঘেয়ে লাগায় আবার এক জায়গায় জড়ো হবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এরকম পরিস্থিতিতে যা হয় জানা আছে ওর...

কাঠের উপর কুঠারের শব্দে জুনোর চিন্তায় বাধা পড়ল। কেউ বোধহয় আগুন জ্বালবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'এখনও ধরেনি?' মনিকার গলা ভেসে এল, খানিক দূর থেকে।

'না,' বললেন প্রফেসর মনসুর, কাছাকাছি কোথাও থেকে।

একটু পর আগুনের শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পেল জুনো, প্রবল বাতাসে নাচানাচি শুরু করেছে শিখাগুলো।

'এই যে,' বলল মনিকা, খুব কাছ থেকে, 'ডিমের পাউডার, কফির জন্য পানি আর গরুর মাংসের ক্যান।'

'আগে কফি বানা, আমি জমে যাচ্ছি।'

কাপ-পিরিচের আওয়াজ ভেসে আসছে। তারপরঃ 'তুমি আমাকে মাসুদ রানা সম্পর্কে বলো।'

'কী বলব?'

'ভদ্রলোক সম্পর্কে যা জানো।'

'সব কথা আমি তো আর জানি না।'

'ওহ্, ড্যাডি! যতটুকু জানো ততটুকু বললেই হবে।'

'আসলে খুবই কম জানি আমি ওর সম্পর্কে। যতটুকু জানি, বেশিরভাগই লোকমুখে শোনা,' বললেন প্রফেসর মনসুর। 'এটুকু জানি যে বাংলাদেশ সরকারের একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট রানা। দেশপ্রেমিক, দেশের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। ওর জীবন যাপন রোমাঞ্চকর। আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকা, দু'জায়গাতেই সারভাইভ

করার অভিজ্ঞতা আছে।' একটু বিরতি। 'ওর সম্পর্কে এত কথা কেন তুই জানতে চাইছিস, মনিকা?'

'ওঁকে দেখলে কী কারণে জানি না, আমি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ি,' বলল মনিকা। 'কারণটা খোঁজার চেষ্টা করছি।'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রফেসর বললেন, 'দেশ আর দশের স্বার্থ দেখতে হলে অনেক অপ্রীতিকর কাজও করতে হয় ওদের মত মানুষকে, তার ছাপ চেহারাতেও পড়ে বইকি—তোর অন্তর্দৃষ্টি হয়তো সেটা দেখেই ভয় পেয়েছে। তবে সেটা অমূলক ভয়।'

'হতে পারে,' মৃদুকণ্ঠে বলল মনিকা।

বাপ-মেয়ের ব্রেকফাস্টপার্টিতে যোগ দিল অস্টিন, ওদের আলোচনা থেকে বাদ পড়ে গেল বাঙালি দেশপ্রেমিক।

ঘুম ভাঙতে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর নড়ে উঠল রানা। 'কফির গন্ধ পাচ্ছি যে!'

'দারুণ, না?' বলল জুনো। 'জলদি চলো, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ক্রল করে এগোল জুনো, উইন্ড-প্রুফ ফ্ল্যাপ তুলে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

বাইরেটা উজ্জ্বল, যদিও সূর্য অনেক নীচে নেমে গেছে। ফায়ার ট্রে-র চারপাশে ওরা চারজন জড়ো হয়েছে, কাঠের বাক্সের উপর বসে চুমুক দিচ্ছে ধূমায়িত কফিতে। ম্লান আগুনে একটা প্যান বসানো রয়েছে, তাতে ডিমের পাউডার মাখানো সের তিনেক গরুর মাংস রান্না হচ্ছে।

'কার হাতের রান্না দেখতে হবে তো,' প্রশংসায় গদগদ সুরে বলল অস্টিন। 'গন্ধ শুঁকেই আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে, যিশুর কিরে বলছি। লেখাপড়ায় যেমন উত্তম, তেমনি সাংসারিক কাজেও দেখা যাচ্ছে এ-প্লাস। সম্ভবত তোমার রক্তে ওরিয়েন্টাল ঐতিহ্য থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে, মনিকা।'

'চব্বিশ ঘণ্টা সলিড ফুড পেটে পড়েনি,' বললেন প্রফেসর। 'এখন বোধহয় আমার হাতের রান্নাও অমৃত লাগবে।'

'মিস্টার রানা ভাল আছেন তো?' জানতে চাইল হোমার, চেহারায় উদ্বেগ। 'কাল রাতে...'

'ও ভাল আছে,' আশ্বস্ত করল জুনো, ওর সারা শরীর আঁচড়ের দাগে ভর্তি, ভালুক চেপে ধরায় টাটিয়ে বিষ হয়ে আছে। 'সহানুভূতি জানাতে হলে আমাকে জানান।'

'এক মহিলাকে চিনতাম, ওভাবে আলিঙ্গন করত...' বললেন প্রফেসর, তারপর খেয়াল হলো নিজের মেয়ের পাশে বসে রয়েছেন।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ড্যাডিকে বিব্রত হতে দেখে এখনও নিঃশব্দে হাসছে মনিকা, রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি করল এখন আর ওকে দেখে নার্ভাস বোধ করছে না সে।

'কফি?' জানতে চাইল হোমার।

'প্লিজ।' একটা বাক্স টেনে এনে বসল রানা।

মনিকার রান্না করা মাংস প্রথমে প্রফেসরই মুখে তুললেন। 'একেবারে অখাদ্য হয়েছে, তা আমি বলব না। তবে মসলা বলতে কিছুই ছোঁয়ানো হয়নি, অথচ সবই আছে...'

'আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম রান্নাটা তোমরা কেউ করো,' মুখ ভার করে বলল মনিকা।

'একদম ওর মম্-এর মত হয়েছে, ঠাট্টা বোঝে না।'

অখাদ্য যে নয়, খেতে বসে সেটা মানতে হলো সবাইকে।

খানিক পর রাক্ষসটার কথা তুলল জুনো। 'ওটা এমনকী পুরোপুরি তিমিও নয়,' বলল ও, 'ডলফিন পরিবারের সবচেয়ে বড় প্রাণী ওটা: ওরসিনাস অরকা; কিলার ওয়েইল। লম্বায় ত্রিশ ফুটের বেশি তো কম নয়, শিম্পাঞ্জির মত বুদ্ধিমান, সাগরের নেকড়ে।'

'ঠিক আছে, জুনো,' বলল রানা, 'তোমার কথা শুনলাম আমরা। এবার আমাদেরকে একটু আশ্বস্ত করো। বলো, রেকর্ডে এমন কোনও উদাহরণ নেই যাতে বলা হয়েছে কিলার ওয়েইল

মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছে।'

'ভুল,' বলল অস্টিন, রানার ওপর টেক্কা দিতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে উল্লাস অনুভব করছে, রানার ক্ষীণ মাথা নাড়ানোটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। 'হারবার্ট পন্টিং, অ্যান্টার্কটিকায়। স্কট-এর সঙ্গে টেরা নোভা-য় ছিলেন তিনি। ওঁদের কুকুর বরফে ছিল, ওই সময় একদল কিলার ওঁদেরকে ধরার চেষ্টা করে। পন্টিং ফটো তোলার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বরফের মেঝে ভেঙে উঠে আসে দলটা, ওঁকে ধরার জন্যে। কোনও রকমে প্রাণ বাঁচান তিনি।'

'ইতিহাস শেখানোর জন্যে ধন্যবাদ, অস্টিন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা। 'তবে পন্টিংই শেষ ব্যক্তি, কিলার ওয়েইল আর কোনও মানুষের ওপর হামলা চালিয়েছে বলে শোনা যায়নি। তা ছাড়া, অস্টিন যে ঘটনার কথা বলছে সেটা প্রায় একশো বছর আগের।'

'তা ঠিক,' বলল অস্টিন, চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসল। 'তবে একবার যখন ঘটেছে, ব্যাপারটা আবারও ঘটতে পারে।'

'তা পারে। তবে সেটা মনে করিয়ে দিলে আমাদের মনোবল বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, তাই না?'

আড়ষ্ট একটা নীরবতা নেমে এল। সেটা চুরমার হলো হঠাৎ বরফ ভাঙার তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজে। লাফ দিয়ে উঠল মনিকা। 'ওগুলো বরফ ভেঙেও উঠে আসতে পারে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, পারে, মনিকা,' বলল রানা। 'তবে সেটা ছিল পাতলা বরফ, মাত্র তিন ফুট পুরু। ওগুলো মাথা দিয়ে পাতলা বরফের মেঝে ভেঙে সারফেসে উঠতে পারে। শুধু পাতলা বরফ।'

হাসল সবাই, তবে জোর করে।

'অনেক হয়েছে,' বলল অস্টিন। 'এবার চলো সবাই কাজ শুরু করি। অনেক কিছু করার আছে।'

খাবার বাক্সগুলো আলাদা করল ওরা, হিসাব নিল কতদিন

চলবে। 'ফিশিং লাইন আছে,' হোমার বলল। 'প্রচুর মাছ ধরতে পারব আমরা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিলার ওয়েইল থাকতে নয়,' বলল ও। 'চারপাশের কয়েক মাইলে একটাও নেই, ভয়ে পালিয়েছে সব।'

সবাই একটু নার্ভাস বোধ করল। উজ্জ্বল পানির দিকে তাকাল ওরা। বেশ অনেকটা দূরে কী যেন নড়াচড়া করছে, উপরে ছুঁড়ে দিচ্ছে চওড়া জলকণার ঝরনা। সারি সারি এরকম আরও অনেক। মনে হলো দূরে সরে যাচ্ছে।

হঠাৎ করে বরফের কিনারায় খুব জোরে কী যেন ছলাৎ-ছলাৎ করে উঠল। মনিকার হাত মুখে উঠে গেল, তবে চিৎকার করছে না। পুরুষরা লাফিয়ে উঠল, দু'একজন ছোঁ দিয়ে রাইফেল তুলে নিল।

তারপর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ছেড়ে পানি থেকে উঠে এল একটা সিল, পরিশ্রমে বেদম হাঁপাচ্ছে; সোনালি পানি ঝরছে সারা গা থেকে। আকারে বিরাট, বারো ফুটের কাছাকাছি, চওড়ায় আট ফুট। বরফের কিনারায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে, ওদেরকে গ্রাহ্য করছে না।

খানিক পর বরফের কিনারা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে এল, ফ্লিপারের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো, সন্দেহের দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে। তারপর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শুলো। এবং একটু পর ঘুমিয়েও পড়ল।

'বাহ্!' ফিসফিস করল অস্টিন। 'না চাইতেই প্রচুর তাজা মাংস চলে এসেছে। বেশ অনেকদিন চলবে আমাদের।'

'ওটার ওজন হবে কমকরেও পনেরোশ' পাউন্ড,' বলল হোমার, শিকারে তার খুবই উৎসাহ, ভাল দক্ষতাও আছে। 'ভারী মজা হবে। আমরা ওটাকে রেমিংটন দিয়ে শিকার করব।'

'মাথায় একটা সফট্-নোজ বুলেট,' সায় দিল অস্টিন। 'তবে আরও কাছাকাছি যেতে হবে।'

'ওটাকে মারা উচিত হবে বলে মনে করি না,' বলল রানা।

'আরে, তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি, হে?' হেসে উঠল অস্টিন।

'ওটাকে যখন কাটা হবে, অত রক্ত যাবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোথায় আবার, সাগরে।'

'কিন্তু সাগরে রয়েছে একদল কিলার ওয়েইল। রক্তের গন্ধ পেলে ছুটে আসবে ওগুলো।'

কিন্তু সবার অলক্ষ্যে এরইমধ্যে কালচে-খয়েরি বিরাট স্তূপটার দিকে ক্রল শুরু করেছে হোমার, হাতের রাইফেলটা বুকের সামনে আড়াআড়িভাবে ধরা। শিকারের এমনই নেশা তার, রানার কথা কানেই তুলছে না।

ওর পিছু নিল অস্টিন। চোখ-মুখ থমথম করছে, দূর থেকে ওদেরকে দেখছে রানা। সিলটাকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল ওর দৃষ্টি, চট করে একবার চোখ বুলাল সাগরে। ছ'টা কালো সেইল ফিন বরফের দিকে এগিয়ে আসছে, গতি এত বেশি যে ওগুলোর দুপাশে ফেনাসহ ঢেউ তৈরি হচ্ছে।

'হোমার, মিস্টার হোমার, ফিরে আসুন! অস্টিন!'

হাতটা উঁচু করে নাড়ল হোমার, ইঙ্গিতে বলতে চাইছে দয়া করে আওয়াজ করবেন না, ওটার ঘুম ভেঙে যাবে।

ঘুরল অস্টিন। ছুটে ওর কাছে পৌঁছে গেছে জুনো, হাত তুলে সাগরের দিকটা দেখাচ্ছে—ছ'টা ফিন, ইতিমধ্যে ফ্লোর আরও কাছাকাছি চলে এসেছে, এমনকী প্রকাণ্ড সিল মাছটার উপর দিয়ে তাকালেও ওগুলোর ডগা দেখা যাচ্ছে।

'হোমার,' গলা আরও চড়াল রানা। 'ফিরে আসুন!'

ঘুরল হোমার, ইতস্তত করছে। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রাগে চেঁচিয়ে উঠল সিল, উঁচু করল মাথাটা, ঘুরে গেল হোমারের দিকে; মাংস ও চর্বির একটা পাহাড়, খেপে গেছে, এগোতে শুরু করল ক্যাম্পের দিকে।

এই সময় হাজির হলো কিলার, এক নিমেষে বরফের দশ ফুট ভিতরে চলে এসেছে। প্রকাণ্ড কালো ফ্লিপার দুটো, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পনের ফুট, বরফের কিনারায় ওটাকে স্থিরভাবে আটকে রেখেছে। বিরাট কালো ফিন পানির উপর উঠে আড়ষ্টভঙ্গিতে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে। বিশাল মুখ টার্গেট করল সিলের পাঁজরের দিকটা। ঝট করে বন্ধ হচ্ছে হাঁ। হঠাৎ রক্তে ধুয়ে গেল কোদাল আকৃতির দাঁত, কাগজের মত অনায়াসে ছিঁড়ে আনছে মোচড়রত চর্বির মোটা স্তর আর ভূঁড়ি, ওজনে এক মণের কম নয়।

সাদাকালো মাথাটা দূর থেকে দেখল রানা, তারপরেও ওটার বিশাল আকার হকচকিয়ে দিল ওকে। মনিকা নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল অস্টিনঃ আমি তো বলেইছিলাম!

সিলটার কাতর চিৎকার সহ্য করতে না পেরে দু'হাত তুলে কান ঢাকল মনিকা। টলছে দেখে একহাতে ওকে জড়িয়ে রাখল রানা।

প্রফেসর মনসুর বিড়বিড় করছেন, 'ও আল্লাহ, আল্লাহ, ও আল্লাহ!'

সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত জুনো, একদৃষ্টে তাকিয়ে সিলটাকে সামনের দিকে পিছলাতে দেখছে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ওটার মোটা চামড়া শুকনো কিছু ছেঁড়ার মত আওয়াজ করছে।

হোমার লক্ষ করল, কালো একটা গোল চোখ ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওকে মাপছে; লক্ষ করল কিলারের নাকে আর মুখের পাশে ক্ষতচিহ্ন। রেমিংটন তুলে ফায়ার করল ও। কিন্তু লাগাতে পারল না।

তাজা রক্তে উষ্ণ হয়ে আছে কিলারের মুখ, আবছাভাবে দেখতে পেল হোমারকে। রাইফেল তুলতে দেখল, শব্দটা শুনতে পেল। লম্বা রাইফেলের নীচে হাতটাকেও প্রসারিত হতে দেখল, ফলে ওরিগনে পাওয়া ট্রেনিং-এর কথা মনে পড়ে গেল ওটার, মনে

পড়ল সেই সুস্বাদু মাংসের স্বাদ আর তীব্র যন্ত্রণার কথা।

এত সব এক সেকেন্ডে শেষ হলো। গা থেকে চামড়া মাংস সব খুলে নিচ্ছে কিলার, বরফ ধরে রাখতে ব্যর্থ হলো সিল। শরীরে খিঁচুনি উঠে গেছে, পনেরোশ' পাউন্ডের সেই অস্থির-অশান্ত শরীরটাকে মুখে নিয়ে সাগরে নেমে গেল কিলার।

বরফের উপর হাঁটু গাড়লেন প্রফেসর। থরথর করে কাঁপছেন তিনি। রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুনো, বড় করে শ্বাস নিচ্ছে। সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, কপালে চিন্তার রেখা, মনিকাকে এখনও একহাতে জড়িয়ে রেখেছে। হোঁচট খেতে খেতে ওদের কাছে ফিরে আসছে হোমার, তুষারের মত সাদা হয়ে আছে মুখ।

অস্টিন বলল, 'দেখো।'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সবাই। কালো সেইল ফিন আবার ফিরে আসছে; গুণে দেখল রানা, বিশটা। এখনও বেশ অনেকটা দূরে, অস্পষ্ট; রোদ আর ছায়ায় পানি যেখানে কালো ও সোনালি হয়ে আছে সেখানে জড়ো হচ্ছে ওগুলো।

সময় বয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে ঝাঁকটার গতিবিধি একটা প্যাটার্ন নিল: ওদের ফ্লোটাকে ঘিরে টহল দিচ্ছে ওগুলো, নজর রাখছে আর অপেক্ষা করছে।

বারো

সামান্য একটু হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা, আগুনটাকে ঘিরে চুপচাপ বসে থাকল।

একটু পর মুখ খুলল হোমার। 'কী আছে আমাদের, যা নিয়ে ওগুলোর সঙ্গে লড়তে পারি?'

'লড়বেন?' বলল জুনো, আইডিয়াটা যেন ঘাবড়ে দিয়েছে ওকে।

'রাইফেল,' বলল অস্টিন।

মাথা নেড়ে হোমার বলল, 'যথেষ্ট নয়।'

'ডাইনামাইট!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন প্রফেসর। 'আমাদের কাছে ডাইনামাইট আছে!'

'আর হার্পুন গান,' জানাল অস্টিন।

'ওগুলো হামলা করবে না,' বলল জুনো, তবে কথার সুর শুনে বোঝা যাচ্ছে মোটেও নিশ্চিত নয় ও। 'মাত্র একটা রেকর্ড আছে...'

ঢিব্!

ওদের নীচে লাফ দিল বরফ, ভাঁজ খেল, ফাটল ধরা ছোট একটা ঢিবি তৈরি হলো বিশ ফুট দূরে। 'ওরে মা রে!' আতঙ্কে গুঙিয়ে উঠল হোমার। 'নীচ থেকে আসছে ওগুলো!' বরফের উপর ছুটোছুটি শুরু করল ওরা, তবে কেউ বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে, কোন্ দিকটা নিরাপদ।

কড়াৎ!

বরফের ঢিবি বিস্ফোরিত হলো। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড সাদাকালো মাথা, চকচকে চামড়া থেকে পানি ঝরছে, সগর্জন নিঃশ্বাস মেঘের চেহারা পেল।

হাঁ করল দানবটা, বিরাট আকারের দাঁত বেরিয়ে পড়ল, বেরিয়ে এল লালচে-সাদা জিভ। মাথাটা ঘুরে গেল ওদের দিকে, কালো তরল চোখ খুঁটিয়ে দেখছে। ছোঁ দিয়ে রেমিংটনটা তুলে নিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে অস্টিন।

অলস ভঙ্গিতে আরও উঁচু হলো কিলারের প্রকাণ্ড মাথা, অবাধ্য ভাবটা স্পষ্ট, পিছলে নেমে গেল পানিতে। বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। 'মর শালা!' বলে গালি দিল অস্টিন।

বরফে হাঁটু গেড়ে হাতের গ্লাভ খুলে ফেলল হোমার, ডাইনামাইটের বাক্সে জড়ানো ইস্পাতের সরু পাত খুলছে। বসে নেই প্রফেসর মনসুরও, হার্পুন গানের বাক্সটা খোলার চেষ্টা করছেন।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে মনিকা, ফ্লেয়ার গানটাকে দু'হাতে পিস্তলের মত করে ধরে আছে।

এখনও বাক্সের উপর বসে রয়েছে রানা, নিজের জানা তথ্যের উপর বিশ্বাস থাকায় এই প্রথম ব্যস্ত হওয়ার তাগাদা অনুভব করছে না: কিলার ওয়েইল মানুষকে কখনও আক্রমণ করে না।

দু'একটা মরা কিলারের পেটে কঙ্কাল পাওয়া গেছে, জানে ও; পন্টিং সম্পর্কে মন্তব্য করবার সময় পুরোপুরি সত্যনিষ্ঠও ছিল না, কিন্তু এখানে যা ঘটছে সেটা অসম্ভব, কল্পনারও অতীত। কিলার ওয়েইল মানুষ শিকারে বেরোয় না।

ঢিব্!

বরফ লাফাল। ঝাঁকি খেতে খেতে কাত হলো তাঁবু। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল ফায়ার-ট্রে, নীচে নামল চারদিকে একরাশ ফুলকি ছড়িয়ে। সরাসরি ওদের নীচে রয়েছে কিলার।

ক্বড়াৎ!

পাঁচ গজ দূরে একটা ফাঁক তৈরি হলো, কিনারাগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নীচে আয়নার মত চকচক করছে কালো পানি। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা।

'মনিকা! ফ্লেয়ার গান নয়, রাইফেল চালাতে জানেন?'

'জানি।'

'দুটো রেমিংটনই আনুন। জুনো, ওয়েদারবাই আর শেলগুলো নিয়ে এসো!'

ক্যাম্পকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগোচ্ছে রানা। বিশ ফুট হেঁটে বরফের কিনারায় পৌঁছে গেল। পানির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়েছে, দেখল ছ'ফুট লম্বা আরেকটা ফিন নিঃশব্দ ছুরির ফলার

মত পানিকে দু'ভাগ করছে, এক মুহূর্ত পর ডাইভ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'সাবধান!'

ঢিব্!

বরফের কিনারায় হাঁটু গাড়ল রানা, চোখে বিনকিউলার। এক সেকেন্ড পর ওর পাশে চলে এল মনিকা, একটা রেমিংটন সেভেনএমএম ম্যাগনাম রাইফেল কাঁধ থেকে ঝুলছে, দ্বিতীয়টা দু'হাতে ধরে আছে। ওর হাত থেকে সেটা তুলে নিল রানা।

বিনকিউলার রেখে দিয়ে সোনালি পারদের মত ঝলমলে পানির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে ফিন খুঁজছে ও, সরু হয়ে আছে চোখ দুটো।

বরফের উপর পিছলে যাচ্ছে পা, তারপরেও রাইফেল আর দু'বাক্স বুলেট নিয়ে হনহন করে ওদের কাছে পৌঁছাল জুনো। তিনজনই ওরা গুলি করবার প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে।

'দেখতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মনিকা, জুনো?'

'না,' একযোগে বলল ওরা।

'ওই একটা আসছে!' উত্তেজনায় হিসহিস করে উঠল মনিকার গলা, শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে।

'ডাইভ দেয়ার ঠিক আগে,' শান্ত সুরে পরামর্শ দিল জুনো।

'রাইট,' বলল রানা। 'এখনই!'

তিনটে রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। উঁচু ফিনের দু'দিকে সামান্য ছলকে উঠল পানি।

পানির নীচে ডুবে গেল ফিনটা। টান টান উত্তেজনার মধ্যে সবাই ওরা অপেক্ষা করছে। কোথায় কী!

'গুড। চালিয়ে যাও তোমরা।' দাঁড়াল রানা, হন হন করে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে।

ডাইনামাইটের খোলা বাক্সের পাশে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে হোমার, সবেমাত্র খয়েরি রঙের স্টিক আর ফিউজগুলোর দিকে হাত বাড়িয়েছে। আরেকটা বাক্স থেকে হার্পুন-গান তুলছেন

প্রফেসর মনসুর, অস্টিন ওঁকে সাহায্য করছে।

হার্পুন-গান সেট করতে খানিকটা সময় লাগবে। কাজটা ওদেরকে করতে দিয়ে অ্যামিউনিশনের বাক্সটা খুঁজতে শুরু করল রানা। সেটা পেয়ে খুলতে যাবে, চোখের কোণ দিয়ে হোমারকে সিধে হতে দেখে ঘাড় ফেরাল।

ঘুরে চলে যাচ্ছে হোমার, ওর হাতে এক করে বাঁধা ডাইনামাইটের চারটে স্টিক। 'অত কেন?' জানতে চাইল রানা।

ছুটল হোমার, পাশ কাটানোর সময় আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল, সম্ভবত রানার কথা শুনতেই পায়নি।

জুনো আর মনিকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে হোমার, হাতে রাইফেল নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব রানাও ওর পিছু নিয়ে আসছে। জ্বলন্ত কাঠে ফিউজটা চেপে ধরল হোমার। সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওটা। ছোঁড়ার জন্য হাতটা মাথার পাশে তুলল ও...

ঢিব্!

ফুলে উঠল বরফ। এক নিমেষে সবাই ধরাশায়ী। তবে পরমুহূর্তেই সিধে হতে চেষ্টা করল হোমার, ডাইনামাইটের বান্ডিল এখনও ছাড়েনি।

দাঁড়াতে পারলেও, বরফে বারবার পিছলে যাচ্ছে পা। আবার আছাড় খেল হোমার, এবার হাত থেকে ছুটে গেল বান্ডিলটা, বরফের উপর হিস্‌হিস্ আওয়াজ করছে। ক্রল করে ওটার দিকে এগোচ্ছে ও।

আবার ঝাঁকি খেল বরফ। বান্ডিলটা পিছলে হোমারের দিকে ফিরে এল খানিকটা। এখন মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, কিন্তু ফিউজও পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মরিয়া হয়ে বান্ডিলটাকে লক্ষ্য করে ছোঁ মারল ও। গ্লাভ পরা হাত নাগাল পেল ওটার, কিন্তু ধরেও ছেড়ে দিল, তারপর আবার ধরল; দ্রুত একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো, গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিল বান্ডিলটা।

উজ্জ্বল আকাশের গায়ে তির্যক একটা পথ ধরে উঠে যাচ্ছে

ডাইনামাইটের স্টিকগুলো, বারবার ডিগবাজি খাচ্ছে, পিছনে ছেড়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার একটা রেখা। তারপর পতন শুরু হলো। বরফের বাইরেই পড়বে, তবে মোটেও দূরে নয়।

ঢিব্!

বিস্ফোরিত হলো ডাইনামাইট। ফ্লো ফুলে উঠছে তো উঠছেই। নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, ওরা চারজন পিছলাতে শুরু করল; ক্যাম্প আর পাহাড়গুলোর দিকে যাচ্ছে।

সাপ্লাই তাঁবু ভেঙে পড়ল। টুকরো বরফ মেশানো পানির প্রকাণ্ড একটা স্তম্ভ রাজকীয় ভঙ্গিতে খাড়া হলো আকাশে, তারপর ঝম ঝম শিলা বৃষ্টির মত নেমে এল ওদের উপর।

হঠাৎ আরেকদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে ফ্লো। বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে গেছে, তাই আকস্মিক কড়াৎ! শব্দটা শুনতে পেল না ওরা। কিলার ওয়েইলরা বরফের গায়ে যে ফাটল তৈরি করেছিল সেটাই ওরকম তীক্ষ্ণ শব্দ করে চওড়া হয়ে গেল, সেই সঙ্গে বরফের একটা ভেলা ঠিক ওদের ক্যাম্পের পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলোঃ যে ভেলায় ওরা সবাই রয়েছে।

সবার আগে প্রফেসর মনসুর বুঝতে পারলেন আসলে কী ঘটছে। হার্পুন-গান নিয়ে ক্যাম্প থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছেন তিনি, পাশেই রয়েছে অস্টিন। হঠাৎ সামনে ফ্লোর কিনারা দেখতে পেলেন! আশ্চর্য কালো পানির দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন তিনি, ফুটখানেক উঁচু বরফের দেয়ালে আছড়ে পড়ছে। আবার মুখ তুললেন। এবার ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন।

'মনি! মনি! মনিকা!' মেয়ের নাম ধরে চিৎকার জুড়ে দিলেন প্রফেসর।

ডাকটা শুনতে পাচ্ছে মনিকা, তবে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। ভিজে গেছে ও, ঠাণ্ডায় অবশ, আচ্ছন্ন বোধ করছে। বলতে পারবে না বরফের উপর কতক্ষণ ধরে শুয়ে আছে, তবে বুঝতে পারছে ওর মুখের একটা পাশ অসাড় হয়ে গেছে। নড়ল

একটু, মাথাটা তুলল। ওর ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে জুনো।

নড়ে উঠল জুনোও। ক্রল করে রানার দিকে এগোচ্ছে। ওদের পিছনে ড্যাডিকে দেখতে পেল মনিকা, উন্মত্তের মত হাত নাড়ছেন।

দাঁড়াতে গিয়ে মনিকা বুঝতে পারল ওর পায়ের নীচে নড়াচড়া করছে বরফ। হঠাৎ জরুরি তাগাদার ভঙ্গিতে হাত ঝাপটে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল জুনো। 'মনিকা, হোমারকে জাগান! নিয়ে আসুন!'

ঘুরে হোমারের পাশে চলে এল মনিকা, যতক্ষণ না নড়ল, ঝাঁকাতে থাকল নিঃসাড় পড়ে থাকা শরীরটাকে। হঠাৎ ওর পাশে উদয় হলো রানা, কপাল থেকে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা গড়াচ্ছে। মনিকার বগলের তলায় হাত ঢোকাল ও, বলল, 'ছাড়ুন ওকে।'

বাধ্য মেয়ের মত দাঁড়াল মনিকা। হোমারকে ধরে দাঁড় করাল জুনো, তারপর বরফের উপর দিয়ে এগোল চারজন।

ফাঁকটা এখন চার ফুটের কিছু বেশি। তবে কিনারায় পৌঁছাতে ওদের যে অল্প কয়েক সেকেন্ড লাগল তার মধ্যেই স্রোতের উদ্ভট আচরণ ওটাকে আরও চওড়া করে দিল। প্রতি মুহূর্তে আরও বড় হচ্ছে ফাঁক।

'জাম্প,' মনিকাকে বলল রানা।

খানিকটা পিছু হটল মনিকা, তারপর কিনারা লক্ষ্য করে ছুটে এল। পায়ের নীচে শুধু যে পিচ্ছিল বরফ, তা নয়, খানা-খন্দও প্রচুর, আবার কোথাও কোথাও মারাত্মক ভঙ্গুর ও নরম। ভারসাম্য হারাবার উপক্রম করল ও, বাতাসে হাত ছুঁড়ছে। তারপর কিনারায় পৌঁছে গেছে দেখতে পেয়ে লাফ দিল সামনে।

সরাসরি অস্টিনের দু'হাতের মাঝখানে ঢুকে পড়ল মনিকা। লাফ দেওয়ার পর যখন কালো পানির উপর রয়েছে, সেই থেকে ওর মাথায় শুধু একটাই চিন্তা—ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে।

ওকে যখন ধরল, গায়ে এত কাপড় থাকা সত্ত্বেও, সংকট ও উত্তেজনার এরকম একটা সময়েও, মনিকার স্তনের কোমল অথচ

দৃঢ় ভাব অনুভব করতে পারল অস্টিন। সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেল ও।

এরপর লাফ দিল হোমার, এখনও পুরোপুরি সচেতন নয়; পিছন থেকে ঠিক সময়মত ওর পিঠে ধাক্কা দিয়ে গতিটা বাড়িয়ে দিল রানা।

সবশেষে জুনোর সঙ্গে লাফ দিল ও।

সবাই ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছে এক একর বরফ ভেসে যাচ্ছে, যাওয়ার পথে ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে।

রানা বলল, 'আরও হয়তো পনেরবার এরকম ঝুঁকি আমরা নিতে পারব, তারপর সব বরফ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও পানিতে থাকবে বিশটা কিলার ওয়েইল।'

'যিশুর কিরে, মা মেরির দিব্যি,' প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল হোমার, 'এটা আমি চাইনি, সার। আমি সত্যি ভাবিনি...'

'প্রতিটি প্রাণ মূল্যবান,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা। 'এবং আমরা সবাই বাঁচতে চাই। যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন থেকে কারও খামখেয়ালিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না।'

'আমাদের আসলে একজন লিডার দরকার, সার,' ম্লান সুরে বলল হোমার। 'সবাই আমরা তাঁর কথা শুনব, তা না হলে এরকম ভুল একের পর এক হতেই থাকবে...'

'ক্যাম্প ডিরেক্টর হিসাবে আমি...' শুরু করল অস্টিন, তবে খুব একটা দৃঢ়তার সঙ্গে নয়। মধুর স্মৃতিটা এখনও ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই থেকে মনিকার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

একই কারণে ওর দিকে তাকাতে পারছে না মনিকা।

অস্টিনকে থামিয়ে দিলেন প্রফেসর মনসুর। 'এই যে কথায় কথায় নিজেকে তুমি ক্যাম্প ডিরেক্টর বলে দাবি করছ, ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে, অস্টিন? বারোয়, আমার ক্যাম্পের ডিরেক্টর ছিলে তুমি। আমরা কি বারোতে রয়েছি, এটা কি আমার ক্যাম্প?' জানতে

চাইলেন তিনি।

নীরবতা নেমে এল।

সেটা প্রফেসরই ভাঙলেন। 'আমি প্রস্তাব করছি, মাসুদ রানাই হবে দলের লিডার, যেহেতু প্যাকে সারভাইভ করার অভিজ্ঞতা আছে ওর।'

'আমি আপনার প্রস্তাব সমর্থন করছি,' তাড়াতাড়ি বলল হোমার। 'সেই সঙ্গে সবার কাছে মাফও চাইছি, ওঁর নিষেধ না শুনে ওরকম মারাত্মক একটা বিপদ ডেকে আনায়।'

'প্রথম কাজ ক্যাম্পটা সরানো, অস্টিন,' বলল রানা, ওদের দিকে পিছন ফিরে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরল।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল অস্টিন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার পিছু নিল।

'ওদিকে,' বলল রানা, হাত বাড়িয়ে দেখাল, 'মাঠের ঠিক মাঝখানে ক্যাম্প ফেলব আমরা—বরফ যেখানে সবচেয়ে বেশি পুরু। জুনো দেখাবে তোমাকে।'

'আর কিলার ওয়েইলের কী হবে?' জানতে চাইলেন প্রফেসর।

ক্যাম্পে পৌঁছে থামল সবাই। জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল রানা। 'ডাইনামাইটের আওয়াজ আপাতত ওগুলোকে হটিয়ে দিয়েছে। তবে চোখ-কান খুলে পাহারায় থাকতে হবে সবাইকে। আপনি কি হার্পুন-গানের কাছে থাকবেন, প্রফেসর? যদি কিছু দেখেন, শুধু একটা ডাক দেবেন। পারবেন না?'

'অবশ্যই পারব,' বলে হার্পুন-গানের পাশে ডিউটি দিতে চলে গেলেন প্রফেসর।

বাকি সবাই হাত চালিয়ে ক্যাম্পটা একশ' গজ দূরে সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমে হার্পুন-গানের পিছনে প্রায় অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর মনসুর, হাত দুটো ডাবল গ্রিপ-এ, চোখ জোড়া ঝলমলে সোনালি সাগরে ছুটোছুটি করছে; কিন্তু তারপর, কিছু ঘটতে না

দেখে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

নতুন ক্যাম্পে প্রথমে ওরা নেটটা বিছাল। লাল-কমলা রঙের নাইলন, মিডিয়াম-স্পেসড্ স্ট্র্যান্ডস, সব মিলিয়ে চারশো বর্গফুট, পাশগুলো বিশ ফুট করে। প্রতিটি কোণে, এবং প্রতি দু'পাশের অর্ধেক দূরত্বে, চল্লিশ ফুট লম্বা এক প্রস্থ্ করে গাইড-রোপ আছে।

ইস্পাতের গোঁজ আর ভাঙা বাক্সের কাঠ ব্যবহার করে নেটটাকে ওরা শক্ত করে বরফের সঙ্গে আটকাল, নিশ্চিত হলো নেটের জমিন যাতে তুষার আর টুকরো বরফের নীচে চাপা না পড়ে।

'এবার আমাদের পিছলে পড়া বন্ধ হবে,' কাজটা শেষ হতে বলল রানা। 'চলো, তাঁবুগুলো আনি। তারপর স্পেয়ার যা আছে বাক্স খুলে বের করতে হবে সব।'

পারকার পকেট হাতড়ে পাইপ আর টোব্যাকো বের করলেন প্রফেসর। এখনও অন্যমনস্ক তিনি।

নেটের কিনারায়, গাইড-রোপগুলোর মাঝখানে তাঁবু টাঙাল ওরা; সবগুলোর মুখ নেটের ভিতরদিকে, শুধু উল্টোদিকে মুখ করে আছে টয়লেটটা। নেটের যে পাশটা কাছাকাছি তীরের দিকে পড়ল, পাহাড়গুলোর উল্টোদিকের তীর ওটা, খালি পড়ে থাকল। পাহাড়ের ছায়ায় ফেলা হলো দুটো তাঁবু, একটা জুনোর সঙ্গে শেয়ার করবে রানা, আরেকটায় হোমারের সঙ্গে অস্টিন।

বাকি দু'দিক উত্তর আর দক্ষিণ; উত্তরে প্যাক, দক্ষিণে আলাস্কা। ওই দু'দিকে তিনটে তাঁবু টাঙানো হলো। উত্তরে দুটো তাঁবু, একটায় প্রফেসর আর মনিকা থাকবে, আরেকটায় সাপ্লাই রাখা হবে, দুটোই দক্ষিণদিকে মুখ করে আছে। টয়লেটটা নিঃসঙ্গ, উত্তরদিকে মুখ।

এক কোণে, অস্টিন-হোমার আর প্রফেসর-মনিকার তাঁবুর মাঝখানে, বরফের উপর দাঁড়িয়ে আছে ফায়ার-ট্রেটা। কাঠের বাক্সগুলো নিয়ে আসবার জন্য বরফের উপর দিয়ে হাঁটা ধরল ওরা।

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসতে পারছেন না প্রফেসর মনসুর। সামনে তাকালেন, তবে চোখের দৃষ্টি সজাগ নয়, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন না কিছু দেখছেন কি না। তার উপর ওঁর সামনের স্থির বাতাসে ধোঁয়ার একটা গাঢ় মেঘ ঝুলে আছে।

শান্ত সাগরের কালো আর সোনালি বাঁকগুলো নিঃশব্দে ভাঙতে শুরু করল, স্পাইক তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে ত্রিভুজ। প্রফেসর মনসুর এতটাই অন্যমনস্ক যে দেখতে পেলেন না মাত্র বিশ গজ দূরে বিরাট একটা কালো ফিন পানির সারফেস ভাঙল।

তেরো

প্রকাণ্ড তিমির চকচকে পিঠ থেকে কলকল শব্দে পানি গড়াচ্ছে, দ্রুত কাছে চলে আসছে ওটা। যতক্ষণ না কিলার নাক দিয়ে পানির বিস্ফোরণ ঘটাল ততক্ষণ বিপদটা সম্পর্কে কিছুই টের পেলেন না প্রফেসর। তারপর অকস্মাৎ গর্জন, পচা মাছ আর মৃত্যুর গন্ধ যেন চাবুক মেরে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনল ওঁকে।

জলকণার তৈরি লম্বা স্তম্ভ দেখতে পেলেন তিনি, বিশাল কাঁধ ধেয়ে আসছে বরফের দিকে, অস্থির লেজের বাড়ি খেয়ে সাগরের পানি উথলাচ্ছে। এখনও কিছুটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর, তবে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টিপতে দ্বিধা করলেন না।

কুণ্ডলী পাকানো লাইন হারপুনের ঝাপসা আকৃতিকে অনুসরণ করল। ফিনের ঠিক পাশে, নরম মাংসে গাঁথল ওটা। নিরেট একটা শব্দ হলো—থক্! ঘুরে গেল তিমি; হাঁ করা মুখ, বিরাট কালো

ফ্লিপার দেখতে পেলেন প্রফেসর। বিপুল পানি ছুঁড়ল আকাশের দিকে, তারপর দ্রুতবেগে ছুটল ওটা, ডাইভ দিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল। একের পর এক কুণ্ডলী খুলে হারপুনের সঙ্গে আটকানো রশি সেঁধিয়ে যাচ্ছে সাগরে।

হতচকিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রফেসর মনসুর, ছুটন্ত লাইনের একটানা আওয়াজ শুনছেন। তারপর প্রায় নেচে উঠে চিৎকার শুরু করলেন,'ধরেছি! ওটাকে আমি ধরেছি!'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবগুলো কুণ্ডলীর রশি বেরিয়ে গেল। টাং করে আওয়াজ তুলে টান টান হলো সেটা, তারপরেও আওয়াজটার রেশ কয়েক মুহূর্ত ঝুলে থাকল বাতাসে। ধীরে ধীরে, এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কিছু হতে পারে না, ওদের ফ্লোটা যেন ঘুরে যাচ্ছে।

হাত নামিয়ে হার্পুন-গানটা শক্ত করে চেপে ধরলেন প্রফেসর। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকালেন একবার। নতুন ক্যাম্প-সাইট থেকে রওনা হয়েছে ওরা, তবে ভঙ্গুর ও ফাঁপা বরফের উপর দিয়ে এগোতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

লাইনের দিক একটু বদলে গেল। আবার ফিরে আসছে তিমিটা, তবে রশিতে ঢিল পড়েনি এতটুকু। হার্পুন-গানের হ্যান্ডেল ধরে আছেন প্রফেসর, সামনের দিকে ঝুঁকে ঝলমলে পানিতে চোখ বুলাচ্ছেন, চকচকে কালো পিঠটা যদি দেখতে পান। বিকট আওয়াজ ঢুকল কানে, বরফ ভাঙছে। তারপর দেখতে পেলেন দানবটাকে।

'ওই আবার পানি ছুঁড়ছে!' হাঁক ছাড়লেন প্রফেসর মনসুর। দারুণ একটা উল্লাস পেয়ে বসেছে ওঁকে, ঘুরে বাকি সবার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন, ঠিক এই সময় প্রচণ্ড একটা শক্তি হার্পুন-গানের গায়ে ঠেলে দিল ওঁকে। আরে, ওঁর শরীর আগুপিছু করছে! আবার ঘুরে সাগরের দিকে ফিরলেন। একরাশ পানি লাফিয়ে উঠল ওঁর মুখে—কীভাবে বলতে পারবেন না অত্যন্ত দ্রুত সরে যাচ্ছেন

তিনি। পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, ঘুরে তাকাতে দেখলেন দ্রুত চওড়া হচ্ছে একটা ফাঁক; যে বরফে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেটা মূল ফ্লো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং টান দিয়ে ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিমি।

বিস্ফারিত চোখে বরফটাকে ভেঙে যেতে দেখছে জুনো। ভাঙা অংশটা পঞ্চাশ বর্গফুট হবে, প্রফেসর মনসুরকে নিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ওটার গতি। 'জাম্প, সার, জাম্প!' চেঁচিয়ে উঠল ও, জানে এটাই বিজ্ঞানীর একমাত্র সুযোগ। দেখল ঘুরে দাঁড়িয়ে উথলানো পানির দিকে তাকালেন প্রফেসর।

'সার, জাম্প !' আবার চেঁচাল জুনো, তবে কোনও লাভ হলো না। বরফটা ভেঙে অনেকগুলো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এক-দেড় ফুট দূরে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে ওগুলো। প্রফেসরের ছোট ফ্লোটা এখন ভয়ানক ঝাঁকি খাচ্ছে।

প্রফেসরকে হোঁচট খেতে দেখল জুনো, বিপজ্জনকভঙ্গিতে কাত হয়ে পড়ছে ছোট্ট ফ্লো। বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, অসহায় বোধ করছে। ছোট ফ্লোর চারদিকে আরও ফিন মাথা তুলল; অনায়াসে পিছু নিচ্ছে, নিঃশব্দে।

এক পলক চোখ বুলিয়ে পুরো ছবিটা দেখতে পেল রানাঃ বিচ্ছিন্ন ফ্লো দূরে সরে গেছে, ওটার উপর আড়ষ্ট বিজ্ঞানী, কালো সেইল ফিনগুলো ওঁর চেয়েও বেশি লম্বা।

চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল ওর, মাথার ভিতর ঝড় বইছে—ওখানে থাকলে মারা যাবেন প্রফেসর, আর তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাবে ওঁর অমূল্য আবিষ্কার, যে আবিষ্কারের কল্যাণে ধানগাছ একবার মাত্র ধান দিয়ে মরে যাবে না। সব জাতের গাছের সম্ভাব্য সব রোগ সারা যাবে ওটা দিয়ে। কিছু গাছকে পরমায়ুও দেওয়া সম্ভব বলে আশা করা যায়। শুধু তাই নয়,

মারাত্মক একটা রাসায়নিক অস্ত্রও...

কিন্তু পানিতে লাফ দিলেও মারা যাবেন তিনি।

একটাই সুযোগ আছে ওঁর—এখন শুধু টুকরো বরফগুলোই বিজ্ঞানীকে বাঁচাতে পারে, যেগুলো পাথুরে ধাপের মত ছড়িয়ে রয়েছে পানির উপর।

'রাইফেল!' তাগাদার সুর রানার গলায়। নতুন ক্যাম্প-সাইটে রাইফেলগুলো এখনও আনা হয়নি।

ওয়েদারবাইটা জুনোর হাতে ধরিয়ে দিল হোমার। ওটা কাঁধে তুলে কিলারের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে জুনো।

'না, প্রফেসরের দিকে,' নির্দেশ দিল রানা। 'যতটা কাছে পারা যায়।'

হাঁ হয়ে গেল মনিকা, ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

নতুন করে লক্ষ্যস্থির করল জুনো, তারপর গুলি ছুঁড়ল। প্রফেসরের পায়ের কাছে খানিকটা বরফ ছড়াল। 'আবার,' বলল রানা।

জীবনে কখনও এত ভয় পাননি প্রফেসর। চারপাশে চোখ বুলালেন, দেখলেন লম্বা ফিনগুলো যেন তাঁর চেয়েও উঁচু। উথলানো পানির দিকে তাকাতে সাহস হলো না। 'হে আল্লাহ,' বিড়বিড় করলেন তিনি, তারপর সুর করে কবিগুরুর কবিতা আওড়াতে শুরু করলেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়!'

কড়াৎ!

নিজের পায়ের দিকে তাকালেন তিনি, কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কড়াৎ!

এবার তিনি দেখতে পেলেন বরফ লাফিয়ে উঠে মেঘ হয়ে যাচ্ছে। 'কী সাংঘাতিক, ওরা আমাকে গুলি করছে!' চারদিকে চোখ বুলালেন, পালাবার জায়গা খুঁজছেন। ঝট করে হার্পুন-গান থেকে

একটা হাত নামালেন উন্মাদগুলোকে সংকেত দেওয়ার জন্য। ঘুরে গেলেন আধ পাক।

কড়াৎ!

সামনে এক পা এগোলেন প্রফেসর, সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে পড়ল বরফ। উন্মত্তের মত চারদিকে তাকালেন, পরবর্তী ফ্লোটাকে নাগালের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। পা ফেলতে যাচ্ছেন ওটায়, চেঁচিয়ে উঠলেন পায়ে ঠাণ্ডা পানি লাগায়। এতক্ষণে মুখ থেকে খসে সাগরে পড়ল পাইপটা। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সামনের ফ্লোতে চলে এলেন তিনি, প্রায় শুয়ে পড়লেন ওটার উপর, পাগলের মত চেঁচামেচি করছেন, কী বলছেন কার সাধ্য বোঝে। কালো ফিনগুলো নিঃশব্দে পাশ কাটাচ্ছে।

উঠে বসলেন প্রফেসর, ধীরে ধীরে হাঁটুর উপর সিধে হচ্ছেন। হার্পুন-গান সহ খুদে ফ্লো এরইমধ্যে অনেকটা দূরে সরে গেছে, ওঁর চোখের সামনে অবশেষে উল্টে গেল ওটা, তিমিগুলো আবার পানি ছুঁড়তে শুরু করায় হারিয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে।

বাকিরা কোথায় রয়েছে দেখবার জন্য পিছনদিকে তাকালেন প্রফেসর। এতক্ষণে খেয়াল হলো, ওরা আর গুলি করছে না। অনেক দূরে দেখতে পেলেন ওদেরকে, সবার চেয়ে সামনে থাকায় একা শুধু রানাকে চিনতে পারলেন, জরুরি তাগাদার ভঙ্গিতে হাতছানি দিচ্ছে।

দাঁড়ালেন তিনি, টলমল করছেন, ফ্লোর উপর দিয়ে এগোলেন। কিনারায় পৌঁছে আরেকটা ফ্লোর তীর দেখতে পেলেন, আকারে একটু বড় ওটা, মাত্র পাঁচ কি ছ'ফুট দূরে। থামলেন, অস্থির ফাঁকটা দেখলেন, কয়েক পা পিছু হটলেন, তারপর ছুটে এসে লাফ দিলেন।

এবার পা দুটো ভিজতে দেননি। তবে লাফ দেওয়ার পর একটা প্রতিক্রিয়া হলো—ফ্লোর উপর দিয়ে হাঁটছেন, হাঁটু জোড়া থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, সেই সঙ্গে শ্বাস নিতেও কষ্ট

হচ্ছে।

বরফের উপর পড়ে গেলেন প্রফেসর, উঠলেন, আবার আছাড় খেলেন। কিনারাটা এখনও অনেক দূরে মনে হচ্ছে। দাঁড়াতে সাহস হলো না, ক্রল করে এগোচ্ছেন।

ওঁর বিশ গজ দূরে পানির উপর মাথা তুলল কিলার। ফ্লিপারগুলো বরফের কিনারায় আটকাবার আগে চোদ্দো ফুটেরও বেশি উঁচু হলো ওটা। বিরাট বোঝার চাপে ফ্লো নড়ে ওঠায় নিজের পজিশন খানিকটা অ্যাডজাস্ট করল, তারপর নিঃশ্বাস ছাড়ল।

শব্দ পেয়ে পিছনদিকে ঘাড় ফেরালেন প্রফেসর। দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি, একলাফে আবার সিধে হলেন, খিঁচে দৌড়াচ্ছেন সামনের দিকে।

মুখটা সামান্য একটু ঘুরিয়েছে তিমি। মুখের ভাঁজ, রেখা আর ক্ষতটায় আলো পড়েছে। প্রাচীন কোনও দেবতার মত চেহারায় রাজ্যের নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে ওঁকে দেখল ওটা, তারপর পিছলে নেমে গেল বরফ থেকে, ডাইভ দিয়ে হারিয়ে গেল।

হাঁপাচ্ছেন প্রফেসর, মাথা ঘুরছে, তারপরও দৌড়াচ্ছেন। ফ্লো ঝাঁকি খেল, হোঁচট খেলেন তিনি। মনে হলো চারপাশের বরফ ভেঙে যাচ্ছে। সামনের দিকে কাত হয়ে ছুটলেন, আতঙ্ক গ্রাস করছে। ওগুলোর একটা পানি থেকে উঠে আসতে আবার ঝাঁকি খেল ফ্লো, বরফের উপর দিয়ে পিছলে এগিয়ে আসছে, বিরাট দাঁতগুলো ওঁর নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল।

মাত্র এক সেকেন্ডে পরপর তিনবার গর্জে উঠল রাইফেল। তীক্ষ্ণ চড় মারার মত আওয়াজের সঙ্গে তিমিটার মাথা থেকে বিস্ফোরিত হলো রক্ত। কেঁপে উঠে পানির নীচে তলিয়ে গেল ওটা। ছুটে চলেছেন প্রফেসর, পা দুটো কাঁপছে, ওঁর প্রতিটি লাফ নিঃসন্দেহে প্রবল ইচ্ছেশক্তির বিজয়। দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গিয়ে ডান পায়ের সামনে বাম পা ফেলছেন, বাম পায়ের সামনে ডান পা।

আবার উঁচু হতে শুরু করল ফ্লো, তবে বোধহয় খেয়ালই করছেন না প্রফেসর, শুধু একাগ্রচিত্তে সামনের কিনারায় পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন।

কড়াৎ!

ওঁর সামনে বিস্ফোরিত হলো বরফ। গুঞ্জন তুলল রিকোশে। স্থির হয়ে গেলেন প্রফেসর, বিভ্রান্ত বোধ করছেন, সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝট করে মুখ তুললেন। দেখলেন পানি থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে তিনি। আর এক পা, কিংবা দু'পা, তা হলেই পৌঁছে যান। তবে পরবর্তী বড় ফ্লোর কিনারা দশ ফুট দূরে।

পা দুটো যেন কাদার তৈরি, কথা শুনছে না। আবার ঝাঁকি খেল বরফ। বসে পড়লেন তিনি, বুঝে গেছেন লাফ দিয়ে ফাঁকটা কোনও দিনও পার হতে পারবেন না। বোকার মত তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে, কাছাকাছি থেকে গর্জন উঠল।

চারদিকে তাকালেন প্রফেসর। এই তিমিটা একটু ছোট, সারা গা থেকে পানি ঝরছে, বাঁকা করা সাদা আঙুলের মত দাঁত। পাখি যেমন সাপের দিকে তাকিয়ে থাকে, নড়তেচড়তে পারে না, সেরকম দৃষ্টিতে দেখলেন বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে এসে ওটা তাঁর নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

ঝট করে আবার রাইফেল তুলল রানা। ওর হাতে রেমিংটন, সফট্-নোজ ম্যাগনাম বুলেট ভরা।

প্রথম গুলি তিমির চোখটাকে রক্তগোলাপ বানিয়ে ফেলল। পিছলে পিছু হটছে ওটা, যন্ত্রণায় বেদম কাতরাচ্ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি মাথার উপরটা উড়িয়ে দিল; নীরব, নিষ্প্রাণ হয়ে গেল ওটা।

বাঁকা হয়ে একটা লাইন পড়ল প্রফেসরের মুখে। খপ্ করে ওটা ধরলেন তিনি, রিফ্লেক্স অ্যাকশন; এখনও তাকিয়ে আছেন মরা তিমিটার দিকে।

'ওটা দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে বাঁধুন,' রানার গলা ভেসে এল।

তা-ই করলেন প্রফেসর, তারপরেই হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। কাঁধ দুটো বরফে বাড়ি খেল। আবার পিছলে সামনের দিকে চলে যাচ্ছেন। দ্রুত কাছে চলে এল ফ্লোর কিনারা। ওটাকে পাশ কাটালেন তিনি।

হিম পানির নীচে তলিয়ে যাচ্ছেন।

শক লাগায় ফুসফুস খালি হয়ে গেল। জ্ঞান হারালেন প্রফেসর।

চোদ্দো

ঢিব্!

ঘুম ভেঙে যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা। স্লিপিং-ব্যাগ খুলছে, দেখল এরইমধ্যে কাপড়চোপড় পরে তাঁবু থেকে বেরুতে যাচ্ছে জুনো। 'আসছি,' বলল ও, পরমুহূর্তে আরেকটা তিমি ওদের ফ্লোর তলায় ধাক্কা মারল।

ঢিব্!

'ধকলটা মনে হচ্ছে ভালই সামলে নিচ্ছে,' বলল জুনো। 'তোমার কথাই ঠিক, ফ্লোর মাঝখানটা যথেষ্ট পুরু।'

দ্রুত কাপড় পরছে রানা। 'আগে বাইরে বেরিয়ে দেখো কী অবস্থা।'

'রাইট,' বলল জুনো, ফ্ল্যাপ তুলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

ঢিব্!

রানাও বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে যেন ছুরি চালাল সূর্য। 'ওহ্, হেল!' জ্বলজ্বলে ধোঁয়াটে সোনালির ভিতর দিয়ে সঙ্গীদের উপর দৃষ্টি বুলাল। কয়েক পা এগিয়েছে, পা জড়িয়ে গেল নেটে।

'স্লো-ব্লাইন্ড,' বিদ্রূপের সুরে বলল অস্টিন। 'আশ্চর্য হচ্ছি, আমাদের মধ্যে একা শুধু মেয়েটার কাছে সান-গ্লাস আছে।' সামনে মনিকা বলবে, আড়ালে সব সময় শুধু মেয়েটা। ওর কাছে অপজিট সেক্স মানে কোনও ব্যক্তি নয়, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কালেকশন, যেগুলোর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে ও।

এই মুহূর্তে এখানে নেই মনিকা, ড্যাডিকে ছেড়ে তাঁবু থেকে এখন বেরুবেও না।

মারা গেছে ধরে নিয়েই প্রফেসরকে পানি থেকে তুলেছে ওরা। রানা, অস্টিন, জুনো আর হোমার—প্রত্যেকে ওঁর একটা করে হাত বা পা ধরেছে, তারপর ছুটতে ছুটতে ভারী অসাড় শরীরটাকে নিয়ে এসেছে নতুন ক্যাম্পে, তাঁবুর ভিতর।

রানার নির্দেশে ভিজে কাপড়চোপড় কাঁচি দিয়ে কেটে ওঁর শরীর থেকে আলাদা করা হয়েছে। তারপর গরম কম্বল ঘষে এমনভাবে শুকানো হয়েছে, মনিকা ভয় পাচ্ছিল গায়ের চামড়া না উঠে আসে। তবে ফার্স্ট এইড ট্রেনিংটা ভালভাবে নেওয়া আছে ওর; জানে পরিস্থিতি অনুসারে কখন কী করা দরকার।

সব ঠিকমতই করা হচ্ছে বুঝতে পেরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ফায়ার-ট্রের কাছে চলে এসেছে মনিকা, একটা প্যানে বরফ গলতে দিয়েছে। খালি কয়েকটা বোতল যোগাড় করে গরম পানি ভরেছে সেগুলোয়, তারপর চাদরে জড়িয়ে নিয়ে এসেছে তাঁবুর ভিতর, তুলে দিয়েছে রানার হাতে।

বোতলগুলো প্রফেসরের স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা। খানিক পর সবার চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়েছে—গরম হতে শুরু করেছেন বিজ্ঞানী, চেহারায় রঙও ফিরে আসছে।

মনিকার দিকে ফিরে হেসেছে রানা। 'এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন প্রফেসর।'

সবার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মনিকা, তারপর ওদেরকে কফি বানিয়ে খাইয়েছে।

কফি খাওয়ার পর করবার আর কিছু না পেয়ে ডিনার তৈরিতে জুনোকে সাহায্য করেছে রানা, হোমার আর অস্টিন গেছে বাকি বাক্সগুলো নতুন ক্যাম্পে নিয়ে আসতে। মনিকা ওর ড্যাডির পাশে, তাঁবুতে ছিল।

ডিনারের পর কেউ আর জেগে থাকার শক্তি পায়নি, যে-যার তাঁবুতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেই ঘুম সকালবেলা তিমির দল হামলা শুরু করতে ভাঙল।

টিব্!

'কেউই আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, তাই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' তিক্ত সুরে বলল অস্টিন, পরিবেশের এই জ্বলজ্বলে ধোঁয়াটে ভাবের জন্য রানাই যেন দায়ী। 'কী ব্যবস্থা করবে তাড়াতাড়ি করো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেটের আরেক প্রান্তে চলে যাচ্ছে জুনো।

'আমাদের আসলে আগেই প্রস্তুতি নেয়া উচিত ছিল, সার,' বলল হোমার।

'আর দায়িত্বটা নেয়া উচিত ছিল টিম লিডারের,' বলল অস্টিন।

'এ নিয়ে কথা না বাড়িয়ে কী করা যায়...' শুরু করল হোমার।

'প্রফেসর আমাকে বলেছেন, কোনও একটা বাক্সে মাস্কসহ স্নো-গগল আছে,' বলল রানা। 'ওঁর ক্যাম্প ডিরেক্টর হিসেবে তোমারই তো সেটা জানার কথা, অস্টিন।'

ধরা পড়া চোরের মত দেখাচ্ছে অস্টিনকে, রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'থাকতে পারে, কিন্তু সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার নয়, টিম লিডারের।'

'আমরা সবাই টিম লিডারের অ্যাসিস্ট্যান্ট,' বলল জুনো, সাপ্লাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতে কয়েক জোড়া মাস্ক ও স্নো-গগল। 'আমাদের কাজ লিডারকে সাহায্য করা।'

ওর হাত থেকে ছোঁ দিয়ে প্রথম সেটটা অস্টিনই নিল। 'দুঃখিত, আমি একমত হতে পারছি না,' বলল ও। 'আমার কাজ নিজেকে সাহায্য করা।'

চোখে অপলক দৃষ্টি, ওর দিকে আরেকটা সেট বাড়িয়ে ধরল জুনো। 'সেক্ষেত্রে এটা পরো মাথার পেছনে,' বলল ও। 'ওদিকেও তোমার নজর রাখা দরকার।'

'তোমার এ-কথার মানে?' ফোঁস করে ফণা তুলল অস্টিন। 'তুমি কি আমাকে থ্রেট করছ?'

মাথা নেড়ে জুনো বলল, 'একটা কিলার যদি চুপিসারে তোমার পেছন চলে আসে, কে তোমাকে সাবধান করবে, অস্টিন? যে লোক শুধু নিজেকে সাহায্য করতে চায়, আমরা কেউ তাকে সাহায্য করতে যাব কেন?'

'যাব,' বলল রানা। 'কারণ, ও বোকামি করতে পারে, আমরা পারি না। এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়।'

ফায়ার-ট্রেতে পানি চড়াল জুনো, সবার জন্য কফি বানাবে; রানা গেল প্রফেসর আর মনিকার খবর নিতে। ভালই আছেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোক।

তিমির দল, পুরু বরফ ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে, আপাতত বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারপরেও ওদের তিনজনকে নিয়ে ফ্লোটার কিনারায় চলে এল রানা, কাছে আর দূরের পানির উপর চোখ বুলাচ্ছে।

অস্থির একটা প্যাটার্ন নিয়ে দূরে রয়েছে ফিনগুলো।

প্রফেসর মনসুরকে উদ্ধার করবার সময় দুটো তিমি মারা গেছে, আরেকটাকে তিনি হার্পুন দিয়ে বধ করেছেন, তা সত্ত্বেও সংখ্যাটা ওদের চোখে আগের চেয়ে কম লাগল।

'ওগুলোর এই আচরণ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না,' বলল রানা।

'সবচেয়ে বড় বেজন্মাটা, মুখে যার দাগ,' বলল হোমার.

'আমার ধারণা সে-ই ওগুলোর লিডার। তিমি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তবে মনে হচ্ছে যা কিছু করছে ওগুলো, সব ওই ব্যাটার বুদ্ধিতে।'

'মুখে দাগ?' জিজ্ঞেস করল রানা, হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। 'কই, আমি তো দেখিনি। কী রকম দেখতে?'

'কী জানি কী রকম দেখতে। বরফের ওপর যখন উঠে আসছিল, এক সেকেন্ডের জন্যে মুখটা দেখেছি। তবে হলপ করে বলতে পারি, ওগুলো বুলেটের দাগ।'

'ঈশ্বর!' চোখ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল অস্টিন। 'এটা কি সম্ভব বলে মনে করো তুমি, রানা? কেউ মুখে গুলি করেছে, আর তাই মানুষের ওপর খেপে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইছে শালা?'

'অসম্ভব নয়। আফ্রিকায় হিংস্র পশু সম্পর্কে এরকম শোনা যায়, তিমির বেলায় সত্যি না হবার কোনও কারণ নেই,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, এমনিতেও, নামেই পরিচয়—কিলার। প্রশ্ন হলো, এই সমস্যার সমাধান কী?'

'সমাধান? সমাধান তো একটাই, সবগুলোকে মেরে ফেলতে হবে।'

'আমি সেটাকেই তো সমস্যা বলছি,' বলল রানা। 'মেরে ফেলা যাবে কি? জানি, রাইফেল দিয়ে ছোটগুলোকে মারা সম্ভব, যদি আমরা ওগুলোর গায়ে যথেষ্ট রেমিংটন সফট্-নোজ বুলেট ঢোকাতে পারি। কিন্তু আমাদের সাপ্লাই তো বেশি নয়।'

'ডাইনামাইট, সার,' বলল হোমার।

'হ্যাঁ, মনে আছে, ডাইনামাইট—কিন্তু খুব একটা কাজে এসেছে কি? তা ছাড়া, আমরা চাই না ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক ফ্লোটা।'

'না, সার, সে ভয় নেই,' বলল হোমার। 'এখনও পনের...বিশ একর রয়েছে। বরফের পাহাড়গুলোর কথা ভাবুন, ওগুলো ভাঙবে না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, মিস্টার হোমার। তৈরি হবার সময় পাহাড়গুলোর যে ভিত আর আকৃতি ছিল, আবহাওয়ার কারণে তা বদলে গেছে; সম্ভবত ফ্লোর বাকি অংশই ওগুলোকে খাড়া থাকতে সাহায্য করছে। ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না? ফ্লোর বাকি অংশে যদি কিছু ঘটে, ওটা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পাহাড়গুলো স্রেফ উল্টে যাবে!'

'যিশু ও মেরি, মাফ চাই!' তিক্ত সুরে বলল হোমার। 'তার মানে, সার, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আমরা—অপেক্ষা করব তেনারা দয়া করে কখন এসে খেয়ে যান আমাদেরকে?'

'না। আমাদের লড়তে হবে,' বলল রানা। 'কীভাবে লড়তে হবে সেটা ভেবে বের করি আসুন।'

'আমি জানি কীভাবে,' বলল জুনো, ওর ভরাট কণ্ঠস্বর সবাইকে মনোযোগী করে তুলল।

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন, গলায় সন্দেহ।

'কী করতে হবে বলছি,' শুরু করল এস্কিমো জুনো। 'ছোট একটা ভেলা বানাব আমরা, ধরা যাক কাঠ দিয়েই। ওটার ওপর ডাইনামাইটের ছোট একটা স্তূপ রাখব। তিমিগুলো যেখানে থাকবে, ভেলাটাকে ভাসিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে, তারপর ডাইনামাইটে গুলি করব...'

'কিন্তু ওগুলো তো প্রায় এক মাইল দূরে রয়েছে,' বলল অস্টিন। 'আমার হাতের টিপ অত ভাল নয়। তোমার?'

'না। তবে রানার টিপ ভাল, ও অনায়াসে পারবে,' বলল জুনো। 'ওয়েদারবাইয়ে টেলিস্কোপিক সাইট আছে, ওটার রেঞ্জও আছে।'

ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল অস্টিন, বলল, 'আমার বিশ্বাস হয় না।'

ঝট করে রানার দিকে তাকাল জুনো। 'কী, দোস্ত, পারবে না? একমাইল দূর, ডাইনামাইটের একটা বান্ডিল?'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'সেটা জানার একটাই তো উপায়, তাই না?'

কাজের সময় ভেলা হিসেবে ব্যবহার করা হলো ছোট এক টুকরো বরফ, ওটার উপর কাঠের লম্বা একটা তক্তা গেঁথে দেওয়া হলো, যেন একটা পাল। তক্তার গোড়ায়, চারধারে, ডাইনামাইটের দশটা স্টিক সাজাচ্ছে রানা। ওগুলোর চারটের সঙ্গে এক প্রস্থ ফিউজের সংযোগ থাকল, আর ফিউজটা তক্তার গায়ে কয়েকবার পেঁচানো হলো।

'আয়োজনটা এভাবে করায়,' ব্যাখ্যা করল রানা, 'ফিউজে আগুন ধরাবার জন্যে আমাকে শুধু তক্তাটায় বুলেট লাগাতে হবে।'

'শুধু!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল হোমার।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে গেল জিনিসটা। সাবধানে ওটাকে পানিতে নামাল ওরা, তারপর মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। শান্ত বাতাস ওটাকে ধীরগতিতে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

ফ্লোর কিনারায় ঝাড়া এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ওটার ভেসে যাওয়া দেখছে ওরা। প্রথমে সবাই মন্তব্য করছিল; কেউ আশাবাদী, কেউ নয়। তারপর রানা যখন রাইফেলটা চেয়ে নিল, সবাই একদম চুপ হয়ে গেল।

টার্গেট, পানির গায়ে কালো একটা দাগ, খালি চোখে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না; তবে রানা টেলিস্কোপিক সাইট অ্যাডজাস্ট করতেই লাফ দিয়ে ফোকাসে চলে এল, অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। বরফে একটা হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে ও, রাইফেলের বাঁট গালের পাশে সাঁটা। ওর আর টার্গেটের মাঝখানে পানি চিরে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা কালো সেইল ফিন।

মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলল রানা, আশপাশের অস্তিত্ব ভুলে গেল, সমস্ত মনোযোগ ক্রস-হেয়ারের সামনে নৃত্যরত টার্গেটের উপর। সাইট অ্যাডজাস্ট করল, বাতাসে ভর করে আসা শান্ত মচমচে ক্লিক শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে একটা

নির্দিষ্ট ছকে নিয়ে এল ও, তক্তাটাকে খাড়াভাবে দেখতে পেয়ে ওটার সামান্য উপরে রাখল ক্রস।

মুশকিল হলো, প্রতি মিনিটে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য তক্তাটাকে খাড়াভাবে পাওয়া যাচ্ছে, কারণ একের পর এক ঢেউ এসে উল্টো করা পেন্ডুলামের মত দুলিয়ে দিচ্ছে ওটাকে।

নিঃশব্দে গুনছে রানা। ডানেঃ এক...দুই...তিন...চার...; খাড়াঃ এক...দুই...তিন; বামেঃ এক...দুই...তিন...চার...; খাড়াঃ এক...দুই...তিন; ডানেঃ এক...' অবশেষে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ পাওয়া গেল, যদিও সেটা ভেঙে যেতে পারে বাতাসের মর্জিতে।

কাজেই, এবারই; বাতাস বদলে যাওয়ার আগে। গ্লাভ পরা আঙুল ধীরে ধীরে চেপে বসছে ট্রিগারে।

ডানেঃ এক...দুই...তিন...চার...; খাড়াঃ এক...দুই...তিন; বামেঃ এক...দুই...তিন...চার; খাড়া—

টার্গেট ইতস্তত করছে, তা সত্ত্বেও ট্রিগার টিপে দিল রানা। ক্র্যাক! কাঁধে ধাক্কা মারল রাইফেল। রাবার আই-পিসে এখনও সেঁটে আছে চোখ, তক্তাটাকে এক কি দু'ইঞ্চি ডান দিকে লাফিয়ে উঠতে দেখল ও। পরমুহূর্তে জ্যান্ত হলো ফিউজ।

কাঁধে ভারী একটা হাত অনুভব করল রানা, চাপ দিল মৃদু; তাতে ভক্তি ও গর্ব, দুটোই প্রকাশ পেল। না তাকিয়েও জানে কার হাত ওটা।

উত্তরে ঘাড় ফিরিয়ে জুনোর চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ একটু হাসল রানা।

সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল হোমার। 'আউটস্ট্যান্ডিং, সার, স্রেফ আউটস্ট্যান্ডিং!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল অস্টিন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

ফিউজ নিজের প্যাঁচানো পথ অনুসরণ করল না, আগুনের স্পর্শ পাওয়া মাত্র প্রায় সবটুকু একযোগে জ্বলে উঠল, সেই সঙ্গে ধরে

গেল তক্তার মাথার দিকটা। নিঃসঙ্গ এক প্রস্থ ফিউজকে চারটে ডাইনামাইট স্টিকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, সেটাও খুব তাড়াতাড়ি পুড়ল। ওদের জন্য ভালই হলো, কারণ ফিউজ পুড়তে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে তরল সোনালি আলোড়নের নীচে ডুব দিয়েছে ফিনগুলো।

ঢিব্!

পানি ও বরফের বিশাল একটা স্তম্ভ খাড়া হলো আকাশের গায়ে।

বরফ কাঁপছে, তার উপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এল মনিকা। 'কী হয়েছে? কীসের শব্দ ওটা?'

'মিস্টার রানা তিমিগুলোকে ভয় দেখাচ্ছেন,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল হোমার।

ওখানে দাঁড়িয়ে স্তম্ভটাকে অলস ভঙ্গিতে ভেঙে পড়তে দেখল মনিকা। অগভীর ঢেউ ছুটে এসে ওদের পায়ের কাছে, ফ্লোর কিনারায় আছড়ে পড়ল।

ওয়েদারবাইটা তুলে নিয়ে আবার সাইটে চোখ রাখল রানা, খুঁজে দেখছে দু'একটা ফিন পাওয়া যায় কি না। নাহ্, একটাও নেই। 'বোধহয় ভাগানো গেছে,' বলল ও।

ঘুরল, গান-সাইটে চোখ রেখে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। অনেক দূরে রোদ লেগে ঝিলমিল ঝিলমিল করছে মিহি জলকণা আর পানির কয়েকটা স্তম্ভ, ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

'চলে যাচ্ছে ওগুলো!' রানার গলায় উল্লাস। বাকি সবাইও আনন্দে হইচই করে উঠল।

দূর থেকে মার্জিত, ভরাট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমাকে বাদ দিয়ে ঠিক কী করছ বলো তো?' পুরোদস্তুর ড্রেস পরেছেন প্রফেসর আদনান মনসুর, আগের মতই সতেজ ও দৃঢ়চেতা, বরফের উপর দিয়ে দ্রুত ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। পিছলে যাচ্ছিলেন, থামতে পারলেন শেষ মুহূর্তে মনিকার একটা হাত ধরে

ফেলায়।

কী করা হচ্ছে শুনে খুশি হলেন প্রফেসর। 'এত বড় একটা সাফল্যের পর ভাল একটা খানাপিনার ব্যবস্থা হওয়া দরকার,' বললেন তিনি। 'আমার খুব খিদেও পেয়েছে।'

মাংস রান্না করল জুনো। সঙ্গে সেদ্ধ মটরশুঁটি, মাখন দিয়ে সেঁকা পাউরুটি আর সবশেষে কফি।

নিজের ভাগের মাংস রেখে দিল হোমার।

'আপনি মাংস পছন্দ করেন না?' ওকে জিজ্ঞেস করল মনিকা।

নিঃশব্দে চোখ মটকাল হোমার। 'প্রথম যে বাক্সটা খুলেছিলাম তাতে লাইন আর বড়শি পেয়েছি,' বলল ও। 'ডিনারের জন্যে তাজা কিছু মাছের ব্যবস্থা করতে চাই।'

'ওহ্, দারুণ আইডিয়া!' বলল অস্টিন। 'যতক্ষণ না কেউ এসে উদ্ধার করছে, আমাদের আর তো কিছু করারও নেই।'

'সেটা ঠিক কখন ঘটবে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইলেন প্রফেসর মনসুর।

কাঁধ ঝাঁকাল অস্টিন। 'আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করার আগেই মেসেজ পেয়েছে ওরা। কেউ নিশ্চয়ই সার্চ করছে।'

'আমরা কি অনেক দূর ভেসে এসেছি?' জিজ্ঞেস করল মনিকা।

'স্রোত আর বাতাস যেরকম পেয়েছি,' বলল রানা। 'প্রতিদিন ত্রিশ মাইল করে এগিয়েছি আমরা।'

'তা হলে কত দূরে এলাম?'

সবাই ওরা জুনোর দিকে তাকাল, জুনো তাকাল নীচে নেমে যাওয়া সূর্যের দিকে। 'তিনদিন।'

'তিনদিন!' হোমার বিস্মিত। 'টের পাইনি কখন পেরুল!'

'প্লেন ক্র্যাশ করার পর ষাট ঘণ্টার মত পার হয়েছে, অর্ধেক সময় ঘুমিয়েছি আমরা।'

'যেখানে ক্র্যাশ করেছি সেটা এখন প্রায় একশো মাইল দূরে!' বলল হোমার। 'আর যাচ্ছি রাশিয়ান জলসীমার দিকে...'

বেশ কিছুক্ষণ আর কেউ কিছু বলল না, চিন্তিত মুখে যে-যার মগে চুমুক দিচ্ছে।

তারপর প্রথমে নড়ে উঠল হোমার। হাতের প্লেট আর মগ নামিয়ে রেখে বলল, 'টোপ ফ্রিজ হবার আগেই শুরু করি কাজটা।' হাত তুলে ভারী সবুজ লাইন আর বড়শির বাক্সটা দেখাল ওদেরকে।

এখানে মাছ ধরা মানে হাতে প্যাঁচানো লাইনের মাথায় মাংস আটকে সাগরের পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া, অথচ তাতেই উত্তেজনায় ছটফট করছে হোমার। রানা বা আর কেউ ওকে বলল না যে এখানে কিছু ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ট্যাকল্ চেক করল হোমার। বিভিন্ন সাইজের বিশটা বড়শি, সবগুলোর গা বাঁকা হুকে ছাওয়া। নাইলনের সবুজ লাইন অত্যন্ত মজবুত, ব্রেকিং-স্ট্রেইন কমপক্ষে দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড। একবার কোনও মাছ যদি টোপ খায়, তার আর বাঁচার কোনও উপায় নেই। সরঞ্জামগুলো শখ মেটাবার জন্য নয়, প্রাণ বাঁচানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে।

সবুজ লাইনের শেষ প্রান্তে একটুকরো সিসা আটকাল হোমার, ট্যাকলের প্রথম আঠারো ইঞ্চির মধ্যে বিভিন্ন সাইজের তিনটে বড়শি ঝোলাল, সবচেয়ে বড়টা থাকল একেবারে নীচে। তারপর বড়শির কাঁটায় মাংসের টুকরোগুলো যত্ন করে গাঁথল।

'ব্যস।' সঙ্গে ছোট বাক্স আর কুড়াল নিল হোমার, ফ্লো ধরে রওনা হয়ে গেল ওদের পুরানো ক্যাম্প-সাইটের দিকে। 'দোয়া করবেন, যেন কিছু পাই।'

'রুশদের একটা সাবমেরিন তুলে আনুন,' সকৌতুকে বলল রানা। সবাই জানে যে আশপাশের পানিতে ওগুলোর আসা-যাওয়া আছে।

'সাবধানে, মিস্টার হোমার,' গলা চড়িয়ে বলল মনিকা।

ফ্লোর এদিকটায়, পুরানো ক্যাম্প-সাইটের আশপাশে, মাছ

ধরার মত গর্তের কোনও অভাব নেই। দেখেশুনে একটা গর্ত বাছাই করল হোমার। অভিজ্ঞতা না থাকায় ওর কাছে সব গর্তই একরকম। একটা বাক্স টেনে এনে বসল, হাতের লাইন পায়ের সামনের কালচে-সবুজ গর্তে নামিয়ে দিচ্ছে।

লাইনটা একশ' পঞ্চাশ গজ লম্বা, অর্ধেকটাই ডুবিয়ে দিচ্ছে হোমার, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তির্যকভঙ্গিতে ওটার নেমে যাওয়া দেখছে। ফ্লোর একটা নিজস্ব গতি তো আছেই, আরও আছে বরফের তলায় স্রোত, তার সঙ্গে যোগ হলো সিসা আর বড়শির ওজন, বেশ জোরাল টান পড়ছে লাইনে।

ছিপ নেই, কনুইটা হাঁটুর উপর রেখেছে হোমার, হাতটা যাতে সরাসরি গর্তের উপর পৌঁছায়। প্রথমে শুধু উলেন গ্লাভ পরেছিল, কিন্তু হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসায় আরেক প্রস্থ দস্তানা পরল। এটা সিল-এর পুরু চামড়া দিয়ে তৈরি হওয়ায় লাইন ধরতে অসুবিধে হচ্ছে, তাই কবজিতে দু'পাক জড়িয়ে নিল।

এরপর শুধু বসে থাকা আর স্বপ্ন দেখা, কারণ ওরও জানা আছে মাছ পাওয়ার তেমন কোনও আশা নেই।

মাস্কের সরু ফাটল দিয়ে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে হোমার। ভারি সুন্দর দৃশ্য। ওর চারদিকে সমতল সবুজ সাগরের বিস্তৃতি, শান্ত ও নীরব; রঙের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়েছে শুধু যেখানে ফ্লো আর মেঘের ছায়া আছে, আর যেখানে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ সোনালি রঙ ঢেলে দিয়েছে।

বহুদূর দিগন্ত পর্যন্ত এই একই দৃশ্য। উত্তরে পরিষ্কার সবুজ ধোঁয়ার মত একটা রেখা, ওটাই প্যাক। পুব একটা বিশাল বৃত্ত, আর দক্ষিণ দিগন্ত হারিয়ে গেছে সোনালি কুয়াশার ভিতর। ম্লান সোনালি আকাশ আলাস্কার কাছাকাছি কোথাও অনুজ্জ্বল সোনালি সাগরে মিশে গেছে।

লাইনে টান পড়া এতটাই অপ্রত্যাশিত যে প্রথমে হোমার বিশ্বাস করল না; তবে রিফ্লেক্স অ্যাকশন পাল্টা টান দিয়ে বসেছে,

সেই সঙ্গে কবজিতে জড়িয়ে নিয়েছে আরও একটা অতিরিক্ত প্যাঁচ। হাত ছিপের মতই লম্বা করা, এখনও হাঁটুর উপর কনুই, বাক্স ছেড়ে প্রায় উঠে পড়েছে ও।

দ্বিতীয় টানটা এত জোরাল, কনুইয়ের কাছে হাতটা শুকনো কাঠির মত ভেঙে গেল, জয়েন্ট খুলে যাওয়ায় আলগা হয়ে গেল কাঁধ, কলার-বোনটা চোয়ালে এত জোরে বাড়ি মারল যে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো হোমারের।

হাতের কনুই ভর দেওয়ার কিছু পেল না, সামনের দিকে পড়ে গেল হোমার, সরাসরি গর্তের ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা। মুঠো খুলে গেল, কিন্তু হাতে লাইন নেই, কবজিতে প্যাঁচানো, আর ওটার শক্তি ওর শরীরের ওজনের চেয়ে দেড় গুণ বেশি।

নীচের দিকে তাকাল হোমার। কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল, হঠাৎ দেখতে পেল ওর নীচের বরফে ছোপ ছোপ লালচে-খয়েরি দাগ। জিভের পিছনে লোহার স্বাদ পেল ও। ধ্যাত, শালা, নিজের জিভ কামড়ে ফেলেছি!

আবার ঝাঁকি খেল লাইন। হোমারের বাম দিকটায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। চিৎকার করতে গেল, একরাশ রুপালি বুদ্বুদ আওয়াজটাকে আটকে দিল। বাঁকা হয়ে নেমে গেছে লাইন, বিরতিহীন প্রবল টান গর্তের আরও ভিতরে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। তবে গর্তের মুখে কোমরটা আটকে গেল, পা দুটো অনবরত আকাশের দিকে ছুঁড়ছে ও। হিম পানিতে ভয়ঙ্কর ব্যথা করছে ওর চোখ, কান, কপাল আর বিশেষ করে দাঁত।

বিরাট সব বেঢপ আকৃতি দেখতে পাচ্ছে হোমার, কিন্তু চিনতে পারছে না। হঠাৎ ওগুলোর একটা ছুটে এল ওর দিকে, যত কাছে আসছে ততই পরিষ্কার হচ্ছে। তারপর একসময় চিনতে পেরে আর্তনাদ করবার জন্য নাক-মুখ দিয়ে বাতাস টানল ও; কিন্তু বাতাস নয়, ফুসফুস ভরে উঠল শুধু পানিতে।

*

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠে নেটের পাশ ঘেঁষে ছুটল রানা, এখনও কেউ এমনকী রিয়্যাক্টও করেনি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেয়েছে ও—হোমারের অর্ধেক শরীর গর্তের নীচে নেমে গেল, শুধু পা জোড়া খাড়া হলো আকাশের দিকে।

সাপ্লাই তাঁবুর রশিতে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে সিধে হলো আবার, প্রাণপণে ছুটছে, পিছু নিয়েছে জুনো আর মনিকা।

আলগা বরফের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গর্তটার কাছে থামল রানা, দেখল এখনও বাতাসে পা ছুঁড়ছে হোমার। সামনের দিকে ঝুঁকল ও, অস্থির গোড়ালি দুটোর নাগাল থেকে বাঁচার জন্য মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে, দু'হাত বাড়িয়ে হোমারের দুই গোড়ালির উল্টো দিক আর হাঁটুর নীচের হাড় আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে টেনে এনে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরল।

পা দুটো ফাঁক করল রানা, তারপর পিঠ আর ঊরুর সবটুকু শক্তি দিয়ে টানতে শুরু করল। গর্তের দু'দিকে দাঁড়িয়েছে জুনো আর মনিকা, হোমারের শরীর উপরে উঠে আসা মাত্র হাত ধরে টেনে তুলে নেওয়ার জন্য তৈরি।

আবার টান দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করল হোমার—এত সহজে যে বিশ্বাস করতে পারছে না ও। নীচের দিকে তাকাল মনিকা, ডুবন্ত মানুষটাকে সাহায্য করবার জন্য টান টান হয়ে আছে পেশি, পরমুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ, বরফে হাঁটু গেড়ে বসে বমি শুরু করল।

চোখে-মুখে বুনো একটা ভাব, ঝট করে জুনোর দিকে তাকাল রানা, সেই সঙ্গে এক পা পিছু হটল। জুনোর চেহারা চকচকে সাদা লাগছে, আতঙ্কে বিকৃত। আরও এক পা পিছু হটল রানা, ওর আলিঙ্গন থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল হোমারের পা দুটো—এতক্ষণে নীচে তাকাল সে-ও।

বরফের গর্তে নিতম্ব আটকে গিয়েছিল, তারপর কিছু নেই। হোমারকে যেন কোমরের কাছ থেকে করাত দিয়ে কেটে অর্ধেক করা হয়েছে। পা দুটো প্রচুর রক্তমাখা পানিতে পড়ে রয়েছে, ঝাঁকি খাচ্ছে এখনও।

পনেরো

ফিশিং হোলের লাল পানি নড়ছে। 'সরে এসো!' সাবধান করল রানা, বাকি দুজন পড়িমরি করে পিছু হটল।

অসম্ভব ধীরগতিতে, প্রায় কোনও শব্দ না করে, দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে পানি। সাদা-কালো প্রকাণ্ড মাথাটা উঁচু হলো, পানি ঝরছে। বিরাট মুখ, ক্ষত থাকায় বিকৃত দেখাচ্ছে, হাঁ হয়ে গেল। লকলকিয়ে বেরিয়ে এল ম্লান লাল কার্পেটের মত লম্বা জিভ, হোমারের পা দুটোকে টেনে নিল মুখের ভিতর, গা রিরি করা মটমট শব্দে বন্ধ হলো মুখ, তলিয়ে যাচ্ছে পানির নীচে—জুতো পরা পা দুটো তখনও দাঁতের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে, ঠোঁট যেখানে বন্ধ করা যায়নি।

এখনও বরফে হাঁটু গেড়ে রয়েছে ওরা তিনজন, আতঙ্কে মূর্তিতে পরিণত হয়েছে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে গোল গর্তটার দিকে, এই সময় বাকি দুজন পৌঁছাল।

'কী হলো?' ধমকের সুরে জানতে চাইল অস্টিন।

'কিলারটা...' রানার গলা থেকে ঠিকমত আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

এখনও বমি করছে মনিকা, তবে পেটে কিছু না থাকায় তেতো

পিত্তরস ছাড়া আর কিছু বেরুচ্ছে না। এগিয়ে এসে ওর পাশে হাঁটু গাড়লেন প্রফেসর।

ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে জুনো, বিষম খেয়ে খক খক করে কাশছে। 'রাক্ষস নিয়ে গেছে ওকে,' বলল ও।

'রাক্ষস?' অবিশ্বাসে চোখ বড় করল অস্টিন। 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...রানা বলছিল...চলে গেছে ওগুলো! সুইট জিসাস, আমরা জানতাম ওগুলো নেই!'

অস্টিন থামতেই, এত কাছে যে বিশ্বাস করা যায় না, একটা তিমির সগর্জন নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ হলো। সবাই একযোগে ঘুরল সেদিকে। ফ্লোর কিনারায় সিধে হয়েছে ওটা, মাত্র ত্রিশ ফুট দূর থেকে দেখছে ওদেরকে, ফ্লিপারগুলো ওটাকে খাড়া করে রেখেছে।

মুখ খুলে গেল, লকলকিয়ে বেরিয়ে এল জিভ, রোদ লেগে আট-ইঞ্চি লম্বা দাঁতগুলো যেন জ্বলছে। সাদা চিবুক চকচক করছে, সম্পূর্ণ অরক্ষিত, অথচ ওদের কারও কাছে কোনও অস্ত্র নেই।

'মর শালা!' সিধে হলো রানা, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে। নিজের অজান্তেই ওটার দিকে এগোল কয়েক পা, ঝুঁকে বরফের একটা টুকরো তুলল, তারপর গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল ওটাকে লক্ষ্য করে। তবে লাগাতে পারল না।

মাথাটা নামাল তিমি, একটু পিছিয়ে গেল, অপেক্ষা করছে—যেন দেখতে চায় কী করে রানা। শুধু মাথাটাই ওর চেয়ে অনেক-অনেক বড়, কিন্তু রানা ভয় পাচ্ছে না বা গ্রাহ্য করছে না। হোমারকে যেরকম নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, চাক্ষুষ করবার পর প্রচণ্ড আক্রোশ জন্ম নিয়েছে ওর মনে, এই মুহূর্তে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রায়োন্মাদ।

মারমুখো হয়ে ছুটে গেল রানা, ঘুসি মারার জন্য ডান হাত তুলছে। অপেক্ষা করছে তিমি, বিশ্বাস করতে পারছে না, যতক্ষণ না একেবারে নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল প্রতিপক্ষ।

রানার হাতটা ভারী কুড়ালের মত নেমে এল, তিমির কলঙ্কিত নাকটা একেবারে থেঁতলে দিল এক ঘুসিতেই। আরেকটা ঘুসি মারার জন্য হাত তুলেছে, প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে খুনির লেজ দড়াম করে আছাড় খেল পানির সারফেসে। প্রকাণ্ড শরীর লাফ দিয়ে সামনে এগোল। মুখ, খুলে যাচ্ছে, ধাক্কা দিল রানার পেটে—পিছনদিকে ছিটকে গিয়ে বরফের উপর পড়ল ও, অসহায়। প্রকাণ্ড মুখ খাড়া হলো ওর উপর, হাঁ করে আছে।

জুনো আর মনিকা একসঙ্গে এগোল, তিমিটাকে লক্ষ্য করে একের পর এক বরফের টুকরো ছুঁড়ছে ওরা। থামল ওটা, ইতস্তত করল, তারপর পিছলে নেমে গেল শান্ত সাগরের তলায়। ওরা দুজন দুটো হাত ধরে সিধে হতে সাহায্য করল রানাকে।

'হ্যাঁ, দেখালে বটে!' খেঁকিয়ে উঠল। 'এরকম নির্বোধ সাহস খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। আবারও নিশ্চয়ই ভাবছ, ওগুলোকে খেদিয়ে দিয়েছ—হুম, রানা?'

'উফ্, আপনি থামবেন, মিস্টার অস্টিন!' মনিকার গলায় কঠোর তিরস্কার।

কী যেন বলতে চেয়েও বলতে পারল না অস্টিন, মুখের পেশিগুলো জ্যান্ত প্রাণীর মত কিলবিল করছে। হঠাৎ ঘুরল, বরফের উপর দুপদাপ শব্দে পা ফেলে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে।

শুধু যে রানার প্রতি ঘৃণা আর মনিকার প্রতি লোভের কারণে উদ্ভট আচরণ করছে অস্টিন, তা নয়। ও বিশ্বাস করে, যে-কোনও পরিস্থিতিতে আসল হিরো হওয়ার যোগ্যতা একা শুধু তারই আছে; এবং নিজের ভুল ও নীচতা শুধুমাত্র নিজের মন মত ব্যাখ্যা করতে রাজি সে।

মেয়েটার প্রতি লোভ করবার মধ্যে কোনও দোষ দেখছে না অস্টিন। মনিকা নিজেকে ওর হাতে তুলে দিচ্ছে না দেখে বরং অবাক হচ্ছে ও। ভাবছে, যেখানে আমি আছি সেখানে কোনও মেয়ে অন্য কারও প্রতি আকৃষ্ট হয় কীভাবে!

আর ওই রানাটা! আমার জীবন থেকে দু'দুটো মেয়েকে ভাগিয়ে দিয়েছে ওই কুত্তা! বছরের পর বছর এই ঠাণ্ডা নরকে পড়ে আছি, দায়ী নুমার ওই বেজন্মা স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরটা! ওকে আমি ছাড়ব না!

আচ্ছা, মনিকা কি রানার ত্রুটিগুলো দেখতে পাচ্ছে না? কোন্ যুক্তিতে সবাইকে আশ্বস্ত করল ও যে, তিমিগুলো চলে গেছে? তারপর, হোমারকে মাছ ধরতে যেতে বাধা দিল না কেন?

কুয়াশার ভিতর হঠাৎ দেখা গেল, এত কাছে যে অবাক হতে হয়, ঝুলে রয়েছে একটা আইসবার্গ।

চিন্তার জাল ছিঁড়তে সময় নিচ্ছে অস্টিন। তারপর তাকিয়ে থাকল হাঁ করে। আইসবার্গটা প্রকাণ্ড, দেখে মনে হচ্ছে এক মিলিয়ন টন কাঁচ, আকাশের গায়ে উঁচু হয়ে আছে কয়েক শো ফুট; মেজাজী আবহাওয়া ওটাকে ভেঙেচুরে খাড়া ঢাল, পাহাড়-প্রাচীর, দুর্গ-প্রাকার, টাওয়ার, বাতিঘর, বরফের নুড়ি ছড়ানো সৈকত ইত্যাদির সমষ্টি বানিয়েছে।

বাকি সবার দিকে তাকাল অস্টিন, এখনও রানাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। এখনও ওরা কেউ দেখেনি। অনুভব করল নিজের ভিতর প্রবল একটা উত্তেজনা জাগছে—এরইমধ্যে গলে ছোট হতে শুরু করেছে ওদের ফ্লো, এই মৃত্যু-ফাঁদ থেকে ওদেরকে যদি উদ্ধার করতে পারে সে... যদি পারে... সন্দেহ নেই ফুটো লাইফ বোট থেকে ভাসমান যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় পাওয়ার মত একটা ব্যাপার হবে সেটা!

আবার মিলিয়ন টন কাঁচটার দিকে তাকাল অস্টিন। সচরাচর যেমনটা দেখা যায়—সমতল মাথা আর খাড়া পাশসহ আগোছাল ও সুবিশাল একটা আইসবার্গ, সন্দেহ নেই গ্রিনল্যান্ডের উত্তর উপকূলের কোনও হিমবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিকে ভেসে আসছে।

আইসবার্গ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, সেই সূত্রে অন্তত

এটুকু জানা আছে ওর যে, পানির নীচের বরফ মহাসাগরের অতল রহস্যে হারিয়ে গেছে, কার সাধ্যি আন্দাজ করে কতটা গভীরে। ওরকম আকার আর পুরুত্বের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না কিলাররা, পুঁটি মাছে পরিণত হবে ওগুলো।

ওদের দিকে ফিরে যাচ্ছে অস্টিন।

ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে রানা, সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক। অস্টিনের দিকে তাকাল মনিকা, চেহারার পরিবর্তনটা লক্ষ করল—হিংস্র ভাবটা নেই, তার জায়গায় প্রত্যাশা আর উত্তেজনা জমছে।

মনিকার সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল অস্টিন, মাস্কের পিছনে চোখ দুটো চকচক করছে। 'রানা,' বলল ও, 'আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে, আমি হয়তো সবাইকে বাঁচাতে পারি।' সবার দিকে তাকাল, মুখে গর্বের হাসি। 'শুধু যদি সাগরের দিকে একবার তাকাও, আমাদের সমস্যার চমৎকার সমাধান দেখতে পাবে।' হাত তুলে এমন ভঙ্গিতে আইসবার্গটা ওদেরকে দেখাল, হিমবাহ থেকে ছাড়িয়ে ও-ই যেন ওটাকে এখানে টেনে এনেছে।

সবাই ওরা মুখ তুলে তাকাল। এখনও কয়েক মাইল দূরে, তবে আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে যেন কাঁচের তৈরি হিমালয়। দেখল ওরা, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওটা।

'আমি দেখতে চাই ওই শালার তিমিগুলো কীভাবে ওটার তলা ভেঙে উঠে আসে!' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল অস্টিন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। অস্টিন ঠিক বলছে। একটা আইসবার্গে উঠতে পারলে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে, উদ্ধারকারীরা ওদেরকে দেখতেও পাবে সহজে। 'ঠিক আছে, অস্টিন। তোমার আইডিয়াটা সত্যি গ্রেট...'

বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ ভেসে এল, সেটার পিছু নিয়ে এল গুরু-গম্ভীর বজ্রপাতের মত শব্দ, ওদের দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। তারপর শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা।

আইসবার্গের আকাশ ছোঁয়া একটা খাড়া প্রাচীর, কয়েক হাজার টন বরফ ও তুষার নিয়ে আলোড়িত সাগরে ভেঙে পড়ছে। গোটা বার্গ এদিক ওদিক দুলছে; তুষার আর জলকণার বিস্ফোরণে, লাফিয়ে ওঠা জলরাশি আর কুয়াশার আড়ালে প্রায় সবটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওরা, প্রকৃতির এই বিশাল কর্মযজ্ঞে বিস্মিত না হয়ে পারছে না। বিরাট আকারের জলোচ্ছ্বাস ছুটে আসছে ওদের দিকে। ভাগ্যিস ফ্লোটা এখনও যথেষ্ট বড়, তা না হলে লাফ দিয়ে উপরে উঠে আসত দ্রুতগতি ঢেউ, ওদেরকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে সাগরে ফেলত।

ফ্লোর ছয় ফুট উঁচু কিনারায় বাড়ি খেয়ে বিস্ফোরিত হলো প্রকাণ্ড আকারের ঢেউ, তবে ফেনা আর বুদ্বুদসহ খুব সামান্য পানিই বরফের মেঝে দিয়ে গড়িয়ে ওদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারল।

বজ্রপাতের মত গুরু-গম্ভীর আওয়াজ এক সময় থামল, তবে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল আরও বেশ কিছুক্ষণ, তারপর তা-ও একসময় মিলিয়ে গেল দূরে।

কী বলবে বুঝতে পারছে না, কাজেই চুপ করে আছে অস্টিন।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, আপনমনে মাথা নাড়ল, তারপর বলল, 'ওকে। চলো, ক্যাম্পে ফিরি। চিন্তা করে দেখি কী করা যায়।'

'চিন্তা করার আছেটা কী?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন, চেষ্টা করছে নিজের হতাশা যাতে প্রকাশ না পায়।

'দেখতে হবে,' বলল রানা। জুনোর দিকে ফিরল ও। 'বিনকিউলারটা কোথায়?'

'তাঁবুতে। কেন?'

আপনমনে মাথা নেড়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছে রানা, অস্টিন ছাড়া বাকি সবাই ওর পিছু নিল।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে অকারণে ফুঁসছে অস্টিন। মুহূর্তের

জন্যও আইসবার্গটার উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না, ভাবছে, ওই শালার বরফের স্তূপটা আমাকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে, ফলে রানার হাত থেকে লিডারশিপ কেড়ে নেওয়ার সুযোগটা একেবারে মাঠে মারা গেল।

না, এত সহজে রানার কাছে হার মানতে রাজি নয় সে! তার আইডিয়াটা এখনও কাজে লাগানো যায়। একটা পাঁচিল ধসে পড়েছে তো কী হয়েছে, এখনও আইসবার্গটা ওদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। অন্তত এই ভঙ্গুর ফ্লোর চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ ওটা। ঘুরে হন হন করে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরল অস্টিন।

রানাকে ঘিরে ক্যাম্পের সবচেয়ে কাছাকাছি তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। চোখে বিনকিউলার, আইসবার্গটা দেখছে রানা।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন। 'কী দেখছ?'

বিনকিউলার একদিক থেকে আরেকদিকে ঘুরিয়ে, উঁচু-নিচু করে আইসবার্গটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে রানা। তুষার আর জলকণা, কুয়াশা আর পানির স্প্রে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর রোদ এখন সোনালি আগুন জ্বেলে দিয়েছে ওটার ঢালু গায়ে। চোখ সরু করে সবুজাভ স্ফটিকের ভিতর রানা যেন ওটার আত্মাকে খুঁজছে। ওর দৃষ্টিতে একটা ঢেউ-এর দৈত্যাকার সংস্করণ আইসবার্গটা, ভেঙে পড়বার মুহূর্তে স্থির হয়ে আছে, সাজানো হয়েছে রোদ, সাদা রঙ আর ঝলমলে ওয়াটার-শেড দিয়ে।

তবে আইসবার্গটার সৌন্দর্য রানার মনোযোগ কাড়েনি। চোখে সাঁটা বিনকিউলার এত ধীরভঙ্গিতে আর সতর্কতার সঙ্গে নাড়ছে ও, এমনকী অস্টিনও অটল ও নীরব হয়ে গেল, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

তারপর স্থির হলো বিনকিউলার। হিস্‌স্‌স্ করে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। আইসবার্গের একদিকের কোণে, ভারী একটা অবলম্বন দেখা যাচ্ছে; খাড়া পাঁচিল ঠেলে বেরিয়ে এসে, চওড়া একটা ছায়া তৈরি

করেছে ওটা। গাঢ় সবুজ ওই প্রাচীরটাকে একেবারে কাছে টেনে আনল বিনকিউলার, সেই সঙ্গে পরিষ্কার দেখিয়ে দিল ওটার গভীরতা। বার্গটার নীচের দিকে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল রানা। নানা রঙের ছোপ আর শেড দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রাচীরের পিছনের পুরুত্ব সব জায়গায় একরকম নয়, তার কারণ কাঠামোর নীচের দিকে বিশাল আকারের গহ্বর ও টানেল রয়েছে। পুরো প্রাচীরটা ফাটলে ভর্তি, কেউ যেন প্রকাণ্ড স্লেজ-হ্যামার দিয়ে হামলা করেছিল।

'ওটা গোস্ট—ভুত,' বলল রানা, চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে জুনোর দিকে তাকাল।

'ঈশ্বর সদয় হন!' বিড়বিড় করে কিছু পড়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে ফুঁ দিল জুনো। 'খ্রিশ্চান-মুসলিম সবাইকে রক্ষা করুন। আমেন।'

'ভুত মানে? কী বলতে চাও?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল অস্টিন। 'তোমার এইসব হেঁয়ালির আমি কোনও মানে বুঝি না...'

'ক্যাম্পে এসো, অস্টিন; বলছি তোমাকে।'

'রাখো!' খেঁকিয়ে উঠল অস্টিন। 'কী বলবে এখানে বলো...'

কিন্তু এরইমধ্যে ক্যাম্পের দিকে ঘুরে গেছে রানা, দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল। আইসবার্গটার দিকে তাকাল অস্টিন, ব্যাপারটা কী বুঝতে না পেরে ভ্রূ কোঁচকাল। গোস্ট বার্গ, এই ফ্রেইজটা শুনেছে সে, কিন্তু...ঘুরে বাকি সবার মত সে-ও পিছু নিল রানার।

ষোলো

'সবাই তোমরা জানো কীভাবে আইসবার্গ তৈরি হয়, কীভাবে গ্লেসিয়ারের প্রান্ত থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসে, তারপর বরফের একটা কিউব-এর মত ভাসতে থাকে সাগরে।' সবাই ওরা মাথা ঝাঁকাল। বসল অস্টিন, প্রতিটি শব্দ অবিশ্বাস করবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত।

আবার শুরু করল রানা।

অনেক আইসবার্গ ভাসতে ভাসতে উত্তর আটলান্টিকে পৌঁছে যায়; কিছু পৌঁছায় উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে। একসময় গরম স্রোত পায় ওগুলো, ফলে গলতে শুরু করে। তবে আর্কটিক মহাসাগরে থেকে যাওয়া আইসবার্গ একটু অন্য রকম। যেমন—খুবই ধীরে ধীরে গলে ওগুলো, আর চরম আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসে। এই চরম আবহাওয়ার কারণেই মাঝে-মধ্যে তৈরি হয় গোস্ট বার্গ।

গোস্ট বার্গ এমন একটা বার্গ, মহাসাগরের চারদিকে এত বেশি দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে বাতাস, বজ্র আর বৃষ্টি ওটার গায়ে অসংখ্য ফাটল তৈরি করেছে, ধীরে ধীরে সেগুলোকে গভীরতা আর প্রশস্ততা দিয়েছে, এমনকী বিরাট আকারের গুহা আর টানেলও বানিয়েছে। আর একবার যদি ফাঁপা হয়ে যায়, ওটাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।

সবাই ওরা প্রাচীরটাকে খসে পড়তে দেখেছে। ওটা যদি সত্যি গোস্ট বার্গ হয়, উপরের টেরেসগুলো সব একসঙ্গে ওই একইভাবে হুড়মুড় করে ধসে পড়তে পারে।

'কী কারণে ভাঙে?' জানতে চাইল মনিকা।

'অনেক কারণেই ভাঙতে পারে, তবে সাধারণত আওয়াজে।'

'আওয়াজে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, তারপর আরেকটু ব্যাখ্যা করল।

বার্গটার ভেতরে বিশাল বিশাল গুহা থাকে, সেগুলো ইকো-চেম্বার হিসেবে কাজ করে। এক গুহা থেকে আরেক গুহায় যাবার সময় প্রতিধ্বনির শক্তি বাড়তে থাকে, ওগুলোর ধাক্কায় ভেঙে পড়ে গুহার পাতলা দেয়াল—এভাবে শুরু, তারপর পুরো বার্গটাই চুরমার হয়ে যায়, সব মিলিয়ে হয়তো পঞ্চাশ হাজার টন।'

এবার সবাই ওরা নতুন দৃষ্টিতে, ভয়ে ভয়ে তাকাল আইসবার্গটার দিকে।

'তুমি বলছ, ওটা যদি সত্যি গোস্ট বার্গ হয়। তুমি নিশ্চিতভাবে জানো না?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন।

'আমি শুধু জানি আমাদের দিকে মুখ করে থাকা পুরো পাঁচিলটায় ফাটল আছে, কাজেই ওটা বিপজ্জনক। সেই সঙ্গে সন্দেহ করি ওপরের টেরেসগুলোর পেছনের পাঁচিল একটাও নিরেট নয়।'

'কিন্তু তোমার সন্দেহ অমূলকও হতে পারে। শুধু সন্দেহের কারণে নিরাপদ আশ্রয় পাবার এত বড় সুযোগটা হাতছাড়া করবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে রানা বলল, 'আমরা ওই ঝুঁকিগুলো খসিয়ে ফেলে দেখতে পারি কী হয়।'

'ঝুঁকিগুলো মানে?'

'রিস্কি টেরেসগুলোর কথা বলছি,' বলল রানা। 'তবে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, ওটা খুব কাছাকাছি চলে আসার আগেই। কারণ খারাপ কিছু ঘটলে, ধরো সবগুলো পাঁচিল ভেঙে পড়ল, গোটা আইসবার্গ উল্টে যেতে পারে।'

হাতে বিনকিউলারের বদলে ওয়েদারবাই রাইফেল, বরফে হাঁটু গেড়ে পজিশন নিল রানা। সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করল,

তারপর একের পর এক তিনটে গুলি করল।

প্রাচীরের নীচের দিকে সামান্য ধোঁয়া দেখতে পেল রানা। ওর সজাগ, স্পর্শকাতর কানে অদ্ভুত অনুরণন ধরা পড়ছে: যেন গুলির আওয়াজ ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে রিপিট করা হচ্ছে, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে আরও।

কপালে চিন্তার রেখা, প্রাচীরগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে ও। বরফের গা থেকে মিহি সাদা পাউডার উড়তে শুরু করল, যেন কেউ চিনি ছড়াচ্ছে। আওয়াজটা আরও বাড়ছে। কী যেন নড়ে উঠল।

সাইটের গার্ড ভ্রূর উপর টেনে আনল রানা। দেখল আইসবার্গের নীচের দিকে বরফের একটা অংশ বসে যাচ্ছে, কারণ নিরেট বলে মনে হলেও ভিতরটা দেখা যাচ্ছে একেবারে ফাঁপা। 'ওই যাচ্ছে...'

বিকট গর্জনে চাপা পড়ে গেল রানার গলা, যেন বরফের টানেল ধরে ফুল স্পিডে ছুটে আসছে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। গোটা আইসবার্গ পিছলাতে শুরু করল, ফুলে-ফেঁপে উঠছে নীচের দিক, উপরদিক দর্শনীয় ভঙ্গিতে নিচু হচ্ছে, চারপাশে বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে স্ফটিক স্বচ্ছ বরফ আর জলকণা ভর্তি মেঘ।

'ব্যাক!' জরুরি নির্দেশ দিল রানা, আইসবার্গের আর্তনাদকেও ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। এরইমধ্যে প্রথম সারির ঢেউগুলো ওদের দিকে টগবগিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। ঘুরে ক্যাম্পের দিকে এগোল সবাই।

'ডাউন!'

দ্বিতীয়বার কাউকে কিছু বলতে হলো না, ডাইভ দিয়ে পড়ল ওরা নেটের ভিতর, যে যা পেল তা-ই শক্ত করে ধরে থাকল।

ওদের ফ্লো, এত বড় হওয়া সত্ত্বেও, ধীরে ধীরে খাড়া হচ্ছে। এক অর্থে তা-ও মন্দ নয়, কারণ ঢেউগুলো বিনা বাধায় উঠে আসতে পারলে ক্যাম্পসহ ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত সাগরে।

সাপ্লাই তাঁবু ভেঙে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল ফায়ার-ট্রের সব ছাই; ওদের পায়ের নীচের বরফে ফাটল ধরল, যেন প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কাতর শব্দে গোঙাচ্ছে। ঢেউগুলো চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল ওরা, এতটাই আচ্ছন্ন বোধ করছে যে নড়বার শক্তি নেই।

খানিক পর মুখ খুলল রানা। 'এখানে থাকাটাই ভাল মনে হচ্ছে, তাই না?' উঠে বসল ও, তাকাতেই দেখল বিপজ্জনক আইসবার্গটা অনেক কাছে চলে এসেছে, ঝুলে রয়েছে ওদের উপর। রাশি রাশি বুদ্বুদ দেখতে পেল ও, পানির তলার প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ছে ছোট ছোট ঢেউগুলো।

ওর হিসাবে দুশো গজ উত্তর দিয়ে ওদেরকে পাশ কাটাবে বার্গটা। ব্যাপারটা মোটেও স্বস্তিকর নয়। 'যতটা সম্ভব কম শব্দ করব আমরা,' বলল রানা। 'বেশি নড়াচড়া করাও ঠিক হবে না।'

এমনকী অস্টিনও নিজের জায়গা ছেড়ে উঠল না, উজ্জ্বল কমলা রঙের নেটের স্ট্যান্ড ধরে পড়ে থাকল বরফের উপর।

ঢিব্! অকস্মাৎ ঝাঁকি খেল বরফ।

'হায়, যিশু! আবার!' মনে হলো কেঁদে ফেলবে অস্টিন।

আইসবার্গটা আকাশের এত বড় একটা জায়গা নিয়ে ঝুলে আছে, ফ্লোর সমস্ত সাদা রঙ গ্রাস করে ফেলেছে ওটা। আরেকটা কিলার ধাক্কা মারল ফ্লোতে।

ক্বড়াৎ!

ক্যাম্প পেরিমিটারের ঠিক বাইরে পরিচিত ভঙ্গিতে ফুলে-ফেঁপে উঠল বরফ।

'কী করব আমরা?' চেঁচিয়ে উঠল অস্টিন, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। 'রানা, তুমি কিছু বলছ না কেন?'

'প্রার্থনা,' বলল রানা। এক জোড়া ক্লিক-ক্লিক শব্দ হলো, খুলে আবার বন্ধ করল ওয়েদারবাইয়ের ব্রিচ।

'মিস্টার রানা! বার্গটাকে আপনি নামিয়ে আনতে চান?'

প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করল মনিকা।

মাথা নাড়ল রানা। ওর জানা আছে সাবধানে, নির্দিষ্ট সময় বিরতি দিয়ে গুলি করতে পারলে বিপদের কোনও ভয় নেই। 'না।'

ক্বড়াৎ!

ফাটল ধরা, ফুলে-ফেঁপে ওটা বরফ বিস্ফোরিত হলো। মাথা তুলল পরিচিত সাদা-কালো মাথা, গায়ে ভারি সুন্দর নকশা, অথচ ভয়ঙ্কর; বয়সে তরুণ। ওটার ঠিক চিবুকের নীচে গুলি করল রানা। চাঁদি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল লাল ঝরনা। খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল মুখ। জিভটা মোচড় খাচ্ছে।

গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে জোরাল হলো, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল তিমিটা, তারপর পানির নীচে ডুব দিল।

মাথাটা তখনও পুরোপুরি ডোবেনি, বাতাসে হুমকির মত ঝুলে রয়েছে গুলির প্রতিধ্বনি, ক্যাম্পের উত্তরে বিস্ফোরিত হলো ফোলা-ফাঁপা বরফের মেঝে। তারপর আরেকটা।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে উঠল অস্টিন।

'না,' বলল রানা, সামান্য হাঁপাচ্ছে। 'আগে প্রতিধ্বনি থামতে হবে।'

'তুমি যে বুলেট ব্যবহার করছ,' শান্ত সুরে বলল জুনো, 'ওগুলোর স্টপিং-পাওয়ার যথেষ্ট নয়। তারচেয়ে রেমিংটন আর হলো-পয়েন্টেড বুলেট ব্যবহার করো।'

'রাইট,' বলল রানা, গর্ত থেকে ওঠা দুটো তিমির মধ্যে বড়টাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। মাথায় লাগলেও, ভারী খুলিতে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট, তেমন কোনও ক্ষতি হলো না। হাঁক ছাড়ল তিমিটা, তার কাতর আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল, প্রলম্বিত হলো, যেন লাউড পেডাল ডাউন করা কোনও পিয়ানোর কর্ড-এ আঘাত করা হয়েছে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো জুনো, সাপ্লাই তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে।

পৌঁছে গেছে, এই সময় বিকট শব্দের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওর পায়ের নীচের নরম বরফে একযোগে ধাক্কা মারল একজোড়া তিমি। হাঁটু গাড়ল ও, আতঙ্কিত দৃষ্টি ছুটে গেল আইসবার্গের আকাশছোঁয়া প্রাচীরের দিকে, যেটার গা থেকে সাদা বাষ্প আর মিহি সাদা পাউডার উড়ছে।

ঢাল ধরে আরও অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে জুনোর দৃষ্টি, হঠাৎ দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল, অনুভব করল ওর ঘাড়ের পিছনের চামড়া ক্রল করছে, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে চুল। চূড়ার কাছাকাছি টেরেস থেকে তুষারের বিরাট স্তূপ ধসে পড়ছে, যেন অদৃশ্য কোনও দৈত্যাকার কোদাল ঠেলে দিচ্ছে কিনারা থেকে।

ঢাল বেয়ে সবেগে নেমে আসা তুষারধস গুম্‌গুম্ আওয়াজ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পানিতে। তবে প্রাচীরটা খাড়াই থাকল।

পায়ের নীচের বরফ আবার ফুলে উঠে ভেঙে যাচ্ছে, দেখতে পেয়ে সংবিৎ ফিরল জুনোর। হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় ভেঙে পড়া সাপ্লাই তাঁবুর ভিতর ঢুকল, রেমিংটন রাইফেলটা খুঁজে নিয়ে এক ঝটকায় ব্রিচ খুলল—গুলি করবার জন্য রেডি।

সেফটি অফ করল জুনো, তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছুটে ফিরে আসছে। তীক্ষ্ণ শব্দে আবার গর্জে উঠল ওয়েদারবাই। প্রতিধ্বনি জোরাল হচ্ছে। চোখ তুলে আবার আইসবার্গের দিকে তাকাল ও, ঝুলে আছে ওদের উপর, যেন মনে হলো নিজেই ঠাণ্ডা বাতাস তৈরি করে ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। এত কাছে এখন, পিছনদিকে উঁচু আর কাত হওয়ার সময় ওটার জলমগ্ন অংশের কিনারা ওদের ফ্লোর উত্তরপ্রান্তের কিনারার সঙ্গে ঘষা খেয়ে কর্কশ আওয়াজ করছে।

ঢিব্!

ক্যাম্প ও সাগরের মাঝখানের বরফ আবার বিস্ফোরিত হলো। আলোয় উঠে এল আরেকটা মাথা। কাঁধে রেমিংটনের বাঁট চেপে ধরল জুনো...

'জুনো! না!' একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়ে নিষেধ করল

রানা।

কিন্তু ততক্ষণে ট্রিগার টেপা হয়ে গেছে জুনোর। ভারী সফট্-নোজ বুলেট তিমিটার মুখ ছিন্নভিন্ন করে দিল। বরফের উপর দিয়ে সগর্জনে ছুটল ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি, সঙ্গে যোগ হলো ওয়েদারবাইয়ের তৈরি অনুরণনের রেশ, ফলে চারপাশের বাতাস পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করল।

দুশো ফুট উঁচু চূড়ার কাছাকাছি টেরেসগুলো থেকে টন টন তুষার বিকট শব্দে নেমে এসে ফ্লোর উপর পড়ছে। নির্দিষ্ট এক চক্র ধরে তুঙ্গে উঠছে কান ফাটানো গর্জন, চারদিক কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

তারপরেও আইসবার্গটা পড়ছে না। কিন্তু তিমিগুলো, রাইফেলকে ভয় না পেলেও, নিজেদের স্পর্শকাতর ও কোমল কানকে রক্ষা করবার জন্য বাধ্য হয়ে দূরে সরে গেছে। ধীরে ধীরে একসময় নীরবতা ফিরে এল।

'আল্লাহ !' বললেন প্রফেসর।

'যেমন ধারণা করেছিলাম, বার্গটা তারচেয়ে বেশি সলিড,' বলল রানা।

জুনো বলল, 'তা ঠিক, তবে খুব বেশি নয়।'

'তা তুমি বলতে পার না, জুনো,' প্রতিবাদ করল অস্টিন। 'আমার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সলিড ওটা। রানা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? সাবধানে থাকলে, যদি বিশেষ শব্দ না করি, ওখানে আমরা ভালই থাকব!'

কেউ কিছু বলছে না।

'যিশুর কিরে, রানা; চারদিকে তাকাও একবার! ফ্লোর এদিকটা সবচেয়ে পুরু, অথচ এত সহজে উঠে আসছে ওগুলো, বরফ যেন টিস্যু-পেপার! কাল-পরশু কী হবে, বরফ যখন হয়ে যাবে আরও পাতলা?'

দমকা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল শব্দটাকে, আইসবার্গ লুফে

নিল, তারপর ফিরিয়ে দিল আরও জোরে: '*পাতলা— পাতলা— পাতলা— পাতলা!*' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূরে।

চোখ তুলে তাকাল রানা। ফ্লোর কিনারা বার্গের জলমগ্ন অংশটাকে বাধা দেওয়ায় শুধু গতি কমেনি, খানিকটা ঘুরেও গেছে আইসবার্গ। দৃষ্টিপথে নিখুঁত একটা সৈকত চলে এসেছে, পিছনে অল্প ঢালু, ঢালের উপরে সুরক্ষিত একটা প্ল্যাটফর্ম। পঞ্চাশ গজ দূরেও নয়। মাথা ঝাঁকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত লাগাল ওরা।

বিশদ আলোচনা না হলেও, ওরা জানে কাকে কী করতে হবে। সবচেয়ে লম্বা রশির কুণ্ডলীটা নিল মনিকা। সব মিলিয়ে পাঁচটা আগ্নেয়াস্ত্র, সবগুলোই নিলেন প্রফেসর। জুনো আর অস্টিন দুজন মিলে একটা বাক্স ভেঙে বের করল কলাপসিবল ক্যানুটা।

রানা চলে এল ফ্লোর উত্তরপ্রান্তের পাহাড় চূড়ায়।

ফাঁপা স্টিলের ফ্রেম আর ক্যানভাস দিয়ে তৈরি ক্যানুটা, তিন ভাঁজ করা যায়, দুজন মানুষ চড়তে পারবে। বৈঠা আছে। দ্রুত হাতে জোড়া লাগিয়ে পানিতে নামানো হলো ওটাকে।

'আমাকে একটা রাইফেল দাও,' বলল অস্টিন। 'একজোড়া পেগও লাগবে, ওখানে পৌঁছে বরফে গেঁথে রশি জড়াব। তারপর খুব তাড়াতাড়ি ফেরিতে তুলে বাক্সগুলো নিয়ে যেতে পারব। ওকে?'

'ওকে,' বলল রানা।

রেমিংটন আর ইস্পাতের গোঁজ নিয়ে খুশি মনে ক্যানুতে চড়ল অস্টিন। বোট সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে ওর। দৃঢ়, অথচ অনায়াস ভঙ্গিতে বৈঠা চালাচ্ছে।

বার্গের কোনও অংশ এখন আর ফ্লোর সঙ্গে লেগে নেই, ফলে ওটার গতি আবার বেড়ে গেছে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে ওদেরকে। পানির আরও গভীরে বৈঠা ডোবাচ্ছে অস্টিন, আইসবার্গের ছায়া লক্ষ্য করে ক্যানু চালাচ্ছে। ফ্লোকে পিছনে ফেলে

পঞ্চাশ গজ চলে এসেছে ও।

রশিটা নাইলন, পানিতে ভেসে থাকায় টেনে আনতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ আবার সোনালি উজ্জ্বলতা ফিরে আসায় চোখ সরু করে তাকাল ও। আর বেশি দূরে নয়...

'অস্টিন!' ডাকল রানা, গলায় তাগাদার সুর। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকাল ও। রশিটা টান টান হয়ে গেল, সামনের দিকে ঝাঁকি খেল ও।

ওদিক থেকে রশি ছাড়া বন্ধ করে দিয়েছে জুনো। ছাড়ছে তো নাই-ই, যত দ্রুত পারা যায় টেনে নিচ্ছে। সরু স্টার্ন ও বো-র দিকে তাকাল অস্টিন, কোথাও কোনও সমস্যা নেই। ক্যানুর কোমরের কাছে হাঁটু গাড়ল ও, উন্মাদের মত চারদিকে তাকাচ্ছে।

তারপর, দূরে, দেখতে পেল ওগুলোকে। তীরচিহ্নের আকৃতি নিয়ে পাঁচটা প্রকাণ্ড ফিন, ছুটে আসছে অসম্ভব দ্রুতবেগে।

'বাপ রে!' টান দিয়ে হাতের গ্লাভ খুলে ফেলল অস্টিন, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রাইফেলটা। হাঁটু দুটো আরও ফাঁক করল, কোমরের কাছ থেকে ব্যারেলটাকে ঘুরিয়ে সাগরে কিলার ওয়েইল খুঁজছে।

প্রথমটা পানির উপর মাথা তুলল মাত্র কয়েক গজ দূরে, বার্গের জলমগ্ন অংশের কারণে বাধ্য হয়েছে। স্যাঁৎ করে ব্যারেল ঘুরিয়েই ট্রিগার টিপে দিল অস্টিন, কিন্তু লাগাতে পারল না। ব্রিচে আরেকটা বুলেট ভরল, ট্রিগারে টান টান হলো আঙুল, কিন্তু ডুব দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে ওটা।

প্রথম গুলির প্রতিধ্বনি ওর চারপাশে গর্জন করছে, ব্যথা করছে কান দুটো। গর্দভ! ম্যাগাজিনে আছে কটা! নষ্ট করো না! অপেক্ষা করো, শুধু চোখের সাদা অংশ দেখতে পেলে গুলি করবে!

এখনও দ্রুত পিছনদিকে ছুটছে ক্যানু, হঠাৎ কালো পানি থেকে লাফিয়ে উঠল আরেক কিলার। গুলি করল অস্টিন, দেখল ওটার মাথার উপরটা বিস্ফোরিত হলো। শূন্যে মোচড় খেল প্রকাণ্ড শরীর,

বিপুল পানি ছিটিয়ে ওর পাশে দড়াম করে পড়ল। ঘুরল ও। ক্যানুর পাশে চলে আসছে ওগুলো। ক্র্যাক! ক্র্যাক! সাদা-কালো একটা মাথা কয়েক টুকরো হয়ে উড়ে গেল।

বোটের তলায় চলে এসেছে ওগুলো। কিনারা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকল অস্টিন, ক্যানু মারাত্মক কাত হয়ে গেলেও গ্রাহ্য করছে না, সাগরের গভীরে চোখ বুলাবার চেষ্টা করছে। ওই! সাদা-কালো আকৃতি সবেগে উঠে আসছে। কোনও রকমে লক্ষ্যস্থির করেই পরপর তিনটে গুলি করল ও।

ক্র্যাক! ক্র্যাক! ক্র্যাক! তিমির মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ভাঙা হলো সিকোয়েন্স; বিরতি না দিয়েই ফায়ার করা হয়েছে।

আইসবার্গের দিকে ফিরল অস্টিন। ওর চোখের সামনে কাছাকাছি প্রাচীরের রঙ ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। বিশাল সব ফাটল বিদ্যুৎচমকের মত এঁকেবেঁকে ছুটল। দৈত্যাকার বোল্ডার লাফ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলো, ডিগবাজি খেতে খেতে দুশো ফুট নীচে নেমে আসছে।

অতিকায় আইসবার্গের গোটা কাঠামো আকৃতি হারিয়ে ফেলছে, একের পর এক ভেঙে পড়ছে চারদিকের টেরেস। এমন গর্জন আগে কখনও শোনেনি অস্টিন, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন বরফ বিস্ফোরিত হয়ে বোল্ডারে পরিণত হচ্ছে, তারপর সব একসঙ্গে হুড়মুড় করে নেমে আসছে সাগরে।

অস্টিনের পিছনে, ফ্লোর উপর, নিঃশব্দে উঠে পড়ল ক্যানু। পড়িমরি করে নেমে এল ও। রানা ও জুনো জড়ো করা রশি বোটের উপর ফেলল, তারপর ওটা তুলে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল। তুমুল বৃষ্টির মত পানির ছিটা ভিজিয়ে দিচ্ছে সবাইকে, গ্রাস করে ফেলছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল অস্টিন।

পানির বিশাল স্তম্ভ ভেঙে পড়ছে। সাগর উত্তাল। কোথাও উথলাচ্ছে, কোথাও সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড ঘূর্ণি। ডজন ডজন বরফের

বোল্ডারকে টেনে নিচ্ছে সেই ঘূর্ণি, ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত চিহ্নকে। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো পশ্চিমদিকে ছুটছে; বিশ, ত্রিশ ফুট উঁচু। চারদিকে শান্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে রাশি রাশি বুদ্বুদ।

তারপর, ধীরে ধীরে—অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—অসংখ্য টেরেসের ভারে আইসবার্গের যে অংশটা পানির নীচে ডুবে ছিল সেটার একটা কোণ রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথাচাড়া দিল। উন্মত্ত সাগরকে সরিয়ে এক ফুট দু'ফুট, এক গজ দু'গজ করে উঁচু হচ্ছে, ওটার ছায়া তেলের মত ছড়িয়ে পড়ছে পানি আর ফ্লোর উপর। স্ফটিক স্বচ্ছ পাশগুলো থেকে পানি গড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড চূড়া যেন আকাশ ছুঁতে চায়, দুশো ফুট উঁচু।

অর্ধেকের বেশি পানির উপর উঠে এসেছে, তারপর কাত হতে শুরু করল বরফের স্তম্ভ, লাফ দিয়ে উঁচু হওয়ার গতিতে লাগামের টান পড়ল। শূন্যে ঘুরতে লাগল ওটা। অবশেষে পতন শুরু হলো ওটার।

জলোচ্ছ্বাসের একটা স্তম্ভ সগর্জনে আকাশের দিকে উঠে গেল। বৃত্তাকার ঢেউ তৈরি হলো, একেকটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু, তুমুল বেগে ছুটে এসে আঘাত করল ওদের ফ্লোতে। নিচু পাহাড়ের নিরেট পাঁচিলে বাধা পেয়ে বিস্ফোরিত হলো প্রতিটি ঢেউ।

ফ্লোটা যেন আছাড় খেল শূন্যে, বরফ-পাহাড়ের পুরো সারি ঝাঁকি খাচ্ছে প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে। চারদিক থেকে এমন বিকট গর্জন ভেসে আসছে, বরফে ফাটল ধরার আওয়াজ ওরা কেউ শুনতে পেল না। পাহাড়গুলো নুয়ে নুয়ে পড়ল, তারপর আবার সিধে হলো।

নীরবতা ফিরে আসবার অনেক পর ব্যাপারটা উপলব্ধি করল ওরা—কোথাও কোনও শব্দ নেই; ওরা নিরাপদ।

প্রথমে সিধে হলো রানা, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। এক এক করে বাকি সবাইও দাঁড়াল। কারও মুখে কথা ফুটছে না। আধঘণ্টা

আগে প্রায় বিশ একর ফ্লোর মাঝখানে ছিল ওরা। এখন দেখা যাচ্ছে তার বেশিরভাগটাই নেই।

একটা বাদে সারির সবগুলো বরফের পাহাড় গায়েব হয়ে গেছে। পুরানো ক্যাম্প সাইট নেই। পানি থেকে লাফ দিয়ে যেখানে প্রথম উঠেছিল প্লেনটা, ফ্লোর সেই দক্ষিণ প্রান্তেরও কোনও চিহ্ন নেই।

আইসবার্গের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, ওদের চোখের সামনে সোনালি কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। ওদের আশ্রয়কে ওটা দুই তৃতীয়াংশ ছোট করে দিয়ে গেছে—মাঝারি একটা খামার ছিল, এখন সেটা ছোট একটা বাগান। হঠাৎ, নীরবে এসেছিল; ফিরেও যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে।

সতেরো

শুয়ে পড়ল ওরা আবার। একটা আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে কেটে গেল পরবর্তী কয়েকটা ঘণ্টা। মৃত্যুর দুয়ার থেকে অল্পের জন্য ফিরে এসে সবাই বিচলিত, এমনকী রানা আর জুনোও এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক হতে পারছে না, নতুন পরিস্থিতি যে বাড়তি বিপদ ডেকে এনেছে সেই কথা ভেবে দুজনেই দমে গেছে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে। যা দেখল, বুকে জমে ওঠা ভয় তাতে এতটুকু কমল না। আরও ছোট হয়ে গেছে ওদের ফ্লো, একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।

ফ্লোর কোনও প্রান্তেরই শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না,

কারণ কিনারা ঘেঁষে অসংখ্য গর্ত আর ফাটল তৈরি হয়েছে। ফ্লোর মেঝের রঙ কোথাও কোথাও জ্বলজ্বলে সবুজ, এর মানে হলো ওখানের বরফ খুবই কম পুরু।

ওদের আশ্রয়ের বর্তমান আকৃতি প্রায় চৌকো, প্রতিটি দিক কমবেশি দুশ' গজ লম্বা। মোটামুটি সমতল, মেঝেটা সি-লেভেলের চেয়ে এক ফুট উপরে—নিঃসঙ্গ পাহাড়টা শুধু দশ গজের মত উঁচু, এই মুহূর্তে ওদের খুদে জাহাজের গলুই হিসাবে কাজ করছে।

খুদে তো বটেই। চারদিকে চোখ বুলাবার সময় নিজের অজান্তেই পিছু হটে ফ্লোর মাঝখানে চলে এসেছে রানা। পাহাড়ের সারি না থাকায় চারদিকটা এখন দেখতে পাচ্ছে ও, সেই সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা। চারদিকে উজ্জ্বল মহাসাগরের বিস্তৃতি ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

ধীরে ধীরে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরল রানা, থামল আবার পাহাড়টার দিকে মুখ করে। কিছু নেই। যত দেখছে ততই ছোট মনে হচ্ছে ফ্লোটাকে।

'যিশু, ওহ্ যিশু!' বলল জুনো।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। হাঁটুর উপর সিধে হয়েছে ওর এস্কিমো বন্ধু, সরু চোখ দুটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উজ্জ্বল সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটখাট ফ্লোগুলোর মাঝখানে তিমি খুঁজছে ও।

রানা আগেই দেখেছে, তবে একটা ফিনও চোখে পড়েনি।

'ইস্, এ-ত ছোট হয়ে গে-ছে!' ফিসফিস করল মনিকা, ভেঙে গেল গলাটা।

'তারপরেও,' বলল রানা, 'যে-কোনও জাহাজের চেয়ে বড়।'

'হ্যাঁ, দেখতে তা-ই লাগছে,' বলল জুনো, 'মনে হয় এখনও কয়েক হপ্তা অনায়াসে টিকে থাকবে।'

কেউ আর কিছু বলল না। চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন বিজ্ঞানী আদনান মনসুর। কিছু শুঁকলেন, তারপর সশব্দে বুক ভরে নিলেন

তাজা বাতাসে। 'আহ্,' বললেন তিনি। 'সাগরের বাতাস আমার খিদে বাড়িয়ে দেয়।'

'খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর কি কিছু করব না আমরা?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন, গলায় ঝাঁঝ।

'হ্যাঁ, করব, অবশ্যই করব! আমরা সারভাইভ করব!' শুধু তিরস্কার নয়, মনিকার জবাবে একটু যেন ধমকও আছে।

'করার আর কী আছে এখানে?' শান্তসুরে প্রশ্ন করল জুনো।

কেউ কিছু বলল না। আসলেও নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া ওদের কারুরই কিছু করবার নেই।

নীরবতা নেমে এল।

স্ফটিকস্বচ্ছ বরফের টুকরো নড়াচড়া করছে চারপাশে। বরফের মেঝে কোথাও যখন ফাটছে, গুলির মত শব্দ হচ্ছে। বাতাস শুরু হওয়ায় তাপমাত্রা আরও কমেছে। একটু দূরে ঝলমলে সাগর, ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে ফ্লোর কিনারায়।

ওদের কমলা নেট টান টান হলো, পতাকার মত পতপত আওয়াজ করছে। ফুলে উঠল তাঁবুগুলো। রাশিয়ার উত্তর প্রান্ত থেকে ছুটে আসা হিম বাতাস অদৃশ্য একটা নদীর মত ওদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

বাতাসের মতই ঠাণ্ডা, মনিকার চোখ সঙ্গীদের ছুঁয়ে গেল, ঝাপসা ভাব কেটে গিয়ে এই যেন প্রথম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও—সবার গালে কদিনের না কামানো দাড়ি, নোংরা, গর্তে ঢোকা চোখ, চেহারায় বেপরোয়া ভাব।

অস্টিনকে বিশেষভাবে লক্ষ করল মনিকা। ওকে দেখে কোণঠাসা বিড়ালের মত বিপজ্জনক আর ভীতিকর লাগছে; যে-কোনও কিছু করে বসতে পারে সে। সারা মুখে অসংখ্য রেখা তৈরি হয়েছে।

জুনোকে অত খারাপ লাগছে না। তবে ওর তেল চকচকে চুলের অবস্থা একেবারে যা-তা হয়ে আছে। চোখ দুটোর নীচে

নিরেট গাল কর্কশ লাগছে, ওরও মসৃণ চামড়ায় নতুন রেখা ফুটেছে।

তবে সবার চেয়ে বেশি বয়স বেড়েছে ওর ড্যাডির। মরিয়া একটা ভাব ফুটে আছে চেহারায়, ভ্রূ কুঁচকে সারাক্ষণ কী যেন ভাবছেন; এখনও বোধহয় নিজের জগৎ পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি, গবেষণা আর আবিষ্কার অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে গেছেন।

তারপর মাসুদ রানা। অনেক আগেই থেকেই ওকে আর ভয় লাগছে না মনিকার। নার্ভাসনেসটা সবটুকুই দূর হয়েছে। ড্যাডির দেওয়া ব্যাখ্যাটা মনে আছে ওর, হুবহু না হলেও: দেশ আর দশের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে অনেক অপ্রীতিকর কাজও করতে হয় কিছু কিছু মানুষকে, তার ছাপ চেহারাতেও পড়তে পারে—ওর অন্তর্দৃষ্টি হয়তো সেটা দেখেই ভয় পেয়েছিল। তবে এখন জানে, সেটা অমূলক ভয়।

ড্যাডির ব্যাখ্যা মিথ্যে না-ও হতে পারে, কিন্তু ওটাই একমাত্র সত্য নয়। মনিকার নিজের উপলব্ধি হলো, বয়স হওয়ার পর থেকে যে আদর্শপুরুষের স্বপ্ন দেখে আসছে সে, তার সঙ্গে রানার মিল থাকতে পারে, এই প্রত্যাশা ওকে নার্ভাস করে তুলেছিল। তা ছাড়া, কেমিকেল রিয়্যাকশন বলেও একটা কথা আছে।

এই মুহূর্তে রানা যেন গোপন কোনও চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে, চোখ দুটো ঠাণ্ডা ও নিস্পৃহ, দৃষ্টি কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ। মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চেহারায় আরও কাঠিন্য এনে দিয়েছে, মনে হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন আর কর্কশ একজন মানুষ।

আমিও নিশ্চয় দৃষ্টিনন্দন কোনও ফ্রেমে বাঁধানো ছবি নই, ভাবল মনিকা। পাশ ফিরল ও। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ব্যথায় টনটন করে উঠল। ইস্, শাওয়ারের নীচে দাঁড়াতে পারলে কী খুশিই না হত সে! আর, প্রতিজ্ঞা করছে, খানিকটা পারফিউম ছাড়া জীবনে কখনও কোথাও বেরুবে না!

'খিদে পেয়েছে,' বলল ও।

ওর এই কথাটা বর্তমানে ফিরিয়ে আনল রানাকে। 'আমারও।' অতীতে ফিরে গিয়েছিল ও, পঁচিশ কি ছাব্বিশ মাস আগে, স্মরণ করছিল অস্টিনকে নিয়ে কী হয়েছিল নুমা হেডকোয়ার্টারে।

'ধুস্ শালা!' হিসহিস করে উঠল অস্টিন, সমস্ত কিছুর উপর খেপে আছে ও, নিষ্ফল আক্রোশে গ্লাভ পরা হাত দিয়ে ঘুসি মারছে বরফে।

রানা যেন হঠাৎ করেই লোকটার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে ছড়িয়ে পড়া অশুভ একটা মরিয়া ভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ওর বিপুল নার্ভাস এনার্জি কীভাবে যেন ভুল পথে এগোচ্ছে। খুবই আশঙ্কা আছে বিস্ফোরিত হওয়ার।

'কিছু একটা করতে হবে,' অকারণে গলা চড়াল অস্টিন। 'সেটা যা-ই হোক। এর কোনও মানে হয় না, বসে বসে কফি খাব আর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করব।' চোখে-মুখে কর্তৃত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলল। 'কী আশ্চর্য, তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকায় নিজেকে তোমার ক্লাউন মনে হচ্ছে না?' রানাকে লক্ষ করে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমার কথা শুনতে হবে সবাইকে। আমি যা বলব।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা রানার কাছে পরিষ্কার হলো। অস্টিন ওর বাড়ি আর স্কুল-কলেজে এমন ট্রেনিং পেয়েছে, যেটা ওকে যে-কোনও সংকটময় পরিস্থিতিতে কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করে, তা সে যত কঠিনই হোক। ওর ঐতিহ্য আর শিক্ষা ওকে শুধু সফল হতে শিখিয়েছে, আর সফল হতে হলে উদ্যোগী হয়ে নিজেকেই যা করবার করতে হবে, একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকতে হবে নিজের হাতে।

কিন্তু মুশকিল হলো, নেতৃত্ব দিয়ে ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কোনও গন্তব্যই দেখতে পাচ্ছে না অস্টিন। ফলে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পেরে অসহায় বোধ করছে ও।

সবার উপর চোখ বুলাল অস্টিন: বুড়ো প্রফেসর এই জগতেই নেই; বেশ্যা ছুঁড়িটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে; জুনো, বুড়োটার চেয়েও মোটা; আর রানা...

অস্টিনের মগজ সবকিছুর জন্য রানাকে দায়ী করছে। সব দোষ ওই এশিয়ানটার। তবে ওর ব্যবস্থা করা হবে। প্রাণ থাকতে ওকে ছাড়বে না সে। সময় হোক। ঠিকই একটা সুযোগ করে নেবে।

'ঠিক আছে,' অনুমোদন দেওয়ার সুরে বলল অস্টিন, 'পেটে কিছু দেয়ার আইডিয়াটা আমি সমর্থন করি।' বিদ্রূপাত্মক একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে।

ওদের কারও কোনও কথা শুনতে পাচ্ছেন না প্রফেসর মনসুর, ডুবে আছেন গভীর চিন্তায়। যে জিনিসটা তিনি আবিষ্কার করেছেন সেটার গুরুত্ব কতটুকু তা ওঁর চেয়ে ভাল কেউ জানে না। তিনি চান এই আবিষ্কার দুনিয়ার সব মানুষের উপকারে আসুক, তবে তার আগে ওটার পেটেন্ট পেতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে, যাতে স্বত্ব বিক্রি করে বিপুল ফরেন কারেন্সি ঘরে তুলতে পারে ওরা।

নিরাপত্তাজনিত কারণে শত্রু-মিত্র সবাইকে তিনি ধারণা দিয়েছেন, ওঁর আবিষ্কারের ফর্মুলা বারোয়, নুমার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে রয়ে গেছে। কথাটার মধ্যে আদৌ যদি কোনও সত্যতা থেকে থাকে, এক-আধ কণার বেশি নয়।

ফ্যাসিলিটির কমপিউটারে কিছু তথ্য আছে বটে, যেমন—ওঁর আবিষ্কার করা মেডিসিন কোথায় আর কীসে ব্যবহার করা যাবে বা যাবে না; বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষার ইতি ও নেতিবাচক ফলাফল ইত্যাদি। অর্থাৎ ওখানে এমন কোনও তথ্য নেই যার সাহায্যে ওঁর আবিষ্কার করা মহামূল্য মেডিসিন কেউ বানিয়ে ফেলতে পারবে।

এখন প্রশ্ন হলো, ফর্মুলাটা দেশে কীভাবে পাঠানো যায়? মাসুদ রানা ওটা নিতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ওর হাতে তুলে দিলেই যে জিনিসটা বাংলাদেশে পৌঁছাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ

রানা যেখানে আটকা পড়েছে, তিনিও সেখানে বন্দি। এই এক হাজার বর্গমাইল আকারের কয়েদখানায় বরফ আর পানি ছাড়া কিছু নেই। কেউ ওঁদেরকে উদ্ধার করতে রওনা হলেও, সময়মত তারা ওঁদেরকে খুঁজে পাবে কি না বলা মুশকিল।

কী করা উচিত সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে অস্থিরতা অনুভব করছেন প্রফেসর। ভাবলেন, যুক্তি কী বলে? দুজন একই জায়গায় বন্দি হলেও, দুজনের শক্তি-সামর্থ্য এক নয়, একজন অথর্ব, আরেকজন টগবগে তরুণ; প্রকৃতির সঙ্গে এই লড়াইটায় জেতার সম্ভাবনা তাঁর চেয়ে রানারই বেশি। কাজেই আপাতত এই সিদ্ধান্ত নিতে কোনও অসুবিধে নেই যে জিনিসটা তাঁর কাছে নয়, রানার কাছে থাকা উচিত, কারণ সবদিক থেকে সেটাই নিরাপদ।

তারপর ভয়ঙ্কর রাসায়নিক অস্ত্রটার কথা ভাবলেন তিনি। যে জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, যেভাবেই তা হয়ে থাকুক, খারাপ মানুষের হাতে পড়লে সেটার অপব্যবহার হবেই। কাজেই সেটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। তবে কবে কখন ওটাকে নষ্ট করে ফেলা হবে তা ঠিক করবে বাংলাদেশ সরকার। দুটো ফর্মুলা একই জায়গায় রেখেছেন তিনি, দুটোকে এখন আলাদা করা সম্ভবও নয়, কাজেই দুটোই রানার কাছে থাকবে।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে হালকা বোধ করছেন প্রফেসর। হঠাৎ যেন জরুরি কোনও কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, এরকম ভঙ্গিতে হনহন করে নিজের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছেন।

'ড্যাডি, কোথায় যাচ্ছ?' বাবার ভাব-ভঙ্গি দেখে সচকিত হয়ে উঠল মনিকা, একটা হাত বাড়িয়ে ওঁর কবজিটা ধরার চেষ্টা করল।

কোনও দিকে খেয়াল নেই প্রফেসারের, রীতিমত ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

প্রফেসর চলে যেতে মনিকার বাড়ানো হাতটা নেতিয়ে পড়ল, সেটা দেখতে পেয়ে চিন্তার রেখা ফুটল জুনোর কপালে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মনিকার দিকে এগোল ও, তবে ওর আগেই পৌঁছে

গেল রানা—মনিকার ঝুলে পড়া কাঁধে আশ্বস্তসূচক একটা হাত রাখল।

দুজন ধীর পায়ে নেটের দিকে এগোচ্ছে। ফায়ার-ট্রেটা সিধে করে বসাল ওরা, তারপর আগুন ধরাল। কাজের ফাঁকে চোরা চোখে তাঁবুগুলোর দিকে নজর রাখছে রানা। একটু পরেই দেখতে পেল প্রফেসরকে।

নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোক, চোরের মত এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর রানাকে অবাক করে দিয়ে ওর আর জুনোর তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন।

রানা ভাবল, কী ব্যাপার? দ্রুত চোখ বুলিয়ে চারদিকটা দেখে নিল ও। না, কেউ দেখছে না প্রফেসর কী করছেন।

মিনিট পাঁচেক পর তাঁবুটা থেকে বেরিয়ে এসে টয়লেটের দিকে এগোলেন প্রফেসর।

মনিকা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, ওকে সাহায্য করছে রানা।

এস্কিমো জুনো সোনালি সাগর দেখছে, ওর চোখের সামনে বারবার ফিরে আসছে নির্মম একটা দৃশ্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, কো-পাইলট হোমার নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর তার প্রসঙ্গে কেউ ওরা কোনও কথা বলেনি। সময় বা সুযোগ পেল কোথায়! তবে সবার মনেই যে দগদগে ক্ষতের মত হয়ে আছে সেই রোমহর্ষক, মর্মান্তিক দৃশ্য, তাতে ওর কোনও সন্দেহ নেই।

সেই থেকে একের পর এক এত কিছু ঘটেছে, হোমারের মৃত্যুটা কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে পাগল করা দৃশ্যটা এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও—পা দুটো প্রচুর পাতলা রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে, ঝাঁকি খাচ্ছে তখনও; যেন কোমরের কাছ থেকে করাত দিয়ে কেটে অর্ধেক করা হয়েছে হোমারকে। শুধু তাই নয়, প্রকাণ্ড সেই সাদা-কালো মাথা—কাটিং মেশিন—ফিরে আসছে ওদেরকে কাটবার জন্য।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে জুনোকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন প্রফেসর। নিঃশব্দে ওর পাশে এসে থামলেন তিনি, সাগরের উপর চোখ বুলাচ্ছেন। একটা সমস্যার সমাধান হয়েছে, সেজন্য খুশি তিনি; এতক্ষণে মনে পড়ল মেয়ে মনিকার বাড়ানো হাতটা অভব্যের মত সরিয়ে দিয়েছেন তিনি, এবং কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

'নিশ্চয়ই খুব খেপে আছে আমার ওপর,' বিড়বিড় করলেন প্রফেসর, তারপর জুনোকে অবাক করে দিয়ে ঘুরে তাঁবুগুলোর দিকে রওনা হলেন।

হাতের কাজ ফেলে তাকিয়ে থাকল মনিকা। 'ড্যাডি?' জিজ্ঞেস করল ও। 'তুমি সুস্থ বোধ করছ তো? নাকি কিছু হয়েছে?'

'হবে আবার কী, মেয়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে এলাম,' বললেন প্রফেসর। 'বুড়ো হলে এরকম ভুল-ভাল হয়েই থাকে, কিছু মনে করবি না।'

রান্না ছেড়ে উঠে পড়ল মনিকা, ড্যাডিকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে হাসছে।

মুখ তুলে তাকাল রানা। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নীরবে ইশারা করলেন প্রফেসর। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, রানার দৃষ্টি ওদের তাঁবুর দিকে ফেরাতে চাইছেন তিনি।

ড্যাডিকে ছেড়ে দিয়ে আবার রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল মনিকা। আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর সবাইকে খেতে ডাকল ও।

'কোথাও আরাম করে বসে খাই এসো,' বলল অস্টিন, কারও ইচ্ছে-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে প্লেট আর মগগুলো তুলে নিয়ে নিজের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

অগত্যা ওর পিছু নিতে হলো মনিকাকে। এই ফাঁকে দ্রুত পা চালিয়ে নিজেদের তাঁবুর দিকে রওনা হলো রানা। ভিতর ঢুকে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। চোখে পড়বার মত কিছু দেখছে না। তারপর হঠাৎ লক্ষ করল, ওর স্লিপিং-ব্যাগের চেইন অর্ধেকটা

খোলা।

মেঝেতে হাঁটু গাড়ল রানা, স্লিপিং-ব্যাগের ভিতরে হাত গলাল। আঙুলের ডগায় শক্ত কিছু ঠেকল। দু'আঙুলে সাবধানে ধরে বের করে আনল জিনিসটা। চকচকে ইস্পাতের কৌটা, মাথার দিকে ক্যাপ পরানো।

কান পাতল রানা। না, এদিকে কেউ আসছে না।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে কৌটার ক্যাপটা খুলল রানা, ভিতর থেকে ওর তালুতে টুপ করে খসে পড়ল ছোট্ট একটা নরম ক্যাপসুল, প্লাস্টিকে মোড়া, গায়ে মসুর ডাল আকৃতির একটা আঙটা আছে।

দেখতে হুবহু ক্যাপসুল হলেও, আসলে মাইক্রোফিল্ম-এর একটা রিল ওটা, চাপ দিলে বোঝা যায় ভিতরে সিমের দানা আকৃতির কিছু আছে। এ-ধরনের ক্যাপসুলে মোড়া মাইক্রোফিল্ম আগেও দেখেছে ও।

পাঁচ মিনিট পর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা, চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই খুশি না বেজার।

প্রথমে আইডিয়াটা ভাল বলেই মনে হলো, আরাম করে বসে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা হবে। কিন্তু ছোট্ট জায়গার ভিতর পাঁচজন মানুষ, রীতিমত আঁটসাঁট লাগছে; আর এরকম ভিড়ের মধ্যে আরাম করার আশা দুরাশা মাত্র। তা ছাড়া, স্বল্প পরিসরে শত্রুতার ভাব গোপন রাখাও বেশ কঠিন।

খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার আগেই ঘামতে শুরু করেছে ওরা। মানুষের শরীর 'টু-বার ইলেকট্রিক ফায়ার'-এর সমপরিমাণ তাপ ছড়ায়। দুজনের জায়গায় পাঁচজন রয়েছে ওরা, এটা একটা কারণ; তা ছাড়া, তাঁবুগুলো খুব বেশি মাত্রায় ইনসুলেটেড হওয়ায় দ্রুত গরম হয়ে উঠল।

সবার আগে নিজের ভারী পারকাটা খুলে ফেলল জুনো। নিঃশব্দে বাকি সবাইও। প্রফেসরের পাশে বসেছে রানা, মাঝেমধ্যে মাতৃভাষায় দু'একটা কথা বলছে ওঁর সঙ্গে। অস্টিন বসেছে

মনিকার কাছাকাছি। নড়েচড়ে উঠতে মেয়েটা সম্পর্কে হঠাৎ করে সচেতন হয়ে উঠল ও। ভারী ভেস্ট আর সাদার উপর লাল চেক শার্টের বোতাম আঁটো করে লাগানো সত্ত্বেও গোপন থাকছে না যে মনিকা ওর ছিঁড়ে যাওয়া ব্রেসিয়ার বদলাতে পারেনি।

স্থির হয়ে গেল অস্টিন, ভারী কাপড়চোপড়ের ভিতর মনিকার স্তন জোড়াকে নড়াচড়া করতে দেখে মুগ্ধ চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মনিকার চোখে ধরা না পড়া পর্যন্ত এরকম নির্লজ্জ দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকল ও।

মাস্ক আর গগলস খুলে তাঁবুর নরম ছায়ায় রেখে দিয়েছে ওরা, ফলে চোখাচোখি হলো ওদের। অস্টিন নিজের চোখ থেকে নোংরা লোভটুকু লুকিয়ে ফেলার সময় পেল না, আর মনিকার কঠোর দৃষ্টি ওকে যেন নখ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল।

নড়েচড়ে বসল অস্টিন, চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে; চোরা চোখে চট করে একবার রানাকেও দেখে নিল।

তাঁবুর আড়ষ্ট পরিবেশে উত্তেজনা সৃষ্টির আরেকটা উপাদান যোগ হয়েছে। অস্টিনের উপর ঠাণ্ডা নজর রেখে ড্যাডির একদিকের কাঁধে হেলান দিল মনিকা, নিতম্ব দুটো উঁচু করল, সিলসস্কিন ওভারট্রাউজার ঠেলে পায়ের পাতার উপর নামাল, তারপর লাথি মেরে ছুঁড়ে দিল দূরে।

'ফর গড'স সেক...' বিড়বিড় করল অস্টিন, চোখ দুটো সরিয়ে নিল। একটু একটু কাঁপছে ও।

খুব ভাল করে জানা আছে মনিকার কী চলছে অস্টিনের মনে। ব্যাপারটা ওকে খেপিয়ে তুলছে। ওকে কী মনে করে লোকটা? মেয়ে তো আর নিজের ইচ্ছেয় হয়নি ও। আর তা ছাড়া, গায়ে এত কাপড়চোপড় থাকার পর, ওকে পিন-আপ মেয়ে ভাবার কোনও কারণ নেই; অথচ ওই লোকের চোখ জোড়ায় এমন বিচ্ছিরি লোভ ফুটে উঠল, যেন দৃষ্টি দিয়েই ওর সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে নেবে। এর মধ্যে তো দেখা যাচ্ছে ভদ্রতার কোনও বালাই-ই নেই!

বাকি সবার উপর চোখ বুলাল মনিকা। রানার সঙ্গে বারোর রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আর নিজের গবেষণা নিয়ে আলাপ করছেন ড্যাডি। জুনো উবু হয়ে বসে দোল খাচ্ছে, আর গুনগুন করে এস্কিমোদের জনপ্রিয় একটা গান গাইছে:

বরফের গম্বুজে থাকি বারো মাস
দেখো কেমন ফিট
আমরা ইনিউইট
সিলমাছের তেল জ্বালি টানা ছয় মাস...

মেয়েটার দিকে আবার তাকাল অস্টিন। নিজের অজান্তেই চোখ নামিয়ে চেক করে নিল মনিকা বোতামগুলো লাগানো আছে কি না। কিন্তু তারপরেও অস্টিন চোখ সরাচ্ছে না দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর।

'মিস্টার অস্টিন,' শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে বলল মনিকা, তবে গলায় ছুরির মত ধার। 'দেখার মত আর কিছু যদি না পান, দয়া করে মাস্ক আর গগলস পরুন, আমি যাতে আপনার চোখ দুটো দেখতে না পাই।'

আঠারো

সবার দৃষ্টি অস্টিনের উপর গিয়ে পড়ল। এরকম পরিস্থিতিতে অন্য কেউ হলে ভাবত, ধরণী দ্বিধা হও! কিন্তু প্রথমে একটু বিব্রত হলেও, মনিকার উপর প্রচণ্ড রেগে গেল অস্টিন। সিধে হতে যাচ্ছে

ও, জুনোর পাঁজরে ধাক্কা খেল ওর হাঁটু, তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবে।

'আরে, তুমি পাগল নাকি?' বলল রানা, ওরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। 'বসো, ভদ্রতার পরিচয় দাও। ও মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সেটা ওর দোষ নয়; কিংবা ব্রেসিয়ার ছিঁড়ে যাওয়ায় ওর কোনও অপরাধ হয়নি।' হাত বাড়িয়ে অস্টিনের কবজি ধরতে গেল, জোর করে হলেও বসাবে।

'খবরদার, আমাকে তুমি ছোঁবে না!' গর্জে উঠল অস্টিন, রানার হাতটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল, পায়ের দুপদাপ শব্দ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তাঁবু থেকে। 'সাবধানে থেকো তুমি, রানা! শালা কুত্তার বাচ্চা, তোমাকে আমি ছাড়ব না...'

এক লাফে সিধে হয়েই পিছন থেকে অস্টিনের কাঁধ খামচে ধরল রানা, সবেগে ঘোরাল ওকে, তারপর প্রচণ্ড এক ঘুসি চালাল সরাসরি নাক বরাবর।

তৈরি হওয়ার সময় পেয়েছে অস্টিন, বাম হাতটা তুলে ঘুসিটা ঠেকাল, একই সঙ্গে ডান হাতের মুঠো প্রায় কবজি পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল রানার পেটে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা।

ঘুসিটা না লাগায়, পরমুহূর্তে রানাও ভাঁজ করা অপর হাতের কনুই চালিয়েছে অস্টিনের পাঁজর লক্ষ্য করে। চোখে অন্ধকার দেখছে অস্টিন।

ঢিব্!

সরাসরি তাঁবুর ঠিক তলায় ধাক্কা মারল তিমিটা, ওদের চেঁচামেচির আওয়াজই পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে ওটাকে। ঝাঁকি খেয়ে সটান শুয়ে পড়ল ওরা সবাই।

চড়াৎ!

প্রায় কোনও বিরতি না দিয়ে আবার হামলা করল তিমি, তাঁবুর নীচের বরফ ঠেলে যেন ফাটল ধরা একটা স্তূপ তৈরি করছে। প্রতিটি ধাক্কার সঙ্গে উঁচু হচ্ছে ক্যানভাসে মোড়া মেঝে। অপ্রত্যাশিত শক্তির প্রচণ্ডতা প্রথম দু'এক মুহূর্ত অসহায় করে তুলল

ওদেরকে। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল জুনো, সে-ই ফ্ল্যাপের সবচেয়ে কাছে রয়েছে। 'বেরোও সবাই! জলদি!' এক ঝটকায় খুলে ফেলল ফ্ল্যাপটা।

সামনে থেকে অস্টিনকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল রানা, তারপর প্রফেসরকে খোলা ফ্ল্যাপের দিকে ঠেলে দিল। ক্রল করে তাঁবু থেকে উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রানার ইঙ্গিতে ড্যাডির পিছু নিল মনিকা, খালি হাত স্ফটিক-স্বচ্ছ টুকরো বরফে ডুবে যাওয়ার সময় মুড়মুড় করে শব্দ উঠল।

কিছু বলবার জন্য ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছে মনিকা, কিন্তু কাঁধের ধাক্কায় ওকে একপাশে সরিয়ে দিল জুনো—হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে সে-ও।

সিধে হয়ে তাল সামলাতে চেষ্টা করছে মনিকা, হোঁচট খেয়ে দু'এক পা এগোল। শান্ত বাতাস ভেস্ট আর শার্ট ভেদ করে ভিতরে ঢুকতেই মনে হলো ঠাণ্ডায় জমে যাবে। 'মিস্টার জুনো,' হিহি করতে করতে বলল ও, 'গ্লাভ, জ্যাকেট...'

'হ্যাঁ...' ঘুরল জুনো, হাঁটু আর কনুই এখনও বরফে। তাঁবু থেকে রানাকে বেরুতে দেখে গলা চড়িয়ে বলল, 'দোস্ত, কাপড়গুলো!'

'যাহ্!' থামল রানা, শরীরের অর্ধেকটা এখনও তাঁবুর ভিতরে। ঘুরে আবার ঢুকল ও।

ঢিব্!

তাঁবুর ভিতর রানা ঢুকছে, এই সময় কিলার ওয়েইলের প্রকাণ্ড মাথার ধাক্কা খেয়ে মেঝেটা আবার উপর দিকে লাফিয়ে উঠল। শূন্যে উঠে পড়ল অস্টিনের শরীর, পড়বার সময় রানার চওড়া কাঁধে ধাক্কা খেল।

'ও হে, কাপড়গুলো! জলদি!' কাঁধটা ডলছে রানা।

ভাঙা বরফ ডেবে যেতে শুরু করল, ওদেরকে নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে তাঁবুর মেঝে। খুনি তিমি আর ওদের মাঝখানে শুধু সিকি

ইঞ্চি পুরু ক্যানভাস।

অস্টিনের উপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা। এরকম ভয় পেতে আগে কখনও দেখেনি কাউকে। আতঙ্কে যন্ত্রণাকাতর পিশাচের মত লাগছে ওকে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, ঠোঁট মুখের ভিতর দিকে ভাঁজ হয়ে আছে, চামড়া ধবধবে সাদা, কণ্ঠাটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

'অস্টিন,' তাগাদার সুরে আবার বলল রানা। 'কাপড়... আমরা সবাই জমে যাব!'

এত আতঙ্কের মধ্যেও অস্টিন বুঝতে পারছে কী করতে হবে ওকে। চোখ নামাতে এলোমেলো হয়ে থাকা গরম কাপড়গুলো দেখতে পেল। 'ঠিক আছে,' হাঁপিয়ে উঠে বলল ও, আতঙ্কের টুঁটি টিপে ধরেছে। রানা কি শুনতে পেয়েছে কথাটা? বুঝেছে এ-ধরনের ঘোর বিপদেও কী রকম শান্ত থাকতে পারে সে? নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করছে, এই সময় হঠাৎ আচ্ছন্ন বোধ করল।

ক্বড়াৎ!

মেঝেটা উঠে এসে ধাম করে বাড়ি মারল অস্টিনের মুখ আর বুকে, আবার শূন্যে তুলে ফেলল ওকে। খসে পড়ল, ওর ওজনে ডেবে গেল ক্যানভাস, বুননের ভিতর দিয়ে পানি ঢুকছে।

তাঁবুর তলায় জমে ওঠা পানির মধ্যে লাফ-ঝাঁপ দিয়ে জিনিসগুলো সংগ্রহ করতে হচ্ছে অস্টিনকে। তারপর রানার হাতে একে একে ধরিয়ে দিচ্ছে উলেন হাতমোজা, চামড়ার গ্লাভ, পারকা, ট্রাউজার, স্লিপিং-ব্যাগ, ফেস-মাস্ক, কম্বল ইত্যাদি। পরনে সিলস্কিনের ট্রাউজার থাকায় পানি খুব কমই ওর শরীরে লাগছে। এমনকী তিমিটা আবার হামলা করবার আগে মনিকার গগলসও রানার হাতে তুলে দিল ও।

প্রতিটি আইটেম তাঁবুর বাইরে বরফের উপর ছুঁড়ে দিল রানা। ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মনিকা আর প্রফেসরের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে জুনো।

'আর কিছু নেই,' হাঁপিয়ে উঠে বলল অস্টিন, ডেবে থাকা ক্যানভাস থেকে উঠে আসছে। দরজার লেভেল থেকে মেঝেটা এখন তিন ফুট নীচে। অস্টিন একটা পা তুলেছে, ঝুঁকে ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রানা। এক পা সামনে এগোল অস্টিন, ওর ওজনের ভার বেশি হয়ে যাওয়ায় বরফের কিনারার কাছে ছিঁড়তে শুরু করল ক্যানভাস।

'অস্টিন!' ঝট করে হাতটা আরও একটু বাড়াল রানা। সবুজ ক্যানভাস হঠাৎ দু'ফুট ছিঁড়ে গেল, অনুভব করল মেঝেটা ওর নীচে ডেবে যাচ্ছে। 'উঠে এসো!'

বরফের গর্ত থেকে চোখ তুলল অস্টিন, নিজের হাতটা বাড়াল এতক্ষণে, সামনে এগোল এক পা। মেঝের ক্যানভাস আরও দু'ফুট ছিঁড়ল।

দুটো হাত এক হলো। শরীরটাকে তাঁবুর বাইরে সবেগে আধ পাক গড়িয়ে দিল রানা, হ্যাঁচকা টানে বের করে আনছে অস্টিনকে।

অস্টিনের পেট বরফে সেঁটে আছে, পা দুটো গর্তের উপর ঝুলছে। কল্পনার চোখে দেখতে পেল কিলার ওয়েইলটা উঠে এসে ওর পা দুটো কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও কীভাবে যেন আতঙ্কটাকে দূরে সরিয়ে রাখল ও।

রানার মুঠো এখনও ওর কবজিটা লোহার মত শক্ত করে ধরে আছে। এখন ওদের বাহু পুরোপুরি লম্বা করা। ঘোঁত্ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে টান দিল রানা, অস্টিনকে বের করে আনল তাঁবুর ভিতর থেকে।

ঠিক ওই সময়, বুক কাঁপানো গর্জনের সঙ্গে, অস্টিনের পা যেইমাত্র গর্তের উপর থেকে সরে এসেছে, তিমির মাথা গোটা তাঁবু ভরাট করে ফেলল। রিইনফোর্সড ক্যানভাসে টান পড়ায় ইল্যাস্টিকের মত বাড়ল সেটা, তারপর ছিঁড়তে শুরু করল—পাঁচ ফুট, দশ ফুট।

হোঁচট খেতে খেতে নেট বরাবর এগোচ্ছে ওরা দুজন। তাঁবু

ঝাঁকি খাচ্ছে, ফুলে উঠছে, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

'রাইফেল!' বলল রানা। খিঁচে ছুটল জুনো। ওর পিছু নিল অস্টিন।

তাঁবু ছিটকে পড়ল একপাশে, উন্মুক্ত হলো বিশাল সাদা-কালো চকচকে মাথার চাঁদি, মুখে কোনও দাগ নেই, দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। বয়স কম, তরুণ। ওদের দিকে তাকাল, নিচু হলো একটু।

'জলদি!' ধমকে উঠল রানা।

সাপ্লাই তাঁবুর ওদিক থেকে গর্জে উঠল রেমিংটন। তিমিটার মাথার একপাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পিছলে সামনের দিকে চলে এল ওটা, নেটে আটকাল, সশব্দে বন্ধ করল চোয়াল। আবার গর্জে উঠল রেমিংটন। এবার চাঁদির কাছে লাগল ভারী বুলেট, সংঘর্ষের ফলে চ্যাপ্টা হয়ে গেল, মোটা খুলিতে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল আরেকদিকে।

পিছু হটে গর্তের ভিতর ঢুকে গেল তিমি, কালো পানিতে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ওদের নীচ থেকে উঠে আসা তিমিটার মৃদু গোঙানি শুনছে। তাঁবুর জায়গায় এখন শুধু বড় একটা গর্ত রয়েছে, ওদের চোখের সামনে জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে গর্তের পানি।

'ওটা আর ফিরে আসবে না,' বলল জুনো, হাতের রাইফেল নামিয়ে নিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মনিকা, তিক্তস্বরে বলল, 'একটা তাঁবু হারিয়েছি আমরা, প্রাণেও সবাই মারা যেতে বসেছিলাম, শুধু এই কারণে যে আপনারা দুজন...' ঝট করে ওদের দিকে ঘাড় ফেরাল ও, চোখ দুটো যেন জ্বলছে। 'ব্যক্তিগত বিরোধ ভুলে থাকুন দয়া করে। জমিনে না ফেরা পর্যন্ত। তারপর যা খুশি করবেন, কারও কিছু বলার থাকবে না।'

রানার ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত দৃষ্টি অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় চোখ ঘুরিয়ে অস্টিনের দিকে তাকাল মনিকা। তার অবস্থা ভীতিকর; হিংস্র একটা হায়েনার মত লাগছে অস্টিনকে—নীরব হাসিটায় শ্লেষ ঝরে পড়ছে, চোখ থেকে ঘৃণার ভাব গোপন করতে পারছে না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ঘুরল মনিকা; নিজের জ্যাকেট, ট্রাউজার আর গগলস তুলে নিয়ে ড্যাডির তাঁবুর দিকে রওনা হলো। বাকিরা পিছু নিল ওর।

মনিকার হাঁটাটা ভারি সুন্দর, আরও লোভনীয় ওটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুরু নিতম্বের ঝাঁকি খাওয়া; অস্টিনের চোখে ঘৃণার বদলে নোংরা লালসা ফিরে এল; সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না ও।

তারপর রানার উপর চোখ পড়ল, লম্বা পা ফেলে ওকে পাশ কাটাচ্ছে, তাকিয়ে আছে ওরই দিকে।

প্রচণ্ড ঘৃণায় অসুস্থ বোধ করল অস্টিন। তারপর ওর চোখ পড়ল বরফের উপর পড়ে থাকা নিজের কোট, পারকা, ট্রাউজার, গ্লাভ আর স্লিপিং-ব্যাগের দিকে।

গর্ব অনুভব করল অস্টিন। এই জিনিসগুলো বাঁচিয়েছে ও। উদ্ধার করেছে। একা শুধু নিজের নয়, সবার, এমনকী রানারও। মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল মনটা, গুনগুন করে একটা গান ধরে ওদের পিছু নিল অস্টিন।

মনিকাদের তাঁবুতে আবার বসল ওরা, কেউ কোনও কথা বলছে না। নীরবতা ভাঙল মনিকা।

'ওকে,' বলল ও। 'ব্যাপারটার মীমাংসা হওয়া দরকার। রানা, কী হয়েছিল বলুন আপনি।'

'এটা তোমার কোনও বিষয় নয়,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল অস্টিন। 'তা ছাড়া, রানাকে জিজ্ঞেস করলে ও নিজের মত করে বলবে...'

'ঠিক আছে, বলতে দিন ওঁকে; আপনাকেও সুযোগ দেয়া হবে,

তখন আপনিও নিজের মত করে বলবেন।'

'না!' চেহারায় গোঁয়ার্তুমি, মনিকার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে অস্টিন। 'এটা তৃতীয়পক্ষের কোনও ব্যাপার নয়, আমার আর রানার ব্যাপার, আমরাই যে যেমন পারি এর একটা বিহিত করব।'

'আর তা করতে গিয়ে দুজনের একজন খুনও হয়ে যেতে পারেন, তাই না? আমাদেরকে নিয়ে?'

'রানাকে আমার সঙ্গে লাগতে মানা করে দাও, তা হলেই আপাতত কোনও ঝামেলা হবে না,' বলল অস্টিন।

'রানা? না তো! বরং আপনিই ওর পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধাচ্ছেন, আমরা সবাই সাক্ষী...'

'অ, এরইমধ্যে পক্ষ নিয়ে ফেলেছ! বেশ, বেশ, ভাল কথা!' দাঁড়াল অস্টিন, মনিকার তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'তবে তোমাদের দুজনকেই বলছি, আমার সঙ্গে লাগতে না এলেই ভাল করবে। এই যে আমার বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছ, এর পরিণতি কিন্তু সত্যি ভাল হবে না।'

'চুপ করুন, মিস্টার অস্টিন,' বলল মনিকা। 'আমরা সবার ভাল চাইছি, চাইছি আপনাদের ঝগড়াটা মিটিয়ে দিতে। দয়া করে বসুন।'

কিন্তু কথাটা কানে না তুলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল অস্টিন।

রানার দিকে তাকাল মনিকা। 'আপনি শুরু করুন, প্লিজ।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে কী হয়েছিল ওদেরকে বলল রানা।

ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি-র হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওর চেম্বারে বসে কাজ করছে।

নুমার একটা রোমাঞ্চকর এক্সপিডিশন থেকে সবে মাত্র ফিরেছে ওরা। দুর্লভ লতা-গুল্মের খোঁজে অ্যামাযন নদী ধরে

কয়েকশ' বর্গমাইল রেইন ফরেস্ট চষে বেড়িয়েছে পাঁচজনের দলটা, যে-যার অফিস রুমে বসে সেই শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের রিপোর্টই এই মুহূর্তে লিখছে সবাই।

নিজের চেম্বারে একা বসে মূল রিপোর্টটা লিখতে হচ্ছে রানাকে। বাকি চারজনের রিপোর্ট পড়বে ও, সেগুলোর সার-সংক্ষেপ যোগ করবে নিজের রিপোর্টে, তারপর কাল ফার্স্ট আওয়ারেই নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছে জমা দেবে।

প্রথমে ডট জুনো ওর রিপোর্ট দিতে এল, বলে গেল এত রাতে আর বাড়ি না ফিরে অফিসের ডেস্কে শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করবে ও।

তারপর এল লিলি বনিটা, নুমার নতুন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। লিলির আরেকটা পরিচয়, নুমার প্রশাসনিক বিভাগের জুনিয়ার পাবলিক রিলেশন্স অফিসার লোনা বনিটার ছোট বোন ও।

লিলি ঢোকার পরেই এল জন অস্টিন, নুমার অন্যতম ক্যাম্প ম্যানেজার। ওদের রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছে রানা, কে কী বলছে শোনার ইচ্ছে না থাকলেও কানে ঢুকছে কথাগুলো।

'লোনা ফোন করে জেনে নিল কোথায় আছি আমরা, কথা দিল নিতে আসছে, অথচ এল না,' বলল অস্টিন।

অস্টিনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী লোনা, দুজন লিভ-টুগেদার করে, শোনা যাচ্ছে আগামী মাসে বিয়ে করবে ওরা।

'কল করে পাচ্ছি না ওকে,' বলল লিলি। 'মোবাইলটা বোধহয় অফ করে রেখেছে।'

'সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই, ভাবছি অফিসেই রাতটা কাটিয়ে দেব,' বলল অস্টিন। 'লিলি, তুমিও তোমার অফিসে থাকো, নাকি?'

লিলি কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল, রিপোর্টে মুখ ঢাকা থাকায় তা দেখতে পেল না রানা।

ওরা চলে যাওয়ার পর সর্বশেষ রিপোর্টটা দিয়ে গেল ওর

আরেক বন্ধু ববি মুরল্যান্ড।

ওদের রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ নিজের রিপোর্টে যোগ করল রানা, তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে, দরজায় তালা দিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে। গ্যারেজে নামবে ও, গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যাবে নিজের ফ্ল্যাটে।

তিনটে বাঁক নেওয়ার পর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পাশের সরু প্যাসেজ থেকে নারীকণ্ঠের ঝাঁঝাল সুর শুনতে পাচ্ছেঃ 'ইতর, অসভ্য, চরিত্রহীন! ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে! আমি...আমি কিন্তু চিৎকার করব...'

নুমা হেডকোয়ার্টারে এ-ধরনের একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, এটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। যাই হোক, নিজের পথে চলে যেতে ইচ্ছে হলেও বিবেক বাধা দেওয়ায় পারছে না রানাঃ মেয়েটার সাহায্য দরকার হতে পারে।

কী হচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মেয়েলি গলার আওয়াজটা নিঃসন্দেহে লিলির। আর ছোট্ট প্যাসেজের শেষ মাথার যে কামরা থেকে ওর চিৎকার ভেসে আসছে ক্যাম্প ম্যানেজার অস্টিনের অফিস। রানার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য হলেও, লিলিকে একা আর অসহায় পেয়ে অন্যায় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে অস্টিন। কিন্তু লিলি নিজের চরিত্র আর বোন লোনার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে রাজি নয়।

তারপর আর চিন্তা করবার সময় পাওয়া গেল না। লিলির চাপা আর্তনাদ শোনা গেল, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' পরমুহূর্তে ফার্নিচার কাত হয়ে পড়বার আওয়াজ ভেসে এল। ছুটে সরু প্যাসেজটা পার হলো রানা, অস্টিনের অফিস-কামরায় ঘুসি মারল। 'এই, দরজা খোলো, অস্টিন! তোমার এত বড় স্পর্ধা...'

লিলির চিৎকার থেমে গেল। আর কোনও ফার্নিচার উল্টে পড়ছে না। শুধু খুট করে একটা আওয়াজের সঙ্গে কামরার আলোটা জ্বলল, চৌকাঠের নীচের ফাটল দিয়ে খানিকটা আভা বেরুল।

এতক্ষণ তা হলে অন্ধকারে লিলির উপর অত্যাচার চলছিল।

আবার ডাকল রানা, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না অস্টিন। অনেকক্ষণ হলো কামরার ভিতর থেকে আর কোনও আওয়াজ ভেসে আসছে না।

রানা নড়ছে না। খানিক পরপর ডাকছে ওদেরকে।

অবশেষে, প্রায় সাত মিনিট পর, দরজা খুলল অস্টিন। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, যেন কাঁচা ঘুম ভাঙানো হয়েছে ওর। দরজাটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, রানা যাতে সহজে ভিতরে ঢুকতে না পারে। 'তুমি, রানা? কী চাও, প্লিজ?'

উঁকি দিয়ে কামরার ভিতর তাকাল রানা, দেখল একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে লিলি; স্কার্ট আর ব্লাউজ, দুটোই কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

'লিলির চিৎকার শুনে এলাম,' বলল রানা। 'পথ ছাড়ো, ও সুস্থ আছে কি না দেখব।'

'লিলির চিৎকার?' অস্টিন যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'কই, না!' হঠাৎ হাসল সে। 'এই, লিলি, তুমি কি চেঁচামেচি করেছ, ঘুমের মধ্যে?'

আবার উঁকি দিল রানা। লিলিকে মাথা নাড়তে দেখল, বলতে শুনল, 'কই, না তো!' চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে হেঁটে আসছে ও। একপাশে সরে দাঁড়াল অস্টিন।

ওকে আর রানাকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, চোখের পানিতে গালটা ভিজে আছে।

'লিলি, কোনও ভয় নেই তোমার,' সন্ত্রস্ত মেয়েটাকে অভয় দিয়ে বলল রানা। 'আমাকে তুমি নির্ভয়ে বলতে পার কী হয়েছে।'

রানার চোখের দিকে তাকালই না লিলি, আরেকবার শুধু মাথা নাড়ল, তারপর দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেল প্যাসেজ থেকে।

'তুমি এখনও কী মনে করে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ, রানা?' লিলি চলে যাওয়ার পর ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল

অস্টিন।

'কাজটা তুমি ভাল করোনি, অস্টিন,' শান্তসুরেই বলল রানা।

ওর আরও বলতে ইচ্ছে করল—কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সারা দুনিয়া থেকে সেরা মেধাবিদের ডেকে এনে এখানে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন; যে যে-কাজই করুক, সেটাকে তিনি প্রার্থনা বলেন, কারণ ওই কাজটা শুধু আমেরিকার নয়, গোটা মানবজাতির উপকারে আসবে।

তবে এত কথা বলবার ধৈর্য বা রুচি কিছুই হলো না ওর, শুধু বলল, 'যে কারণে কোনও অভিযোগ না করে চলে গেল লিলি, সেই একই কারণে মুখ বুজে থাকব আমিও। তবে এরকম যেন আর কখনও না ঘটে।'

ঘুরল রানা, কিন্তু পা বাড়াবার আগেই দেখল চোখ-মুখে ব্যাকুল ভাব নিয়ে করিডর থেকে প্যাসেজে ঢুকছে লোনা বনিটা।

রানা ও অস্টিন, দুজনকেই জিজ্ঞেস করল ও। 'কী হয়েছে? লিলি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল কেন? ওর কাপড়চোপড়...'

কথা না বলে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে রানা, দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোনা। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে ডাকল, 'মিস্টার রানা, সার?'

দাঁড়াল রানা, ঘুরল।

'আপনি আমাকে বলবেন, সার, কী হয়েছে এখানে, প্লিজ?' ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল লোনা।

'ভেতরে এসো, ডার্লিং, সব আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলছি,' বলল অস্টিন, রানার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের নীরব ভাষায় মিনতি জানাচ্ছে—আমার সর্বনাশ করো না, প্লিজ!

'আপনি বরং লিলিকে প্রশ্ন করে জেনে নেবেন কী হয়েছে,' লোনাকে বলল রানা, তারপর আর ওখানে দাঁড়াল না, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল প্যাসেজ থেকে।

গ্যারেজে নেমে এসে নিজের গাড়িতে উঠল রানা। স্টার্ট দিচ্ছে,

এই সময় এলিভেটর থেকে নেমে এল লোনা। ওর গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল, বলল, 'আমাকে একটা লিফট দেয়া যায়, প্লিজ, সার?'

কথা না বলে গাড়ির দরজা খুলে দিল রানা, ওর পাশে উঠে বসল লোনা। ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে এল গাড়ি। নিজের ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানাল লোনা, তারপর বলল, 'না আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে, না পৌঁছাতে দেরি হয়!' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তা হলে হয়তো ব্যাপারটা ঘটত না।'

রানা চুপ করে থাকল। সারাটা পথ লোনাও আর মুখ খুলল না। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময় শুধু একটা ধন্যবাদ দিল।

পরদিন অনেক বেলা করে নুমা হেডকোয়ার্টারে এসে রানা শুনল, দুই বোন একই ফ্ল্যাটে থাকলেও, কাল রাতে লিলি সেখানে যায়নি, জানা গেছে হোটেলে উঠেছিল। আজ সকালে অফিসে এসে নুমার চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে চলে গেছে সে। চাকরি ছাড়ার কারণ হিসাবে জানিয়েছে, ব্যক্তিগত সমস্যা।

নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন প্রশ্ন করায় সব কথা খুলে বলেছে রানা, তবে সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছে—লোনাকে এ-সব না জানানোই ভাল, বিশেষ করে ওর বোন লিলি যখন সেটাই চাইছে।

অস্টিনের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেনি লোনাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিন্ন করল ও, পরিষ্কার জানিয়ে দিল ওরা আর লিভ-টুগেদার করবে না, ওদের বিয়েটাও হচ্ছে না।

সেই থেকে রানার উপর খেপে আছে অস্টিন। লোকমুখে শুনেছে রানা, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য শুধু শুধু ওকে দায়ী করছে সে, প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে বলছে ওকে দেখে নেবে সে।

মাসখানেক পর এক পার্টিতে একটা সিন ক্রিয়েট করল অস্টিন। অনেক লোকের সামনে রানার দিকে হাত তুলল সে, বলল, 'ওই যে, আমার প্রাণের দু· ·মন। আমি একদিন প্রমাণ করব,

ওর জন্মের ঠিক নেই।'

শুনতে পেয়ে ওর দিকে এগোচ্ছে রানা, ছুটে এসে ওকে টেনে আরেকদিকে সরিয়ে নিয়ে গেল জুনো। তারপর সোজা অস্টিনের কাছে ফিরে গিয়ে এক ঘুসিতে চ্যাপ্টা করে দিল ওর নাকটা।

এর কিছুদিন পর হেডকোয়ার্টার থেকে বদলি করা হলো অস্টিনকে। কোথায়, এতদিন ওরা তা জানত না, জানল আলাস্কায় আসবার পর।

উনিশ

রানার কথা শেষ হলো। নড়েচড়ে বসল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে কেউ কোনও মন্তব্য করল না। সবাই বুঝতে পারছে, রানাকে শত্রু বলে মনে করাটা অস্টিনের একটা কঠিন রোগে পরিণত হয়েছে, সাইকিয়াট্রিস্টের চিকিৎসা ছাড়া সারবে না।

তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা, দেখতে যাচ্ছে কী করছে অস্টিন, নীরবতা ভেঙে মনিকা বলল, 'মিস্টার অস্টিনকে এ-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল, শুধু শুধু খোঁচানো হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা। বেরিয়েই চোখ কোঁচকাল, ফেস-মাস্ক আর গগলস নিয়ে আসেনি বলে তিরস্কার করল নিজেকে। তারপর উপলব্ধি করল, ওগুলো আসলে দরকার নেই ওর, কারণ সূর্যের প্রখরতা ইতিমধ্যে অনেক কমে গেছে।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্টিন, হাঁ করে দূরে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও তাকাল।

হঠাৎ করে সমস্ত সোনালি রঙ উধাও হয়ে গেছে, তার বদলে

ওদের চারধারে যেন ঢেলে দেওয়া হয়েছে অঢেল রক্ত। সাগর, ফ্লো আর বরফ গভীর গাঢ় লাল হয়ে আছে, কোথাও কোথাও বদলে গিয়ে ওই লালই অন্য রকম চেহারা পাচ্ছে—যত রকমের শেড সম্ভব।

চোখ তুলে সূর্যের দিকে তাকাল রানা। আকাশের নীচের দিকে বড় একটা নিষ্প্রভ কমলা হয়ে ঝুলে আছে। আর দক্ষিণের আকাশ মোটেও নীল নয় এখন, খাকি-খয়েরি; যেখানে দিগন্ত থাকবার কথা সেখানটা হয়ে আছে নিকোটিন-ব্রাউন। এতক্ষণে রানা বুঝল জিনিসটা কী—ফগব্যাংক।

রানার মাথার ভিতর ঝড় উঠল। এরকম উঁচু, এত নিরেট আর এমন পরিষ্কার আকৃতি নিয়ে কুয়াশার স্তর তৈরি হওয়ার পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে—উষ্ণ স্রোত। ওই স্রোতের সারফেস বাষ্প হয়ে হিম বাতাসে জমা হচ্ছে। গরম একটা স্রোত না হয়েই যায় না।

প্রায় চোখের পলকে বদলে গেল পরিবেশ। দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, নীরব সাদা পাঁচিলের উপর চোখ, এক নিমেষে ওটা ওদেরকে ঢেকে ফেলল।

তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলে মাথা বের করল জুনো। স্থির হয়ে গেল ও, চারদিকে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে ক্রল করে বেরিয়ে এল। 'খারাপ লক্ষণ,' বিড়বিড় করে বলল।

'কী জানি...'

রহস্যময় নাচের মধ্যে পাক খাচ্ছে কুয়াশা; গাঢ় হচ্ছে, পাতলা হচ্ছে, ওদের চারদিকে আরও নিশ্ছিদ্র পাহাড় তুলে দিচ্ছে। বাকি সবাই বেরিয়ে এসে তাকিয়ে থাকল, হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে কয়েক হাজার বর্গমাইল জুড়ে সাগর আর বরফের যে বিশাল জগতে ছিল ওরা, সেটা ছোট হতে হতে কয়েক বর্গগজে ঠেকেছে।

অবচেতন মনের তাগাদায় সবাই ওরা সরে এসে এক জায়গায়

জড়ো হলো, রানার চারপাশে; যেন আগের চেয়ে ওদের জায়গা কমে গেছে। অস্টিন দাঁড়াল ওর একেবারে গা ঘেঁষে। আরও দু'এক মুহূর্ত পর ওদের গায়ে পানির ফোঁটা জমতে শুরু করল।

'আমাদের কিছু করার নেই,' বলল জুনো, গলার আওয়াজ এত খসখসে যে কোনও রকমে চেনা গেল।

'কিন্তু শালার বরফ তো এবার গলতে শুরু করবে,' কর্কশ সুরে বলল অস্টিন, যেন কারও সঙ্গে ঝগড়া করছে। সবাই তাকাল ওর দিকে—উন্মত্ত দেখাচ্ছে ওকে, সেই সঙ্গে দিশেহারা।

কাঁধ ঝাঁকাল জুনো, নিজের কথাটাই রিপিট করল, 'আমাদের কিছু করার নেই।'

'বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আমরা হয়তো সাঁতরাতে পারব,' বলল মনিকা, মুখে আড়ষ্ট হাসি।

'একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল অস্টিন। 'আরে, তার আগে ভাসতে ভাসতে শেটল্যান্ড দ্বীপে পৌঁছে যাব আমরা!'

সবাইকে থামার নির্দেশ দিল রানা। বলল, এনার্জি নষ্ট না করে লম্বা ঘুম দাও, তারপর দেখা যাবে কী করা হবে।

কেউ কারও চেয়ে কম ক্লান্ত নয়, সবাই ঘুমাতে চলে গেল। একটা তাঁবুতে ড্যাডিকে নিয়ে ঢুকল মনিকা, আরেকটায় অস্টিন আর জুনোকে নিয়ে রানা।

স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকে ঘুমাবার চেষ্টা করছে জুনো, শুনতে পেল একটা কিলার গান ধরেছে। আসলে নিজের দলকে ডাকছে ওটা। অনেকক্ষণ ধরেই ডাকল, তবে কোনও সাড়া পেল না। একসময় থেমে গেল গানটা।

খানিক পর, আরও অনেক দূর থেকে, আরেকটা কিলার সাড়া দিল।

তাঁবুর ফ্ল্যাপে আঁচড়ানোর আওয়াজ।

'ইয়েস?' প্রশ্ন করল অস্টিন, এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে।

তাঁবুর ভিতর মাথা ঢোকাল মনিকা। 'ব্রেকফাস্ট?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ওহ্, দারুণ! ধন্যবাদ। এই, শোনো, কাল খারাপ ব্যবহার করেছি, সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।' স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসছে অস্টিন। 'ব্রেকফাস্ট মানে নিশ্চয় সেদ্ধ মটরশুঁটি, ডিম পোচ, মাখন লাগানো পাউরুটি, পরিজ, সসেজ, পনির, জেলি, টোস্ট আর কফি?'

'কফি ম্যানেজ করা গেছে। বাকি সব আপনি ম্যানেজ করে নিন। ও-সব সাপ্লাই তাঁবুতে আছে কোথাও।'

'যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি,' হাসিমুখে বলল অস্টিন। 'কোথায় কী রাখা হয়েছে আমি খুব ভাল জানি।'

'গুড,' বলল মনিকা। লম্বা-চওড়া লোকটাকে হাসিখুশি দেখে একটু বিস্মিত হলেও, স্বস্তি বোধ করছে ও।

কেন যে খুশি, অস্টিন নিজেও বোধহয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কাপড়চোপড় পরছে ও।

'কনুইটা সামলে রাখো,' হঠাৎ ধমকে উঠল রানা, এখনও আধো ঘুমে।

এই মাত্র ঘুম ভাঙল জুনোর, মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে। ওরা কেউ খেয়াল করল না, তাঁবু থেকে বাইরের কুয়াশায় বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও হাসছে অস্টিন।

কিছুক্ষণ পর, সবার শেষে, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল আগের মতই ওদের চারধারে নিরেটদর্শন পাহাড় হয়ে আছে কুয়াশা।

মনিকা আর জুনো ফায়ার-ট্রের কাছে বসে রয়েছে। প্রফেসর মনসুর আর অস্টিনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল মনিকা। আন্তরিক, উষ্ণ হাসি; রানার ঠোঁট থেকে নীরব জবাব আদায় করে নিল।

মাংস, মসলা আর কফির গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। সব মিলিয়ে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল রানার মনে। পিপ্-পিপ্ করে উঠতে হাতঘড়িটা চোখের সামনে তুলল ও, খুদে একটা বোতাম টিপে অ্যালার্ম বন্ধ করল।

অ্যালার্মটা রানাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, অনেকক্ষণ হলো রিখটার স্কেল-এর খুদে সংস্করণটা অন করে রাখা হয়েছে।

ফ্লো আক্রান্ত হলে ওর যাতে ঘুম ভেঙে যায়, সেজন্যই সেটটা অন করে রেখেছিল রানা। ওদের ফ্লো শুধুমাত্র ঝাঁকি খেলে একটানা অ্যালার্ম বাজত। এরকম আরও কিছু গোপন যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র আছে ওর কাছে।

'মর্নিং,' বলল রানা।

'মর্নিং,' জবাব দিল মনিকা, আবার হাসল।

'ওরা কোথায়—আপনার ড্যাডি আর অস্টিন?'

'ওদিকে কোথাও গেছেন।' কুয়াশার দিকে একটা হাত তুলল মনিকা।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, তাকাল জুনোর দিকে।

কাঁধ ঝাঁকাল জুনো, তারপর একটু রাগের সঙ্গেই বলল, 'আমি কেন বাধা দেব? তুমি আমাকে বলে রেখেছিলে, ওদেরকে কোথাও যেতে দেখলে বাধা দিতে হবে?'

'তা কেন বলতে যাব?' অবাক হলো রানা।

'বলা উচিত,' বলল জুনো। 'অস্টিনকে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না।'

চোখ-মুখই বলে দিচ্ছে জুনোর সঙ্গে একমত হতে পারছে না রানা। 'যেখানেই যাক, ওরা সাবধান থাকলেই হয়,' বলল ও। 'ওদিকটা কেমন কে জানে।'

'ড্যাডিই যেতে চাইলেন,' বলল মনিকা। 'প্রথমে উৎসাহ না দেখালেও, পরে সঙ্গে যেতে রাজি হলেন মিস্টার অস্টিন। ড্যাডি কুড়ালটাও নিয়ে গেছেন।'

'সে কী,' বলল রানা, জোর করে হাসছে। 'দুজন মিলে ফ্লোটাকে না আরও ছোট করে ফেলে।'

'আপনার কি ব্রেকফাস্ট লাগবে?' হাতের কাজে মন দিয়ে জানতে চাইল মনিকা।

খিদের কথা মনে করিয়ে দিতে মোচড় দিয়ে উঠল পেট, মনিকার পাশে বসল রানা। 'হ্যাঁ, খুব লাগবে। কী খাওয়াচ্ছেন?'

দেহভঙ্গিমায় নাচের মুদ্রা ফুটিয়ে তুলে সাবলীলভাবে রানার সামনে একটা প্লেট ধরল মনিকা, আরেকটা প্লেট দিয়ে ঢাকা।

প্লেটটা খুব গরম। ওটা নিয়ে নিজের হাঁটুর উপর সাবধানে রাখল রানা, তারপর ঢাকনিটা তুলল। 'মটরশুঁটি, ডিম পোচ, সসেজ, মাখন, রুটি, পনির, জেলি...অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'মিস্টার অস্টিন পরিজ চেয়েছিলেন,' বলল মনিকা, 'কিন্তু অনেক খুঁজেও পেলাম না আমরা। সাপ্লাই তাঁবু একেবারে এলোমেলো হয়ে আছে।'

'হ্যাঁ। সব আবার গোছগাছ করতে হবে। কাজটা আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু...'

আবার গোছগাছ করবার মানে, ওরা ভাবছে খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই।

তিন কাপ কফি খেয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করল রানা। 'ঠিক আছে। আমি যাই, গুছিয়ে ফেলি। কে জানে কতক্ষণ এই অবস্থা থাকবে।' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জুনোর দিকে তাকাল ও।

'খুব বেশিক্ষণ নয়,' জবাব দিল জুনো। 'শিগগির বাতাস ছাড়বে।'

'রেসকিউ টিমের লোকজন নিজেদের নাকই দেখতে পাচ্ছে না, আমাদেরকে দেখবে কীভাবে।'

'এ-সব আপনি জানেন কীভাবে?' প্রশ্ন করল মনিকা, খুব অবাক হয়েছে। 'মানে, এই আবহাওয়া সম্পর্কে? প্রাচীন কাল থেকে সংগ্রহ করা এস্কিমো নলেজ, যুগের পর যুগ ধরে বাবার কাছ

থেকে ছেলে পেয়েছে?'

'ঠিক তা নয়,' বলল জুনো। 'আমি আর্কটিক চিনি, ব্যস।'

মনিকা কিছু বলতে যাচ্ছে, এই সময় শুরু হলো চিৎকারটা। সঙ্গে সঙ্গে ওদের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের বরফে মরচে-লাল দাগটা খুব টানছে প্রফেসর মনসুরকে। শুধুই আগ্রহ বোধ করছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবছেন না, কারণ জানা আছে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট নেই।

'বলি কী,' অস্টিনকে ডেকে বললেন তিনি, 'পাহাড়টায় কিছু প্ল্যাঙ্কটন জমাট বেঁধে আছে। একটু দেখা দরকার।'

'কী? ওহ্। ঠিক আছে, সার।'

ওদের চারপাশে মোচড় খাচ্ছে কুয়াশা, তার ঘনত্ব কমবেশি হওয়ার কারণে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন মাত্রায় বদলে যাচ্ছে আলোর উজ্জ্বলতা। এই হয়তো পাহাড়টা আবছামত দেখা গেল, পরমুহূর্তে পুরোটা লম্বা করা হাতের আঙুলও দেখা যাচ্ছে না।

আরও মিনিট দুয়েক হাঁটার পর ওদের পায়ের নীচের বরফ ডেবে যেতে শুরু করল, সেই সঙ্গে আরও জোরাল হয়ে উঠল গভীর কুয়াশা ভেদ করে আসা অদৃশ্য সাগরের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ, উষ্ণ পানির ঢেউ ফ্লোর কিনারায় লেগে ভেঙে পড়ছে।

'তা হলে পৌঁছে গেছি, কী বলো?' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'এদিকেই, চূড়ার কাছে কোথাও দেখেছি...'

পাহাড়টা কাছেই। উঠতে শুরু করল অস্টিন। নিরেট বলেই মনে হলো ওর। ফুট বিশেক উপরে ছোট্ট একটা মালভূমি, তারপর চূড়া থেকে উল্টোদিকে খাড়াভাবে নেমে গেছে পাহাড়ের গা সোজা সাগরে—তবে চূড়ার কিনারা থেকে ছ'ফুট নীচে ছোট্ট একটা কারনিস আছে। আর চূড়া থেকে সাগরের সারফেস ত্রিশ ফুটের কম নয়।

প্রফেসরের চেয়ে কয়েক মিনিট আগেই উঠে এল অস্টিন, এই

সুযোগে মালভূমিটা ভাল করে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেল। সমতল প্ল্যাটফর্ম দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, ছয় ফুট। গায়ের সঙ্গে কুয়াশা ঝুলে থাকায় সাগরের দিকটায় বেশি ঘেঁষল না ও; তবে চূড়ায় ওঠার ঢালে মরচে-লাল রঙের দাগটা সত্যি দেখতে পেল ও, একটা পাশ ধরে বিস্তৃত হয়েছে নীচের দিকে।

হাঁটু গেড়ে দাগটা পরীক্ষা করল অস্টিন, তারপর কুঠারের সাহায্যে দাগ সহ বরফের একটা টুকরো ভেঙে নিল। যতটুকু বরফ ভাঙা হলো, তারচেয়ে আরও অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত দাগটা। ভাঙা টুকরোটা গ্লাভ পরা হাত দিয়ে আড়ষ্টভঙ্গিতে ধরে উপরে তুলল ও, তারপর ওটার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। এই সময় বাতাসের প্রথম ঝাপটা লেগে আলোড়িত হলো কুয়াশা, সেই সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ।

হাঁপাতে হাঁপাতে অস্টিনের পাশে উঠে এলেন প্রফেসর। 'দাও, দেখি,' বলে হাত থেকে গ্লাভ খুলে ফেলে হাঁটু গাড়লেন অস্টিনের পাশে। বরফের টুকরোটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিল অস্টিন।

'ও আল্লাহ রে! তুমি জানো এটা কি দারুণ একটা ব্যাপার?' রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'এটা ক্রিল! তা-ও আবার সারফেস ক্রিল নয়, এসেছে ডিপ স্ক্যাটার লেয়ার থেকে...'

'সেটা আবার কী?' প্রফেসর কী বলছেন কিছুই অস্টিনের মাথায় ঢুকছে না।

'ডিপ স্ক্যাটার লেয়ার? আরে, ওটা প্রায় সব মহাসাগরেই পাওয়া যায়। কয়েক হাজার ফুট পানির নীচে এমন একটা স্তর, যেখানে মেরিন লাইফ গিজগিজ করছে—সেটা কখনও ওঠে, কখনও নামে, সূর্য কত ওপরে থাকে তার ওপর নির্ভর করে। দুপুরের দিকে গভীরে তলিয়ে যায়, উঠে আসে রাতের বেলা।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকাল অস্টিন।

ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের কিনারা ঘেঁষে দাগটাকে অনুসরণ করছেন প্রফেসর, এগোচ্ছেন সাগর ঘেঁষা পাঁচিলটার দিকে। 'হ্যাঁ। সোজা

নেমে গেছে দাগটা। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে এই বরফ কি নিজের লেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, নাকি এখানে এটাকে ঠেলে তুলে দেয়া হয়েছে? বলতে চাইছি, পাঁচিলটা যদি সোজা ক্রিল ক্লাউড-এর ভেতর দিয়ে নেমে গিয়ে থাকে, তা হলে স্টাডি করার জন্যে দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় পাওয়া গেল...'

আকস্মিক দমকা বাতাস শুরু হতে তুমুল আলোড়ন উঠল কুয়াশার রাজ্যে, সাগরের দিকে কয়েকশ' গজ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। কুড়ালের হাতলে একদিকের কাঁধ রেখে বরফের উপর বসল অস্টিন, বাদামী সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নিষ্প্রভ অশান্ত সাগর আর শয্যাশায়ী রোগীর মত ভাসমান বরফ ওকে সম্মোহিত করে ফেলল। হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেলেন প্রফেসর, উঁকি দিয়ে সরাসরি নীচের দিকে তাকিয়ে আছেন। দাগটাকে অনুসরণ করছে ওঁর দৃষ্টি, খাড়া পাঁচিলের গা ধরে সোজা নেমে গেছে সেটা।

'আমি বলছি, নীচের দিকে ওটা সবুজ। এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ! এই ডোরা কাটা রঙ!' বাইরের দিকে আরও ঝুঁকলেন প্রফেসর, দেখতে চাইছেন দাগটা ছ'ফুট নীচের কারনিস পার হয়ে আরও নীচে নেমেছে কি না। আরেকটু সামনে বাড়লেন।

তারপর আরেকটু।

'ও হে, অস্টিন, আমার পা দুটো একটু ধরো দেখি,' বলে অস্টিনের দিকে তাকাবার জন্য ঘাড়টা একটু বাঁকা করলেন প্রফেসর, নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা কাঁধে ঘষা খেয়ে খসে গেল।

চশমা পড়ে যাচ্ছে দেখে হাত বাড়িয়ে সেটা ধরতে গেলেন তিনি। বরফ ছেড়ে দেওয়ায় ভারসাম্য হারালেন, একটা হাত সাগরের উপর প্রসারিত, অপর হাতটা নিজের পিছনে বরফ খামচাচ্ছে।

প্রফেসরের শরীর ডান দিকে গড়াল। বাম হাতে বরফ ধরতে

পারলেন। ঝুলছেন তিনি, পাঁচিলে পিঠ ঠেকে আছে, ডান হাত এখনও প্রসারিত—পা দিয়ে কারনিসের নাগাল পেতে চাইছেন।

সাগরের গর্জন সম্পর্কে সচেতন তিনি। ঘুরে বরফের দিকে ফিরতে চেষ্টা করছেন, যাতে কারনিসে পা বাধাতে পারেন আর দু'হাত দিয়ে ধরতে পারেন। চশমা না থাকায় ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, তারপরেও দ্রুত একবার সাগর আর কুয়াশার উপর চোখ বুলালেন, যদিও দুটোকে আলাদা করে চিনতে পারলেন না।

তবে বিশাল টর্পেডোর মত আকৃতিটা চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না, হঠাৎ সাদা-কালো কাঠামোটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে ওঁর চোখের সামনে চলে এল।

প্রফেসর পা ধরতে বলছে শুনে সংবিৎ ফিরে পেল অস্টিন। ঘাড় ফেরাতে দেখল প্রবীণ বিজ্ঞানী পাঁচিলের কিনারায় ঝুলছেন, পিঠটা বরফে ঠেকে আছে। পরমুহূর্তে, ওকে হতভম্ব করে দিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

ঝট্ করে সিধে হলো অস্টিন, লাফ দিয়ে এক কি দেড় গজ পার হয়ে এল। বাঁ হাতে কিনারা ধরে এখনও ঝুলছেন প্রফেসর, ওঁর ডান হাত সাগরের দিকে লম্বা করা, যেন কুয়াশা ধরতে চাইছেন, পায়ের গোড়ালি বরফের গায়ে ঘন ঘন বাড়ি খাচ্ছে।

এই সময় সাগরের সারফেসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ ফুট শূন্যে উঠে এল কিলার ওয়েইলটা, পাক খেল যতক্ষণ না তরল আলকাতরার মত চোখ পরিষ্কার দেখতে পেল ওদেরকে।

পাথর হয়ে গেল অস্টিন।

হাঁ করল তিমি। দাঁতগুলো নিষ্প্রভ হলুদ। ওটা পানির দিকে নামতে শুরু করেছে, এতক্ষণে আবার নড়ে উঠল অস্টিন। প্ল্যাটফর্মের কিনারায় হাঁটু গাড়ল, বিজ্ঞানীর মোচড়ানো বাম হাতের দু'দিকে একটা করে পা। নীচের দিকে ঝুঁকল ও, স্লেট রঙের পানিতে চোখ দুটো ব্যস্ত, তারপর ওঁর কবজি ধরে টান দিল।

এখনও শরীরটাকে ঘুরিয়ে ডান হাত দিয়ে পাঁচিলের কিনারা ধরতে চেষ্টা করছেন প্রফেসর। আবার টানল অস্টিন, কিন্তু বিজ্ঞানীকে নড়াতে পারল না। 'আমার হাত,' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'অস্টিন, আমার হাত!'

নিজের দুই হাঁটুর মাঝখানে তাকাল অস্টিন। প্রফেসরের বাম হাত বরফে জমে গেছে। 'যিশু...' আবার ঝট করে সিধে হয়ে কুড়ালের দিকে লাফ দিল ও।

গোড়ালি দিয়ে এতক্ষণে কারনিসের নাগাল পেয়েছেন প্রফেসর, মোচড়ানো কবজি থেকে খানিকটা চাপ কমাবার সুযোগ হলো। তবে চোখ দুটো পানিতে ভরে ওঠায় দৃষ্টিশক্তি আরও কমে গেছে। মুখটা খোলা, কুয়াশা ভরা হিম বাতাসে হাঁপাচ্ছেন।

ফিরে এসে কুড়ালটা মাথার উপর তুলল অস্টিন। 'এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে, সার,' বলল ও। 'ঝুলে থাকুন।' তবে ওর কথা বিজ্ঞানী শুনতে পেলেন না। কুড়ালটা নামাল ও। নামাচ্ছে, আর ঠিক তখনই আবার বিস্ফোরিত হলো সাগর, শূন্যে উঠে এল কিলার ওয়েইল, প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করে আছে।

অস্টিনের মনোযোগ ছুটে গেল। কুড়ালের কোপটা ছয় ইঞ্চি দূরে পড়ল, গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল প্রফেসরের আঙুলগুলো।

মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল বাম হাত, কলকল করে রক্ত ছড়াচ্ছে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে দৃশ্যটা দেখছে অস্টিন, এক চুল নড়বার শক্তি নেই। প্রবীণ বিজ্ঞানী পাঁচিল থেকে খসে গেলেন, ডিগবাজি খেতে শুরু করেছেন, তারপর মাথাটা আগে দিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন হাঁ করা তিমির মুখের ভিতর।

এতক্ষণে আর্তনাদ করে উঠল অস্টিন। পানিতে পড়ল তিমি, ওটার মুখ থেকে বিদঘুটে ভঙ্গিতে বেরিয়ে রয়েছে প্রফেসরের পা দুটো। পানির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল সব।

প্রচণ্ড রাগে, বোকার মত, আবার কুড়াল চালাল অস্টিন—

এবার ঠিকমতই লাগাতে পারল। বরফের কিনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়ল, প্রফেসরের আঙুলগুলো সহ। বরফে হাঁটু গাঁথল ও, কুড়ালের হাতল ধরে সামনের দিকে একটু ঝুঁকল, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

এই সময় ওর পাশে চলে এল রানা আর জুনো। 'কী...' শুরু করল রানা।

'কী হয়েছে?' তীক্ষ্ণ সুরে জিজ্ঞেস করল মনিকা, ঢাল বেয়ে পড়িমরি করে উঠে এল সমতল জায়গাটায়। গতির ঝোঁকটা সামলাতে পারল না, পিছলে কিনারায় পৌঁছে গেল, নীচে খসে পড়তে যাচ্ছে। দেখতে পেয়ে খপ করে ওকে ধরে ফেলল রানা, টান দিয়ে সরিয়ে আনল নিজের কাছে।

'সার নীচে পড়ে গেছেন। চশমা হারিয়ে ফেললেন, তারপর নীচে পড়ে গেলেন। কিনারাটা ধরে ফেলেছিলেন, কিন্তু তিমিটা...আমি...হাতটা লম্বা করে দিলেন তিনি। দেখতে পাচ্ছিলেন না। হাত লম্বা করা ছিল, আর তিমিটা...'

দু'হাত দিয়ে ধরে অস্টিনকে তুলে নিল জুনো। মনিকাকে নিজের গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে সাবধানে নামিয়ে আনছে রানা।

অসাড় হয়ে গেছে মনিকা। বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। কোনও ব্যথা অনুভব করছে না, শোক বা অসুস্থতাও নয়। কিছুই অনুভব করছে না। ব্যাপারটা ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না।

স্ফটিকস্বচ্ছ পাঁচিলের কিনারায় অস্টিনকে ধরে রেখেছে জুনো, হড় হড় করে বমি করছে অস্টিন। বাতাসের গতি এখন আরও বেড়েছে, ঝেঁটিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুয়াশাকে। সাগর পরিষ্কার হচ্ছে, ঢেউ উঠছে, মাথায় বুদ্বুদ। স্ফটিকস্বচ্ছ পাঁচিলের নীচে ছোট এক টুকরো বরফ কাত হলো। ওটার ভিতর, প্রায় বরফটার মতই সাদা, নিখুঁতভাবে গোড়া থেকে কাটা চারটে আঙুল রয়েছে।

শিউরে উঠল জুনো, ওরও বমি পাচ্ছে। অস্টিনকে নিয়ে ওখান থেকে পিছিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

বিশ

প্রফেসর মারা যাওয়ার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ঝড়ো বাতাস বইল। কুয়াশার ভারী স্তরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের অগোচরে, কুয়াশার আড়ালে, সম্পূর্ণ বদলে গেছে আবহাওয়া।

উজ্জ্বল নীল আকাশের জায়গায় মোটাসোটা কদাকার মেঘের নিচু সিলিং ঝুলে আছে মাথার উপর, সাগরের দিকে ঝুঁকে অস্থিরভঙ্গিতে পশ্চিমে ছুটছে। আলোর চোখ-ধাঁধানো শক্তিও শেষ, তার বদলে ভারি আর গাঢ় ছায়া বিছিয়ে আছে চারদিকে।

কালচে আকাশ আর কালচে সাগর বিস্তৃত হয়ে মিশেছে ঝাপসা দিগন্তের সঙ্গে।

প্রাণ আছে শুধু বরফের। ভাসমান প্রতিটি ফ্লোর স্ফটিকস্বচ্ছ সারফেস যে সামান্য আলো পাচ্ছে সেটাকেই যেন বহুগুণে বাড়িয়ে নীলচে প্যারাফিন শিখার মত আভা ছড়াচ্ছে। এমনকী সাগরের নীচেও জ্বলছে রহস্যময় ওই আলো।

কালো মেঘ নেমে এল কালো সাগরের কাছাকাছি। যেন আকাশের একটা প্লাগ খুলে দেওয়ায় হাজার মাইল জুড়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেছে। গর্জন করতে করতে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে দুর্যোগটা। চারদিন আগে বারো এয়ার ফিল্ড বন্ধ করে রেখেছিল ওটা, এখন বেরিং প্রণালী তছনছ করছে, ওটার সামনের অংশ এরইমধ্যে ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার আকাশসীমায়।

তাঁবুর ভিতর আধো অন্ধকারে বসে আছে ওরা, প্রায় এক

ঘণ্টা হলো কেউ কোনও কথা বলছে না। সবাই খুব ক্লান্ত। কীভাবে সারভাইভ করবে, এ প্রশ্নটাই বোধহয় ওদেরকে সবচেয়ে কাহিল করে তুলছে।

কল্পনার চোখে সাদা আঙুলগুলোকে বাদামী-সবুজ সাগরে ভাসতে দেখছে জুনো, এক টুকরো বরফে মোড়া। এখনও অসুস্থ বোধ করছে ও।

অস্টিন কিছুই ভাবছে না। মন্ত্র আউড়াবার মত নিজেকে শোনাচ্ছে, 'আমি কিছু ভাবছি না। আমি কিছু ভাবছি না। আমার কিছু চিন্তা করার নেই।' ওর ভয়, এভাবে কথার সাহায্যে নিজেকে ব্যস্ত না রাখলে পাগল হয়ে যাবে।

অস্টিনের ম্লান মুখটা লক্ষ করছে রানা, লক্ষ করছে একই ছন্দে বারবার নড়ছে ঠোঁট দুটো। ওর চোখের মণি অস্থির হয়ে চারদিকে ঘোরাফেরা করলেও, সন্দেহ আছে কিছু দেখতে পাচ্ছে কি না।

আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে পড়ে আছে মনিকা। মারাত্মক শক লাগায় ওর মন খালি হয়ে গেছে, তবে শক্তভাবে বন্ধ চোখের সামনে মাঝেমধ্যেই আলোর ঝলকানির সঙ্গে দু'একটা ছবি ফুটে উঠছে—মম্‌কে কবরে শোয়ানো হচ্ছে, টাইমস-এর পাতা, অ্যাঙ্কারেজের এয়ারপোর্টে ওকে দেখে ড্যাডির উল্লাস। নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল মনিকা।

তাঁবুর আলগা প্রান্ত, রশি আর বাতাস গান ধরল। কমলা নেট ফুলে ফুলে উঠছে। ইস্পাতের ট্রে থেকে ফুলকির মেঘ উঠছে। বাদামী সাগর আরও অস্থির হয়ে ওঠায় ঢেউগুলো ছুটে এসে ভেঙে পড়ছে ওদের ফ্লোর কিনারায়।

ফ্লোটা এখন এত ছোট যে সাগরের হুকুমে সাড়া দিতে বাধ্য হচ্ছে। ঝড়ের পিছনে রয়ে যাওয়া দীর্ঘ ঢেউগুলো ওটার তলা দিয়ে নিয়মিত বইছে, ফলে ধীরগতিতে দোল খাচ্ছে ওদের বাহন। সাপ্লাই তাঁবুর ভিতর পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন

আওয়াজ করছে টিনের কৌটা, সিলভার হার্পুনগুলো একদিক থেকে আরেকদিকে গড়াচ্ছে। কালো মেঘ এত নীচ দিয়ে ছুটছে, ফ্লোতে না ঘষা খায়।

'কারও কাছে অ্যাসপিরিন হবে?' হঠাৎ জানতে চাইল মনিকা।

'অ্যাসপিরিন?' চমকে উঠে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল রানা। 'কী জানি...থাকার তো কথা...'

'মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে,' বলল মনিকা। ওর গলার আওয়াজ এত কাতর, রানার ঘাড়ের পিছনে চুল নড়ে উঠল।

'সাপ্লাই তাঁবুতে ফার্স্ট এইড বক্স দেখেছি,' বলল ও। 'অস্টিন? অস্টিন!'

'বলো,' ভোঁতা আওয়াজ বেরুল অস্টিনের গলা থেকে।

'অ্যাসপিরিন দরকার, আছে কি না জানো?'

'অ্যাসপিরিন? আছে, অবশ্যই আছে। ফার্স্ট এইড বক্সে। যাই, নিয়ে আসি।' কিছু একটা করবার সুযোগ পেয়ে অস্টিন যেন বেঁচে গেল। আড়ষ্টভঙ্গিতে সিধে হলো ও। ফ্লো নড়ে ওঠায় টলমল করে উঠল শরীরটা। 'এ আবার কী...?'

ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করল ওরা, আবহাওয়ার চরম অবনতি হয়েছে। ফ্ল্যাপ খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল অস্টিন, চোখ দুটো আপনা থেকে সরু হয়ে গেল, অথচ তাঁবুর মত বাইরেটাও প্রায় অন্ধকার। তাজা বাতাস লাগল মুখে, উষ্ণ আর ভেজা। সাপ্লাই তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরল ও, বাধা পাচ্ছে অস্থির নেটে পা জড়িয়ে যাওয়ায়।

মুখ তুলে দ্রুতগতি মেঘের দিকে তাকাল অস্টিন, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ল ওর চোখে। ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু চিন্তা না করে কুঁজো হলো, এগোল মনিকার জন্য অ্যাসপিরিন আনতে।

তাঁবুর ভিতর, মনিকাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

'একটু ভাল...' কথাটা সত্যি বুঝতে পেরে মনিকা নিজেই অবাক হচ্ছে।

'শুধু মাথাব্যথা?'

'সামান্য বমি বমি ভাব,' গলার আওয়াজ বলছে, একটু অন্যমনস্ক মনিকা।

'আশা করি খাবারের মধ্যে কিছু ছিল না,' বলল রানা। 'মন শক্ত করুন, সেরে যাবে।'

অবাক হলো মনিকা, রানার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল। আশ্চর্য, ওর ভিতরে কী চলছে তা রানা জানল কীভাবে?

পাশে ড্যাডি নেই, তাই মনিকা ধরে নিয়েছিল এমন মুষড়ে পড়বে যে সিধে হয়ে দাঁড়াতেও পারবে না আর। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ও। রাখতে পারবেও। 'এই যে, মিস্টার, আমার রান্নার দুর্নাম করবেন না!'

হেসে ফেলল রানা। সকৌতুক আলাপটা শুরু হতে না হতে থেমে গেলেও, এ থেকে বোঝা গেল মনিকার অসুস্থতা গুরুতর কিছু নয়। রানার হাসির উত্তরে ওর ঠোঁটও একটু প্রসারিত হলো।

দুটো ঢেউ পরস্পরের সঙ্গে খুব কম ব্যবধান রেখে ছুটে আসায় একটু ঝাঁকি খেল ফ্লো।

চোখ খুলল জুনো, লম্বাটে চোখে মিটমিট করে তাকাল। ঝাঁকি লাগায় যতটা না, তারচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছে হাসির শব্দে। প্রায় অন্ধকার তাঁবুর ভিতর চোখ বুলিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। সন্দেহ হলো আদৌ ওটা হাসির শব্দ ছিল কি না।

বাইরে থেকে বাতাসের সোঁ সোঁ, ফ্লোর কিনারায় ঢেউ ভাঙার গর্জন আর ফায়ার-ট্রের অস্থির শিখার হুতাশের আওয়াজ ভেসে আসছে। তাঁবুর একটা দিক বাতাসে ফুলে উঠল, যেন একটা পাল। দুই বন্ধুর চোখাচোখি হলো, দুজন যেন একসঙ্গে উপলব্ধি করল বিপদটা।

দ্রুত ক্রল করে একযোগে ফ্ল্যাপের দিকে এগোল ওরা।

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। আর ঠিক তখনই তির্যক পথ ধরে নেমে এল দিনের প্রথম উষ্ণ বৃষ্টি।

ফ্লোটা এখনও বড় একটা স্টেডিয়ামের মত: কাজেই নিরাপদ মনে না করবার কোনও কারণ নেই। তবে রানা ও জুনো জানে যে ওদের বাহন কত বড় আর কত চওড়া তার কোনও গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হলো কতটা পুরু।

যথেষ্ট পুরু না হলে যে-কোনও বড় ধরনের দুর্যোগে অ্যাক্সিডেন্ট করা গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের মত চুরমার হয়ে যাবে ফ্লোটা। ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করে যদি টিকেও যায়, স্রোত আর বৃষ্টি ওটাকে গলিয়ে এমন পাতলা করবে, হাঁটাহাটি করাটা হয়ে উঠবে মারাত্মক বিপজ্জনক।

আর তখন যদি কিলার ওয়েইলরা ফিরে আসে, ফ্লোর তলা ভেঙে ওগুলোর উপরে উঠে আসা কোনওভাবেই ঠেকানো যাবে না।

চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে জুনো দেখল, একেবারে কাছে চলে এসেছে সাগর। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আছে সব, পাঁশুটে মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। অশান্ত সাগর কালো দেখাচ্ছে, শুধু ভাসমান বরফগুলো ঠাণ্ডা নীল আভা ছড়াচ্ছে।

'কাঠ!' হঠাৎ বেড়ে ওঠা বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার চড়া গলা। 'ওগুলো যেন না ভেজে!'

শুনে মাথা ঝাঁকাল জুনো। আগুন ছাড়া ওদের রান্না বন্ধ হয়ে যাবে, এমনকী বরফ গলিয়ে পানিও যোগাড় করতে পারবে না। আগুন ছাড়া মারাত্মক বিপদে পড়তে হবে।

মারাত্মক বিপদ? এখনই তো মারাত্মক বিপদের মধ্যে রয়েছে ওরা, ভাবল জুনো। বাতাস যদি বাড়তেই থাকে, ঢেউ যদি আরও বড় হয়, বৃষ্টি যদি এখনই না থামে, সবাই ওরা মারা যাবে।

বাতাসের গতি একটু কমল। এক বাণ্ডিল জ্বালানি কাঠ বগলদাবা করে হোঁচট খেতে খেতে তাঁবুর দিকে ফিরছে রানা।

সাপ্লাই তাঁবু থেকে অ্যাসপিরিন নিয়ে বেরিয়ে এল অস্টিন। পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল ওরা।

কাঠগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। 'এই শালা, কানা নাকি?' মারমুখো হয়ে বলল অস্টিন, তারপর রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল, হাতে ধরা অ্যাসপিরিন নিরাপদেই আছে।

পিছন থেকে ওর পারকাটা টেনে ধরবার জন্য হাত লম্বা করেছে রানা, ঠিক সময়মত ছুটে এসে সেটা নামিয়ে দিল জুনো। কোনও কথা হলো না; রানার বদলে এক এক করে কাঠগুলো ওই তুলল, তারপর অস্টিনের পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল মনিকার তাঁবুতে।

মনিকার পাশে ঝুঁকে রয়েছে অস্টিন, ট্যাবলেটগুলো ওর হাতে গুঁজে দিচ্ছে।

'এ-সবের জন্যে পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে,' ধমকের সুরে বলল জুনো। 'বাইরে পড়ে থাকা অনেক জিনিস এখনই ভেতরে আনা দরকার।'

সাপ্লাই তাঁবু ওয়াটারপ্রুফ নয়। ওখানে রাখা জিনিসগুলো যদি ভিজে যায়, আর ঝড়ের পর যদি তাপমাত্রা আবার কমে, বেশিরভাগই পাতলা বরফের আবরণে ঢাকা পড়বে, ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না। শুধু খাবার নয়; ফার্স্ট এইড ইকুইপমেন্ট, রাইফেল ইত্যাদি।

ক্যাটালগ তৈরির ধৈর্য হলো না জুনোর, হাতে সময় কোথায়! পিছন থেকে কাঁধটা খামচে ধরে অস্টিনকে একরকম টেনে-হিঁচড়ে তাঁবু থেকে বের করে আনল ও।

কয়েক মুহূর্ত পর মনিকাও বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল, জুনোর আচরণে জরুরি তাগদার ভাবটা চোখে পড়েছে।

হঠাৎ বাজ পড়ার মত গর্জন শুনল ওরা। বরফ ফুলে ওঠায় ছিটকে পড়ল রানা। ওর কয়েক ইঞ্চি নীচের বরফে ফাটল ধরছে, সোজা ক্যাম্পের মাঝখান দিয়ে এগোল সেটা। অল্প সময়ের বিরতি, তারপর প্রবল উৎসাহে নতুন করে শুরু হলো ফাটল

ধরানোর পালা। ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে যাচ্ছে ওদের ফ্লো।

নেটের একটা অংশ ক্যাম্পের নীচে রয়েছে, টান পড়ল তাতে, মোচড় খেল, ছিঁড়ে যাচ্ছে। রানার পায়ের কাছে ফাটলটা দু'সারি দাঁতের মত এক হলো। বরফ ভাঙার গর্জন আরও বাড়ছে।

পরবর্তী আধঘণ্টা বাছাই করা কিছু আইটেম সাপ্লাই তাঁবু থেকে বের করে কাছাকাছি অক্ষত তাঁবুতে সরিয়ে আনল ওরা—টয়লেটে।

কাঁধে কয়েক প্রস্থ রশি ফেলে জুনোকে নিয়ে ফ্লোর কিনারা লক্ষ্য করে এগোল রানা। বড় ফাটল দেখতে পেলে, যদি মনে হয় ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ফ্লোর একটা অংশ, রশি দিয়ে জড়িয়ে ঝুঁকিটা কমাবার চেষ্টা করবে ওরা।

বাতাসের গতি বাড়ছেই। তারপর তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বাতাসের সঙ্গে ছুটে এল মিহি জলকণা, আশ্চর্য এক ধরনের কুয়াশা।

একটানা দেড়ঘণ্টা কাজ করল রানা আর জুনো, কাঁধের সবগুলো রশি শেষ করে ফিরে এল। পাঁচ কি সাতটা ফাটল দেখেছে ওরা, সবগুলোই একসময় ফ্লোর একটা করে অংশ নিয়ে আলাদা হয়ে যেত—নাইলনের মোটা রশি দিয়ে বাঁধার ফলে প্রক্রিয়াটা অন্তত বিলম্বিত হবে।

ঢেউগুলো ফ্লোতে উঠে আসছে, বরফের উপর দিয়ে গড়িয়ে নাগাল পেতে চাইছে ওদের ক্যাম্পের। নেটের নীচে, ফাটলের কিনারা, ক্ষিপ্ত সিংহের মত গরগর করছে। ফুলে ফুলে উঠছে তাঁবুগুলোর ক্যানভাস, পতপত করছে, যেন ছিঁড়ে যাবে। মাঝে-মধ্যে বাতাসের ঘূর্ণিতে নুয়ে পড়ছে গোটা তাঁবু।

ওদের পায়ের চারপাশে কলকল করছে ঢেউ ভাঙা পানি। ফায়ার-ট্রে কাত হয়ে পড়ল। বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেল রানার মাথা আর মুখ। ওর কলার, কাফ ও বুটে পানি ঢুকছে। চোখ আর মুখও ভিজে গেল পানিতে। চিবুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় খসে পড়ছে। প্রায় অন্ধ, ক্যাম্পের চারদিকে তাকাল, দেখছে বৃষ্টি থেকে

আর কিছু সরানো বাকি আছে কি না।

বাকি সবাই ইতিমধ্যে টলতে টলতে তাঁবুতে ফিরে গেছে। মাথা নিচু করে রানাও অনসরণ করতে যাচ্ছে ওদেরকে। এই সময় ওর চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। সেদিকে তাকাল ও।

কী দেখল? সব স্থির হয়ে রয়েছে। ক্যাম্পের উপর দ্রুত চোখ বুলাল আবার। চেক করছে—চারটে তাঁবু, নেট, ফায়ার-ট্রে। দৃষ্টি সরে গেল, তারপর ঝট করে ফিরে এল আবার। ফায়ার-ট্রে! দ্রুত এগোল রানা।

নিজে থেকেই উঁচু হচ্ছে ওটা। সামনের পা দুটো মুক্ত হলো বরফ থেকে। পিছনের পা জোড়া ভাঁজ হয়ে গেল। গরম ছাই থেকে হিস্‌হিস্ আওয়াজ উঠছে। তারপরেই পিছলে গেল, গড়িয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দৌড়াতে শুরু করেছে রানা। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে বরফ ভাঙার মটমট শব্দ উঠে আসছে, বাতাসের একটানা সোঁ সোঁ আওয়াজ সত্ত্বেও শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার। ফাটল যেখানে গভীর ও কালো, লাফ দিয়ে পার হচ্ছে ও। ট্রেটা এখন নেটের কিনারা ছাড়িয়ে গেছে, ক্রমশ আরও দ্রুতবেগে লাফাতে লাফাতে ছুটছে।

রানার বুট গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে বরফে, যেখানে লাগছে কাদার মত সেঁটে থাকছে। প্রায় নাগালের মধ্যে চলে এসেছে ট্রে, আর মাত্র কয়েক পা দূরে ওটা। হাত লম্বা করল ও, ধরতে যাচ্ছে। ধরল!

পায়ের নীচে ধসে গেল বরফ।

এইমাত্র দৌড়াচ্ছিল, পরমুহূর্তে ডান হাঁটুর উপর স্থির হয়ে রয়েছে, উরুর অর্ধেক পর্যন্ত বাম পা গায়েব। তবে ফায়ার-ট্রেটা ওর হাতে। দিশেহারা হয়ে নীচে তাকাল রানা। ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করল নিতম্বে, ওখানকার কোনও পেশি হয়তো

মুচড়ে গেছে। অনুভব করল ওর বুটের ভিতরটা পানিতে ভরে গেছে। 'ধুস শালা!'

উঠতে চেষ্টা করছে রানা। সাবধানে, ধীরে ধীরে, টুকরো টুকরো সাদা স্বচ্ছ বরফের ভিতর থেকে বাম পা তুলে আনছে। ডান পা সিধে করবার সময় ট্রের কিনারাকে ক্রাচ হিসাবে ব্যবহার করল। বরফ ধসছে না। কিন্তু হঠাৎ, বিনা আহ্বানে, হোমারের স্মৃতিটা উঠে এল মনের পরদায়। বেজন্মা সেই তিমিটা এখন যদি ওর নীচে চলে এসে থাকে?

তারপরেই পায়ে টান অনুভব করল রানা। আসলে বরফের কিনারা ওর বুটের উপরে ঘষা খেয়েছে। কিন্তু তা জানে না ও, ফলে গর্ত থেকে ঝট করে উঠে আসার চেষ্টায় ডান পা লম্বা করে দিল। পা থেকে খুলে গেল বুটটা।

ভিজে জবজবে ট্রাউজারের পায়ার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা, দেখল মোজা থেকে পানি ঝরছে। 'সর্বনাশ!'

লাফাতে লাফাতে ক্যাম্পের দিকে ছুটল ও।

তাঁবু থেকে মাথা বের করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে মনিকা, বুঝতে চাইছে কী কারণে দেরি হচ্ছে রানার। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে এক পায়ে ছুটতে দেখল ওকে, দেখল বাম পা ভাঁজ করে উপরে তুলে রেখেছে, ওটার ট্রাউজারের পায়া লটপট করছে বাতাসে, একহাতে ধরে আছে ফায়ার-ট্রে।

হেসে ফেলল মনিকা, মাথাটা টেনে নিল তাঁবুর ভিতর। ওকে হাসতে দেখে সন্দেহের রেখা ফুটল অস্টিনের কপালে। ফ্ল্যাপ তুলে তাকাল সে-ও।

অস্টিনকে পাশ কাটিয়ে ক্রল করে তাঁবুতে ঢুকল রানা।

'এটা হাসির কোনও ব্যাপার নয়,' বিড়বিড় করে বলল অস্টিন। 'পায়ে বুট না থাকায় রানার পা জমে যেতে পারে।'

'তাই কি?' ম্লান মুখে জানতে চাইল মনিকা। 'কিন্তু বৃষ্টির পানি গরম না? টেমপারেচার একটু বেড়েছে না?'

অস্টিন কিছু বলছে না।

রানা বলল, 'আমাদের সবারই কাপড় পাল্টানো দরকার।'

ওদের বাইরের কাপড় শুধু ভিজেছে, ভিতরের কাপড় স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। নিজের পারকা, শার্ট, ডান পায়ের বুট আর জিনস খুলছে রানা; ওর সঙ্গে জুনোও নিজের ভিজে কাপড় খুলছে।

নিজেদের মধ্যে কোনও পরামর্শ না করেই মনিকার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে ওরা দুজন, মেয়েটাও যাতে ছয় জোড়া পুরুষের চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাপড় পাল্টাতে পারে।

কেউ বলে দেয়নি, সুযোগটা দেখতে পেয়ে হাতছাড়া করছে না মনিকা। দ্রুত কাপড় পাল্টাচ্ছে ও, রানা ও জুনো পাঁচিল তৈরি করায় অস্টিন ওকে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু এভাবে কি আব্রু রক্ষা সম্ভব? ভিজে কাপড় শুকাতে সময় লাগবে না?

পারকা, পুলওভার আর শার্ট খুলে ফেলল মনিকা। ট্রাউজার খুলতে যাচ্ছে, দেখল জুনোর ফাঁক করা পায়ের ভিতর দিয়ে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে অস্টিন, বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে চোখ দুটো।

নিতম্ব ঝাঁকিয়ে হাঁটুর কাছে ট্রাউজার নামাল মনিকা, তারপর বসল ও। 'আপনার হয়েছেটা কী, মিস্টার অস্টিন?' ওর অপলক দৃষ্টি অসহ্য হয়ে ওঠায় প্রতিবাদ না করে পারল না মনিকা। 'আপনি কি আন্ডারঅয়্যার পরা মেয়ে আগে কখনও দেখেননি?'

একুশ

বিষম খেল অস্টিন। 'আ-আন্ডা...আমি...কী বলছ...ধ্যাত!'

মনিকা আর কিছু বলছে না। তবে ও যে খুব রেগে গেছে, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারল সবাই।

'চোখ দুটোকে একটু সামলে রাখলেই পার,' বিড়বিড় করল জুনো।

'আরে,' শুরু করেও থেমে গেল অস্টিন।

তাঁবুর তাপমাত্রা বাড়তে লাগল। ওদের কাপড়চোপড় ধীরে ধীরে শুকাচ্ছে।

বাইরের পরিস্থিতিও ক্রমশ ভালর দিকে। পানি ভরা পাঁশুটে মেঘ পাতলা হয়ে গেল, কমে এল বাতাসের দাপট, থেমে গেল বৃষ্টি, শান্ত হয়ে এল সাগর।

তবে সূর্যকে ফেরত পাওয়া গেল না, কারণ অনেক উপরে মেঘের আরেকটা ভারী স্তর আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে; ওটার প্রভাবে সাগর পেয়েছে নিষ্প্রভ সীসার মত রঙ।

ধীরে ধীরে বন্ধ হলো ফ্লোর দোল খাওয়া। ঢেউগুলো আর বরফের কিনারা টপকে উপরে উঠে আসছে না। তবে বেশ অনেকটা পানি ফ্লোর সারফেসে জমে আছে, বরফ হতে সময় নেবে। অনেক ফাটল আর গর্ত ঢেকে রেখেছে ওই পানি, ফলে বাইরে বেরুলে ওদের সবাইকে সাবধানে পা ফেলতে হবে।

ঘণ্টা দুয়েক এটা-সেটা নিয়ে গল্প করল ওরা, তারপর আর এনার্জি পাচ্ছে না। 'আমাদের আসলে কফি দরকার,' বলল মনিকা।

'রাইট,' বলল অস্টিন। 'তবে শুধু কফি? তোমাদের কারও খিদে পায়নি?'

'বাইরেটাও একবার চেক করা দরকার,' বলল রানা। 'বেশি সময় না নিলে জিনস আর পুলওভারেই গরম থাকবে শরীর।' জুনোর দিকে তাকাল।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জুনো, বলল, 'তবে বুট ছাড়া তাঁবুর বাইরে তুমি বেরুতে পারবে না।'

'আমি জানি কোথায় বুট আছে,' বলল মনিকা। 'একটু অপেক্ষা করুন, যাব আর আসব।' তাড়াতাড়ি কাপড় পরল, তারপর ফ্ল্যাপ তুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওর পিছু নিল অস্টিন।

বাইরে বেরিয়ে অক্ষত আরেকটা তাঁবুর দিকে এগোল মনিকা, ওটায় অতিরিক্ত কাপড়চোপড় আর বুটের একটা বান্ডিল আছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, দেখল ওর পিছু পিছু অস্টিনও আসছে। 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন, মিস্টার অস্টিন? দাঁড়িয়ে পড়ল।

'না, মানে, তুমি কি একা ওটা খুঁজে বের করতে পারবে?' আমতা আমতা করে বলল অস্টিন। 'তাই ভাবলাম তোমাকে সাহায্য করি...'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মনিকা। 'সাহায্য লাগবে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' মুখটা বেজার করে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল অস্টিন।

তাঁবুটায় ঢুকে একটু খুঁজতেই বান্ডিলটা পেয়ে গেল মনিকা। খুলল সেটা, একজোড়া বুট নিয়ে বেরিয়ে এল। নেট বরাবর এগোচ্ছে, মাঝ দূরত্বে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখের কোণে কী যেন একটা ধরা পড়েছে। চোখ সরু করে দক্ষিণদিকে তাকাল মনিকা। ওদিকটায়, শান্ত প্যানির উপর, কিছু একটা নড়াচড়া করছে। নীচের ঠোঁটটা কামড়াল ও। একটা ভয় দানা বাঁধছে বুকে।

ফিরে এসেছে ওগুলো! ভাবল মনিকা। ত্রিমিগুলো আবার ফিরে এসেছে! ওর সারা শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল।

তাঁবুর দিকে ছুটল ও। অস্টিনকে দেখতে পাচ্ছে, ফায়ার-ট্রেটা বরফে বসিয়ে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে।

'রানা! আমি... ওগুলোকে আমি...' চেঁচাচ্ছে মনিকা।

'এই, কী হয়েছে?' লাফ দিয়ে সিধে হলো অস্টিন, হাত মেলে দিয়ে থামাবার চেষ্টা করল মনিকাকে, ভাবছে—শুধু রানা? মিস্টার গেল কই?

মনিকার চোখেমুখে আতঙ্ক দেখে চমকে উঠল অস্টিন, লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল ওর পথ থেকে। ছুটে এসে ঝুঁকল মনিকা, ফ্ল্যাপ তুলে ভিতরে মাথা ঢোকাল, নতুন বুট জোড়া ছুঁড়ে দিল রানার দিকে, রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ফিরে এসেছে! ওগুলো ফিরে এসেছে!'

'বলো কী!' বুট দুটো পায়ে গলাচ্ছে রানা।

ওদের দুজনকে ধাক্কা দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল জুনো।

'তুমি শিওর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানি না। কিছু একটা আছে ওখানে। ওহ্, রানা, কেন?' তারপরেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মনিকা।

'সব ঠিক হয়ে যাবে।' সিধে হলো রানা, এক হাতে ওর কাঁধটা জড়াল। 'আমি আছি না।'

রানার শেষ কথাটা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না মেয়েটা। ওর চওড়া বুকে চেপে ধরল মুখটা, চোখ বুজে আছে শক্ত করে, নিজের ভয় আর দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেন্ড পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও, নিজের উপর রেগে আছে, ক্রল করে তাঁবুর এক কোণে গিয়ে বসল।

বাইরে বেরিয়ে এসে জুনোর পাশে দাঁড়াল রানা, আরেক পাশে অস্টিন দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাঢ় সাগর আর গাঢ় আকাশ পরস্পরের সঙ্গে যেন সেঁটে আছে। দৃষ্টিসীমা খুব কম। দূরে খয়েরি রঙের বেঢপ ঝাঁক, অলসগতিতে ওদের দিকে এগিয়ে

আসছে।

জুনোর দিকে তাকাল রানা। দূরে দৃষ্টি, প্রাণীগুলোকেই দেখছে, তবে কেমন যেন অন্যমনস্ক।

পানির উপর দিয়ে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ভেসে এল, যেন কোথাও বেল বাজছে। শরীর উঁচু করে বরফের ভাসমান স্তূপে উঠে পড়ল একটা প্রাণী, আলো লাগল সোজা আকৃতির এক জোড়া হলুদ দাঁতে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে রানার পাশে দাঁড়াল মনিকা। অস্পষ্ট বেল বাজার আওয়াজ, যেন দুই সুরে মোটর কার-এর হর্ন বাজছে, আরও একটু স্পষ্ট হলো।

'ওডোবেনিডি,' বলল জুনো।

'প্লিজ, মিস্টার জুনো,' তিক্তকণ্ঠে বলল মনিকা, 'ইংরেজিতে বলুন, আপনার এস্কিমো ভাষা আমরা কেউ বুঝি না।'

'ওটা ল্যাটিন,' বলল ডট জুনো, মনিকার রাগ ওকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি। 'ওগুলো তিমি নয়, সিন্ধুঘোটক।'

'ও-ও-ও!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠল অস্টিন। 'তাই নিয়ে এত কিছু?'

একটা-দুটো নয়, নয় দশটা-বিশটা, ঝাঁকটায় সিন্ধুঘোটক রয়েছে দুশোর কিছু বেশি তো কম নয়।

উত্তর আলাস্কা উপকূলে ছিল বারোশ'র একটা ঝাঁক। পর পর দুটো ঝড়ের কবলে পড়ে এই দলটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন ওদের খাবার দরকার, দরকার বিশ্রাম।

এরকম পরিস্থিতিতে মাঝারি একটা ফ্লো পেলেই কাজ চালিয়ে নেয় ওগুলো। সেটার উপর সাবধানে চড়ে একটার গায়ে একটা লেগে থাকে, তৈরি হয় মেরুন রঙের মাংসের পাহাড়। এটা ওদের একটা স্বাভাবিক আচরণ, এভাবে বেঁচে থাকতে ভালবাসে।

পিছনে ফেলে আসা প্রায় একশ' মাইলের মধ্যে সাগরের

গভীরতা কোথাও তিনশ' ফুটের কম ছিল না, ফলে ডুব দিয়ে তলা থেকে খাবার যোগাড় করতে পারেনি। কাজেই বাধ্য হয়ে স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে যাচ্ছে, জানে ওদিকের চুকোৎস্কি পেনিনসুলায় একটা ব্রিডিং গ্রাউন্ড পেয়ে যাওয়ার ভাল সম্ভাবনা আছে।

বয়স্ক পুরুষরা ঝাঁকটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে; মাঝেমধ্যেই ওগুলোর দু'একটা ছোটখাট কোনও ফ্লোর কিনারায় সমান্তরাল একজোড়া দাঁত আটকে উঠে আসছে উপরে দম নেওয়ার জন্য, সেই ফাঁকে চোখ বুলিয়ে দেখেও নিচ্ছে চারদিকটা।

বয়স্ক পুরুষদের ঠিক পিছনেই রয়েছে তরুণী, মা আর বাচ্চার দল; বাচ্চারা সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই মায়েরা ওগুলোকে পিঠে তুলে নিয়েছে। তারপর রয়েছে বয়স্কা মহিলারা, যাদের বাচ্চা দেওয়ার বয়স পেরিয়ে গেছে। একেবারে পিছনে আর দু'পাশে পাহারায় রয়েছে তরুণ সিন্ধুঘোটকরা, যদিও সাগরের কাছাকাছি কোথাও এমন কিছু নেই যেটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

মনিকা আতঙ্কিত হয়ে পড়ায় ফ্লোতে একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, এখন পরিবেশটা আবার শান্ত।

অভ্যস্ত ব্রিডিং গ্রাউন্ড থেকে সিন্ধুঘোটকরা এত দূরে চলে এসেছে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে জুনো, তবে এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলছে না ও।

ঝাঁকটা কাছাকাছি চলে আসায় ওগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করছে পারছে ওরা। বুড়ো যে ষাঁড়টা সাগরের সারফেসে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ফ্লোর কিনারায় উঠে প্রায়ই চারদিকে তাকাচ্ছে, সম্ভবত ওটাই ওদের লিডার, খুব সহজেই চেনা গেল—সোজা দাঁতগুলোর একটা ভাঙা, ফলে বাম দাঁতের চেয়ে ডান দাঁত এক ফুট ছোট।

কয়েকটা তরুণ সিন্ধুঘোটকও ফ্লোতে উঠছে, কারও কারও মাত্র একটা দাঁত গজিয়েছে। ঝাঁকে বোধহয় একজন সহকারী লিডার আছে, আধবুড়ি এক মহিলা; দাঁত দুটো এত বেশি বাঁকা যে বিশাল বুকের সামনে ক্রস-এর মত একটা নকশা তৈরি হয়েছে। তবে লিডার একটু পাশ ফিরতেই ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা।

'সিন্ধুঘোটক কি বিপজ্জনক?' জানতে চাইল মনিকা, ওগুলোর বিরাট আকৃতি দেখে ভারি অবাক হয়েছে। একেকটা প্রায় পনের ফুট লম্বা, শক্ত-সমর্থ, বরফে বসে থাকার সময় মাথাটা শূন্যে ছ'ফুট পর্যন্ত উঁচু করতে পারে।

'না, এমনিতে বিপজ্জনক নয়,' বলল জুনো। 'অন্তত যতক্ষণ ওগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকা যায়। বড় অদ্ভুত প্রাণী সিন্ধুঘোটক; মন্থর, অলস। সহজে মারা যায় না।'

'আমরা একটা মারতে পারি না? খাওয়ার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন।

কাঁধ ঝাঁকাল জুনো। 'তা হয়তো মারা যায়। রেমিংটনের দুটো গুলিতেই কাজ হবে। কিন্তু খেপে গেলে পুরো ঝাঁকটা আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। আরেকটা সমস্যা আছে।'

'কী?'

'একটাকে মেরে ফ্লোতে যদি তুলতেও পারি,' বলল জুনো, 'ওটার ছাল ছাড়াব কীভাবে? সিন্ধুঘোটকের চামড়া অত্যন্ত শক্ত, আমাদের কাছে অত ধারাল ছুরি নেই। ওগুলোর ফ্যাটি টিস্যু পাঁচ কি ছ'ইঞ্চি পুরু।'

ঝাঁক বাঁধা সিন্ধুঘোটকের দল যত কাছে চলে আসছে ততই জোরাল হচ্ছে বেল বাজার মত শব্দটা। ওটার সঙ্গে এবার যোগ হলো গা চাপড়ানো, ছলাৎ ছলাৎ পানি ছলকানো আর তীক্ষ্নস্বরের প্রলম্বিত চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ। এভাবেই পরিবেশ সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করে, আর যোগাযোগ রাখে

সিন্ধুঘোটকরা। ওগুলোর মাথা বিরাট হলে কী হবে, হাড় এত চওড়া যে মগজ খুবই ছোট।

প্রাণীগুলোর বিশাল বেঢপ আকৃতি, পানিতে ওগুলোর আড়ষ্ট নড়াচড়া, মনিকাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। আরও ভাল করে দেখবার জন্য ফ্লোর যতটা সম্ভব কিনারায় সরে এল ও, সবকিছু ভুলে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কম করেও পনের ফুট লম্বা ওগুলো। এত বেশি মোটা যে, ফিতে দিয়ে মাপলে চওড়ায় দশ ফুটের কম হবে না। গায়ের চর্বির স্তর মাথাকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। শক্তিশালী দুই কাঁধের মাঝখানে খাপে খাপে মাথাটা বসানো, কাঁধ দুটো নেমে এসেছে সরু নিতম্বে, তারপর যেন ওটাকে কেটেই তৈরি করা হয়েছে পিছনের ফ্লিপার দুটো—কোনও আকৃতি, কাঠামো, ফ্রেম, হাড় কিংবা এমনকী পেশি ছাড়াই।

অথচ মেরুন রঙের ভেলভেটসদৃশ চামড়া আর ছ'ইঞ্চি পুরু চর্বির নীচে অত্যন্ত শক্তিশালী পেশি আছে, যেগুলোর সাহায্যে যখন খুশি অসুরের শক্তি নিয়ে হামলা করতে পারে ওগুলো।

ঝাঁকের সামনের দলে কটা সিন্ধুঘোটক আছে গুণতে যাচ্ছে মনিকা, এই সময় ওর পিছন থেকে হঠাৎ একটা গর্জন ভেসে এল। চমকে উঠে ঘুরল ও।

ক্যাম্পের পিছনে, ফ্লোর কিনারায়, প্রায় ত্রিশ গজ দূরে, সিন্ধুঘোটকদের লিডার পানির উপর মাথা তুলেছে। ঝাঁকের সামনের পজিশন থেকে সাঁতরে পিছু হটেছে ওটা, উদ্দেশ্য ফ্লোটাকে পরীক্ষা করা। দাঁতগুলো নরম বরফে গেঁথে বিরাট শরীরটাকে সামনে টেনে আনছে, যতক্ষণ না সামনের ফ্লিপার ফ্লোর কিনারায় আটকাল, তারপর ফ্লোর উপরে উঠে এল।

নীল আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে বরফ, তার উপর অবিরাম নড়াচড়া আর শব্দ করছে ওটা, গা বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। একসময় স্থির হলো। নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসছে বিরাট মেঘ। ফ্লোর দূর

প্রান্তে অস্পষ্ট কয়েকটা আকৃতি দেখতে পেয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবার গর্জে উঠল লিডার, উঁচু হলো যতটা পারা যায়।

রানার আরেকটু কাছে সরে এল মনিকা, ভয় পাচ্ছে যদি কোনও বিপদ দেখা দেয়। তবে বুড়ো ষাঁড় ওদের দিকে একবার শুধু তাকাল, মানুষের গন্ধ পাওয়ায় প্রসারিত হলো ওটার নাকের ফুটো, ব্যস।

পানিতেও কম দেখে সিন্ধুঘোটক, ডাঙায় প্রায় অন্ধ, তবে ঘ্রাণশক্তি প্রবল। কোথাও কোনও হুমকি নেই দেখে সন্তুষ্ট লিডার আবার গর্জে উঠল, ঘুরল ধীরে ধীরে, দুই সুরে বেল-এর মত আওয়াজ ছাড়ল, তারপর ডাইভ দিল পানিতে।

এরপর ফ্লোর কিনারায় দাঁড়িয়ে অলসগতিতে ঝাঁকটাকে পাশ কাটাতে দেখল ওরা, সমতল বাদামী সাগরের পশ্চিমে চলে যাচ্ছে, ভাসমান অসংখ্য নীলাভ ফ্লোর মাঝখানে সচল একটা গাঢ় আকৃতি।

জুনোর হাতে এখন রেমিংটনটা রয়েছে। ওর দিকে হেঁটে আসছে রানা। সিন্ধুঘোটকদের চেঁচামেচি মিলিয়ে যাওয়ার পর নীরবতা নেমে এসেছে, পরস্পরের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা।

'জুনো, কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা। 'রাইফেল কেন?'

'না, ভাবলাম ও ব্যাটা যদি ফ্লোতে থাকতে চায়।'

'মানে?'

'ফ্লোতে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস আছে ওগুলোর,' বলল জুনো। 'বিশ্রাম নেয়, একটার ওপর একটা উঠে স্তূপ হয়ে থাকে। পথ খুব বেশি লম্বা হলে এভাবেই এগোয়।'

মাথা চুলকানোর একটা ঝোঁক চাপল রানার, ব্যাপারটা ওর জানা নেই। 'কী বলছ তুমি, জুনো?'

'দেখোনি? সংখ্যায় দুশ'র বেশি তো কম নয়, ঠিক? কল্পনা করো ওগুলোর অর্ধেক উঠে এসেছে; ফ্লোর কিছু আর রাখবে?

বরফ ভাঙবে, তলা দিয়ে ওঠা-নামা করবে, ফাটল ধরাবে, এক জায়গায় পাহাড় হবে। এককথায়, স্রেফ খুন করবে আমাদেরকে। জানো তো, চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত এর চেয়ে বড় ফ্লো আর নেই?'

জুনো থামতে সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু বলল না। নীরবতা ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অস্টিন, তারপর বলল, 'যাক, বাবা, আপদ বিদায় হওয়ায় আমি খুশি!'

কথাটা শেষ হতে সবাই ওরা অদৃশ্যমান ঝাঁকটার দিকে তাকাল। আর যেই না তাকিয়েছে, অমনি দুটো সিন্ধুঘোটক লাফ দিয়ে পানি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল। প্রায় দশ ফুট উঠল ওগুলো, কাগজের তৈরি ব্যাগের মত ফেটে যাচ্ছে।

আর্তনাদ করে উঠল মনিকা। ওর দিকে ছুটে গেল অস্টিন। কী হচ্ছে রানা আর জুনো জানে, নিঃশব্দে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল দুজন, দু'জোড়া চোখ সরু হয়ে আলোড়িত পানিতে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সিন্ধুঘোটকদের সামনে ওগুলোকে দেখতে পেল ওরা। বেশ কয়েকটা কালো সেইল ফিন। তীরচিহ্নের আকৃতি নিয়েছে ফিনগুলো। আরেকটা ঝাঁক। কিলার ওয়েইলরা ফিরে আসছে।

আর তারপরেই ঘুরে গেল সিন্ধুঘোটকের ঝাঁক। সাঁতারাবার উন্মত্ত ভাবটা এমন বিদঘুটে, যেন ধস্তাধস্তি করছে, আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে পরস্পরকে, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত, সর্বগ্রাসী প্রকাণ্ড ঢেউ হয়ে ফিরে আসছে ওগুলো।

বাইশ

ঘণ্টায় ত্রিশ নট গতিতে সাঁতরাচ্ছে কিলার ওয়েইলের লিডার, এই সময় প্রথম সিন্ধুঘোটকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। যদিও পানিতে প্রকাণ্ড শরীরটার কোনও ওজন নেই, তা সত্ত্বেও সংঘর্ষের প্রচণ্ডতা ওটার টার্গেটকে—সেটার ওজনও একটনের কম নয়—পানি থেকে প্রায় দশ ফুট শূন্যে তুলে ফেলল।

আচমকা অপ্রত্যাশিত হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সিন্ধুঘোটক। শূন্য থেকে তখনও খসে পড়তে শুরু করেনি, তার আগেই মারা গেল। প্রকাণ্ড শরীরটা নেমে এসে চারদিকে পানি ছিটাচ্ছে, এরইমধ্যে ওটার আরও তিন সঙ্গী একইভাবে মারা গেছে।

তিমিদের মেন্যুতে সিন্ধুঘোটক খুব একটা পছন্দের খাবার নয়, কারণ খেপে গেলে ওগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; তবে কোনও ঝাঁকে মহিলা আর বাচ্চার সংখ্যা বেশি থাকলে লোভ সামলানো খুবই কঠিন হয়ে ওঠে।

খুনি তিমির দল ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে হামলা চালাল, যেখানটা সবচেয়ে অরক্ষিত। তবে বয়স্ক আর তরুণ সিন্ধুঘোটকরা সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা হামলা চালিয়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলল, সাদা-কালো দুশমনকে তিন ফুটী বর্শার মত দাঁত দিয়ে গাঁথার চেষ্টা করছে।

সমস্ত ভয় আর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বিশটা সিন্ধুঘোটক আক্রমণে অংশ নিচ্ছে, চারটে ছাড়া সবগুলো তরুণ। আতঙ্কিত পরিবারগুলোকে পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছে আরও বিশটা।

তিমির দলের কয়েকটা তরুণ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল, উত্তেজনার বশে সাবধান হওয়ার কথা মনে রাখছে না। ভারী নারীদেহগুলোকে মন্থরবেগে নেমে যেতে দেখে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল ওগুলো।

তরুণদের একজনের বয়স পাঁচ, সিন্ধুঘোটকের বড় কোনও ঝাঁকে এটাই তার প্রথম হামলার অভিজ্ঞতা। ওটা জানে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ এই বয়সেই তার দেখবার সুযোগ হয়েছে খেপে গেলে কী করতে পারে সিন্ধুঘোটকরা। কিন্তু উত্তেজনার মাথায় দু'এক মুহূর্তের জন্য কথাটা ভুলে গেল ওটা।

মরা সিন্ধুঘোটকের কাঁধ থেকে প্রতিবার আধ মণ করে চর্বি আর মাংস ছিঁড়ে চিবাচ্ছে, গিলছে, প্রকাণ্ড লেজ ঝাপটে আর ফ্লিপার নেড়ে স্থির রাখছে নিজেকে, একই সঙ্গে নেমে যাচ্ছে সাগরের আরও নীচে।

দুটো পুরুষ সিন্ধুঘোটক একযোগে আক্রমণ করল ওটাকে। রিয়্যাক্ট করবারও সময় পেল না, প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ল। পিচ্ছিল মাথার ঠিক পিছনে, ঘাড়ের পেশিতে দাঁত ঢুকিয়ে দিল প্রথম সিন্ধুঘোটক। বিরাট বুকের সাহায্যে প্রচণ্ড চাপ দেওয়ায় তিমির মাংসের ভিতর দাঁতটা দু'ফুটেরও বেশি ঢুকে গেল।

দাঁত দুটো বাঁকা করল সিন্ধুঘোটক, মোচড়াল, তারপর হ্যাঁচকা টান দিল। তিমিটার ঘাড় ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে এল ওগুলো।

দ্বিতীয় সিন্ধুঘোটক দ্রুত সাঁতার কেটে ওটার তলায় চলে এল, তারপর ঝট করে প্রকাণ্ড ঘাড়টা একবার ঝাঁকিয়ে আইভরির তৈরি লম্বা ও ভোঁতা ছোরা ঘ্যাচ্ করে ঢুকিয়ে দিল পিচ্ছিল পেটের ভিতর, মাংস আর চর্বি চিরে নাড়িভুঁড়ি বেরুবার রাস্তা করে দিচ্ছে।

আরও কয়েকটা তিমি বিপদে পড়ল। সিন্ধুঘোটক নিধন বন্ধ

হয়নি, তবে হামলাকারীরাও আহত হচ্ছে। একদিকে একটা দাঁত এমন প্রচণ্ড বেগে টার্গেটে গাঁথল, ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল সাদা-কালো পিচ্ছিল মাথাটা; দ্বিতীয় দাঁতটা, এক ফুট ছোট, ব্যবহার করবার দরকারই হলো না।

আরেকদিকে দুটো শরীর মন্থরবেগে তলিয়ে যাচ্ছে, সদ্যমৃত তিমির গলায় গাঁথা রয়েছে সদ্যমৃত সিন্ধুঘোটকের আইভরি।

মেরুন রঙের প্রকাণ্ডদেহী প্রাণীগুলো রক্তাক্ত আর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ঠিকই, তবে তিমিরাও অক্ষত থাকছে না। এমনকী কিলারদের লিডারকেও বেশ কিছুক্ষণ কোণঠাসা করে রাখল তিন মহিলা, মাঝে মধ্যেই হামলা চালাল, বাঁকা দাঁত বসিয়ে ওটার মুখে আরও নতুন ক্ষত তৈরি করল।

একটার ঘাড় ভাঙল লিডার, বাকি দুটো পিছু হটছে দেখে ধাওয়া করল। চওড়া জিভে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে, উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। গতি বাড়িয়ে যেন একটা তুমুল ঘূর্ণির মধ্যে ফিরে এল লিডার—দু'দল হিংস্র জন্তু উদভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে, লাফাচ্ছে, পাক খাচ্ছে, মাংস ছিঁড়ছে।

সিন্ধুঘোটকদের সরদার, বয়স্ক ষাঁড়, যার বাম আইভরি এক ফুট ছোট, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল বিরাট একটা কাঠামো এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে দুটো তিমিকে পঙ্গু করেছে ওটা, একটাকে মেরে ফেলেছে। রক্তের মত ঘন ফেনার ভিতর দিয়ে নতুন শত্রুকে এগিয়ে আসতে দেখে মাথাটা প্রবল বেগে ঝাঁকাল, সর্বশেষ শিকারের মগজ আর আই-সকেট থেকে বের করে নিল লম্বা দাঁত।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল দুটো জন্তু, তারপর পরস্পরকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল। একসময় হামলা চালাল কিলার ওয়েইলদের লিডার। আত্মরক্ষার জন্য মাথাটা পিছিয়ে নিয়েছে, একই সঙ্গে আক্রমণও চালিয়েছে।

প্রতিপক্ষ মাথা সরিয়ে নেওয়ায় পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে

লিডার, তেরছাভাবে চালানো দাঁতটাকে মাত্র এক ইঞ্চির জন্য এড়াতে পারল। কিন্তু লিডারের গায়ে দাঁতটা গাঁথতে ব্যর্থ হয়ে থেমে থাকেনি সরদার, পিছু নিয়ে হামলে পড়ল শত্রুর উপর।

লিডার এটা আশা করেনি, কাজেই প্রস্তুত ছিল না। সরদার সিন্ধুঘোটক দ্রুতগতিতে ছুটে এল, খুলির শক্ত হাড় দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল ওটার পাঁজরে। বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেল লিডারের ফুসফুসের বাতাস। আকস্মিক আঘাতটা অসুস্থ করে তুলল ওটাকে, আচ্ছন্ন বোধ করছে, চেষ্টা করছে সারফেসে ওঠার —অন্তত কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণ অসহায়।

বুঝতে পেরে বিদ্যুৎবেগে একটা ডিগবাজি খেল সরদার, তীরবেগে সাঁতরে লিড়ারের অরক্ষিত পেটের নীচে চলে আসছে, দাঁত দিয়ে চিরে নাড়িভূঁড়ি সব বের করে আনবে।

কাছেই রয়েছে লিডারের সঙ্গিনী, প্রেমিকের বিপদ দেখতে পেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠল, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে দ্রুত প্রেমিক আর সিন্ধুঘোটকের মাঝখানে চলে এল, নিজের বিপদের কথা মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

তবে সিন্ধুঘোটকের কাছাকাছিও আসতে পারেনি ওটা, তার আগেই তরুণ এক তিমি লিডারকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে এল। এটাও শুধু লিডারের নিরপত্তার কথা ভাবছে, নিজের বিপদের কথাটা মাথায় রাখছে না, ফলে কঠিন মাসুলও দিতে হলো—সরদারের দাঁত ঘ্যাচ্ করে সেঁধিয়ে গেল ওটার পেটে।

আইভরির ভোঁতা ছোরা একটা দিক চিরে দিতে রক্ত আর বুদ্বুদের বিরাট মেঘ তৈরি হলো। ধীরে ধীরে চিৎ হলো তরুণ তিমি, শক্ত কাঠ হয়ে আছে গোটা কাঠামো, চেরা পেট থেকে নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসছে।

এবার বয়স্ক ষাঁড় লিডারের প্রেমিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য ঘুরল। লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে প্রেমিকা, নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সঙ্গীকে সুস্থ হওয়ার সময় পাইয়ে

দিতে চায়। তবে তার আর দরকার হলো না, ওদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধটা বাধার আগেই সুস্থ হয়ে রণক্ষেত্রে ফিরে এল লিডার।

আবার মুখোমুখি হলো ওরা দুজন, মাঝখানে পাঁচ ফুটের একটু বেশি ব্যবধান। চারপাশে এখনও তুমুল যুদ্ধ চলছে, তবে সেদিকে ওগুলোর খেয়াল নেই, পানির ভিতরে নিজেদেরকে স্থির রেখে অপেক্ষা করছে, আশা করছে প্রথম হামলাটা প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আসবে।

তারপর দুটোই একযোগে এগোল। সিন্ধুঘোটক আবার নিজের মাথা পিছনদিকে কাত করল, তাকিয়ে আছে নাকের বিরাট ব্রিজ-এর উপর দিয়ে। পিচ্ছিল মাথাটা নোয়াল কিলারদের লিডার, গতি বাড়িয়ে সামনে ঠেলে দিল প্রকাণ্ড শরীর, হাঁ হয়ে গেল মুখ, যেন প্রতিপক্ষের গলা কামড়াতে যাচ্ছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলল সিন্ধুঘোটকদের সরদার, তিমির দাঁত থেকে বুক আর গলা রক্ষা করবার জন্য নিচু করল চিবুকটা। রণকৌশল বদলে সরদারের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল লিডার, কারণ জানে ওটাই প্রতিপক্ষের একমাত্র দুর্বল জায়গা।

প্রকাণ্ড, মসৃণ কাঠামোটা মোচড়াল লিডার, তারপর সরদারকে নিয়ে আরও নীচের দিকে নামতে শুরু করল, খেয়াল রাখছে উন্মত্তভাবে চালানো আইভরির ছোরা যাতে গায়ে কোথাও না লাগে।

বুড়ো ষাঁড় আগে থেকেই হাঁপাচ্ছিল, একটু পরেই দম ফুরিয়ে গেল ওটার। ধস্তাধস্তি বন্ধ করল সরদার, ফুসফুস থেকে বেরুনো বাকি বাতাস সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে। একই অলসগতিতে ওগুলোর পিছু নিল কিলার ওয়েইলদের লিডার।

রণক্ষেত্রে এখন আর যুদ্ধ হচ্ছে না, পালানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ত্রিশটা সিন্ধুঘোটক মারা গেছে, কিংবা এমন গুরুতর জখম হয়েছে যে সাঁতরাতে পারবে না। তিমি মারা গেছে পাঁচটা।

ছোট ছোট পরিবারে ভাগ হয়ে প্রাণ হাতে করে পালাচ্ছে সিন্ধুঘোটকরা, পাহারায় রয়েছে বয়স্ক ও তরুণরা। কাছাকাছি একটাই মাত্র আশ্রয় দেখতে পাচ্ছে ওগুলো—সবচেয়ে বড় ফ্লোটা।

খুনের নেশা এখনও কিছুমাত্র মেটেনি, হিংস্র বাঘের মত ওগুলোকে ধাওয়া করল কিলার ওয়েইলের দল। ফ্লোর পুবদিকের বাদামি পানিতে খয়েরি ও মেরুন রঙের মাথা আর ঝিকিয়ে ওটা দাঁত গিজগিজ করছে। বাতাস ভরাট হয়ে উঠল সিন্ধুঘোটকদের চেঁচামেচিতে। শক্ত বরফের নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে ওগুলো।

গোটা ব্যাপারটা খেয়াল করল তিমিদের লিডার। তবে ওটার জানা নেই প্রধান শত্রু মানুষের দলটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, ওর হামলায় তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গেছে তারা ওই ফ্লোতে রয়েছে এখনও। হিংস্র উল্লাসে তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার ছাড়ল লিডার, তারপর দলের সঙ্গে সে-ও ফিরে এল হামলায়।

এরপর পাঁচ গজের মত সাঁতরেছে ওটা, এই সময় প্রথম গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

তেইশ

'হায় যিশু!' গলা ফাটাল অস্টিন। 'ফিরে আসছে ওগুলো!' ছুটে বরফের কিনারায় চলে এল ও, আলোড়িত পানির দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ঢোক গিলছে।

জুনোও সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছে, এত নিচু গলায় যে ওর প্রার্থনা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। এস্কিমোরা অত্যন্ত বাস্তববাদী,

তারা জানে প্রার্থনার সঙ্গে তৎপরতা যোগ না হলে কোনও ঈশ্বরই খুব একটা মূল্য দেন না সে-প্রার্থনার। কাজেই ঠোঁট যেমন নড়ছে তেমনি নড়তে থাকল, ঘুরে সাপ্লাই তাঁবুর দিকে ছুটল ও, রাইফেল বের করবে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই মনিকার, জুনোকে প্রশ্ন করল, 'কী করছেন আপনি?'

'আমি তো আগেই বলেছি। ওগুলো আমাদের ফ্লো টুকরো টুকরো করে ফেলবে। স্রেফ মারা যাব আমরা। কোনওভাবেই ওগুলোকে কাছে আসতে দেয়া যাবে না।'

রানার দিকে ফিরল মনিকা। 'রানা, আমরা কি সত্যি...' কিন্তু দেখল, প্রথম তাঁবুটার দিকে এগোচ্ছে রানা, যেখানে ওদের কাপড়চোপড় আছে।

মনিকার প্রশ্ন ছিল, না জেনে না বুঝে দুটো শক্তির মাঝখানে পড়ে যাওয়া বেচারি সিন্ধুঘোটকদের কি সত্যি মেরে ফেলতে হবে?

পুরো প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরুবার আগেই রানার জবাব ভেসে এল, 'হ্যাঁ। আর কোনও উপায় নেই। জুনো ঠিক বলছে, কাছে আসতে দেয়া যাবে না। এসো, গরম কাপড় বের করি। কাজটায় অনেক সময় লাগতে পারে। জলদি!'

ঘুরে অস্টিনের উদ্দেশেও হাতছানি দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ছিল, দেখতে পেয়ে হোঁচট খেতে খেতে ওদের দিকে এগোল, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ওর জন্য অপেক্ষা করল ওরা, কাছে আসতে তিনজন একসঙ্গে স্যাঁতসেঁতে গরম কাপড়গুলো সংগ্রহ করবার জন্য এগোল।

এখানে ওরা যখন কাপড় পরছে, দ্বিতীয় তাঁবুতে জুনো তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। ঝড়-বৃষ্টির সময় সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্রই এখানে নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে ওর কাঁধে রয়েছে একটা রেমিংটন। বাকি দুটো চেক করল ও, রেমিংটন ও

ওয়েদারবাই। দু'টোই ফুল লোড করা।

প্রতিটি রাইফেলের জন্য বিশটা করে শেল নিল জুনো।

সবশেষে প্রতিটি কারবাইনের মেকানিজম চেক করছে, নিশ্চিত হতে চায় অ্যাকশন ফ্রি আছে কি না। সব মিলিয়ে ছয়টা অস্ত্র। যা দরকার তারচেয়ে অনেক কম।

প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সম্ভাবনা নিয়েও দ্রুত মাথা ঘামাচ্ছে জুনো। জানা কথা, কারবাইনগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলেও সবগুলো সিন্ধুঘোটককে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না ওরা, বেশ কিছু উঠে পড়বে ফ্লোতে। কাজেই সামনাসামনি যুদ্ধ করবার জন্যও কিছু দরকার হবে ওদের।

তিনটে চকচকে রুপালি হার্পুন বের করল জুনো, আগেয়াস্ত্রের পাশে ওগুলোকেও শুইয়ে রাখল। প্রয়োজনে কুড়ালও ব্যবহার করতে পারবে ওরা, ভাবল ও, বিশেষ করে কারবাইন যদি জ্যাম হয়ে যায়।

দ্রুত কাপড়চোপড় পরে তাঁবুটা থেকে বেরিয়ে এল রানা আর মনিকা, ওদের পিছু নিয়ে অস্টিনও। নতুন সাপ্লাই তাঁবু, অর্থাৎ টয়লেটের দিকে এগোচ্ছে ওরা; দেখল সেটা থেকে বেরিয়ে এল জুনো, কাঁধে আর দু'হাতে একটা করে তিনটে রাইফেল।

'কারবাইন আনো, দোস্ত। আমি কাপড় পরে আসি,' রানাকে বলল জুনো, লাফাতে লাফাতে এগোল প্রথম তাঁবুর দিকে।

'এই, তোমরা—কারবাইন!' নির্দেশের সুরে কথাটা বলে ভেঙে পড়া প্রথম সাপ্লাই তাঁবুর দিকে এগোল রানা। কিছু জিনিস এখনও আছে ওখানে, সব টয়লেটে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

নিজের জায়গায় অটল দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্টিন, সরু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুসরণ করছে রানাকে।

তবে নির্দেশটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছে মনিকা। 'এসো, অস্টিন!' কাঁধের উপর দিয়ে পিছনদিকে তাকিয়ে তাগাদা দিল ও। এতক্ষণে পিছু নিল অস্টিন।

সাপ্লাই তাঁবুর ভিতর বুট জুতোর স্তূপ সরিয়ে কুণ্ডলী পাকানো এক প্রস্থ রশি খুঁজছে রানা। বেশ অনেকটা রশি নেটটাকে জায়গামত ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয়েছে। পরে জুনোর সাহায্য নিয়ে ফ্লোটাকে কয়েক জায়গায় বেঁধেছে রানা, ওটার অংশবিশেষ যাতে ভেঙে বেরিয়ে না যায়; তাতেই বেশিরভাগ রশি খরচ হয়ে গেছে।

তারপরেও বড় একটা কুণ্ডলী পাওয়া গেল। ওটাকে কাঁধে নিয়ে সাপ্লাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা।

যে তাঁবুর ভিতর কাপড় পরছে জুনো ওটার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে রাইফেল তিনটে। অস্টিনের হাতে দুটো কারবাইন দেখল রানা, মনিকার হাতে একটা কারবাইন ছাড়াও রয়েছে অ্যামিউনিশনের বাক্স।

ওদের সামনে বরফের উপর রশির ভারী কুণ্ডলীটা ফেলল ও। ‘চল্লিশ ফুটী করে দুটো টুকরো দরকার আমার, জলদি!’ বলে হার্পুন আনতে চলে গেল আবার।

আবারও মনিকাই প্রথমে নড়ে উঠল। রাইফেলের পাশে কারবাইন আর অ্যামিউনিশন নামিয়ে রেখে কুড়ালটা তুলে নিল হাতে। একপাশের নেট বিশ ফুট এগিয়েছে, রশিটাকে ওই মাপের দ্বিগুণ করে নিয়ে কাটল। আরেক প্রস্থ কাটছে, ওদের স্লিপিং তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল জুনো।

‘কী করছেন আপনি?’ চেঁচিয়ে উঠল ও, গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে; আতঙ্কিত সিন্ধুঘোটকদের চেঁচামেচি, কাতর গোঙানি, করুণ কান্নাকে ছাপিয়ে উঠল।

‘রশি কাটছি, রানা বলল।’

নতুন সাপ্লাই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা, হাতের হার্পুনগুলো চকচক করছে। মনিকার কাজ শেষ হয়ে এসেছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল, বলল, ‘গুড। এবার তিন টুকরো. একেকটা বিশ ফুটী।’

দ্রুত আবার রশি কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছে মনিকা।

'আমাদের কি অত সময় আছে?' জিজ্ঞেস করল জুনো, হাত তুলে লাল বুদ্বুদ আর ফেনায় ভর্তি রণক্ষেত্রটা দেখাল, আকারে ক্রমশ বড় হয়ে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে যেন বিশাল কোনও তুষারধ্বস।

'না হলেই নয়,' বলল রানা। 'বড়গুলো নিজেদের কোমরে বাঁধব আমরা। তুমি অস্টিনকে নাও, আমি নিচ্ছি মনিকাকে। এতে করে কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য পাওয়া যাবে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জুনো।

রানা ও মনিকা পাশাপাশি দাঁড়াল, নিজেদের কোমরে রশি জড়াচ্ছে। প্রতিবার ওদের একযোগে নড়ে ওঠার মধ্যে সুষ্ঠু ছন্দ আছে, আছে দৃষ্টিনন্দন সাবলীল ভঙ্গি, তাকাবার পর জুনো আর চোখ ফেরাতে পারছে না। সবার অলক্ষ্যে গত কয়েকদিনে ওদের দুজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটে গেছে, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন সারাজীবন এভাবেই একসঙ্গে কাজ করে আসছে।

জুনো ভাবল, ওরা বোধহয় এখনও টের পায়নি যে রশি ছাড়াও আরও শক্ত কিছুর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে দুজন।

ঘুরে আরেক প্রস্থ রশি তুলে নিল জুনো। সেটার অন্য প্রান্ত এরইমধ্যে নিজের কোমরে জড়াতে শুরু করেছে অস্টিন।

মনিকার দিকে একবার তাকাল রানা, স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা যত্নের সঙ্গে নিজের কোমরে রশি জড়াচ্ছে, ক্ষীণ হাসির সূক্ষ্ম রেখা ফুটে আছে ঠোঁটের কোণে, সরু ফাঁকের ভিতর ঝিলিক দিয়ে উঠল মুক্তোর মত সাদা দাঁত।

কয়েক পা হেঁটে এসে ওয়েদারবাই আর একটা কারবাইন তুলে নিল জুনো। ঘুরে কারবাইনটা অস্টিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। মাথা নাড়ল অস্টিন, জুনোকে পাশ কাটিয়ে এসে একটা রেমিংটন তুলল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওকে কিছু শেল দিল জুনো।

ফ্লোর পুব কিনারায়, সাগর আর ক্যাম্পের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ওদের মাঝখানে বরফের উপর পড়ে রয়েছে কুণ্ডলী পাকানো রশি।

কারবাইন আর পাঁচ ক্লিপ বুলেট নিল রানা। মনিকাও তাই নিল।

ফায়ার-ট্রেটাকে পাশ কাটাবার সময় কুড়ালটাও তুলে নিল রানা, কোমরে পেঁচানো রশির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। ওর পিছু নিয়ে মনিকা তুলল হার্পুন আর এক প্রস্থ খাটো রশি। রশিটা হারপুনের শেষপ্রান্তের সঙ্গে বাঁধল, তারপর লূপ তৈরি করে কবজিতে পরল। ওরা দুজন ফ্লোর উত্তর প্রান্তের দিকে যাচ্ছে।

সাগরে—এতই কাছে যে দম আটকে এল ওদের—সিন্ধু-ঘোটকের ঝাঁক এমন চিৎকার করছে যেন আকাশটাকে ভেঙে ফেলবে। সব মিলিয়ে একশ' সত্তরটা এখন, শিশুদের বাদ দিয়ে। ধীরগতিতে সাঁতার কাটছে ওগুলো, চাইছে না দলের কেউ পিছিয়ে পড়ুক; আসছে সোজা, কোনও রকম দ্বিধা ছাড়াই, জানে সামনের ওই ফ্লোটায় উঠতে পারলে বাঁচার একটা উপায় হয়।

হঠাৎ করে, ওগুলোর পিছনে, প্রকাণ্ড সাদা-কালো একটা কাঠামো পানি থেকে শূন্যে উঠে এল; চারদিকের সমস্ত চেঁচামেচি আর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল বিকট গর্জন, কিলার ওয়েইলের লিডার লাফ দিল সামনের দিকে।

ফায়ার ওপেন করল ওরা। রানার এক হাঁটু বরফে গাঁথা, কারবাইনের সিলেক্টর অটোমেটিকে দিয়ে সিন্ধুঘোটকদের দিকে গুলি করছে, চেষ্টা করছে দলটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

তবে ওয়েদারবাই দিয়ে লক্ষ্যস্থির করবার পরেই শুধু ট্রিগার টিপছে জুনো, ঠিক একজন মার্কসম্যানের মত। ওর ফায়ারের প্রতিটি গর্জনের সঙ্গে একটা করে মাথা লাফিয়ে উঠছে, ওটার চারধারে মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল লালচে বলয় তৈরি হচ্ছে, তারপর ডুবে যাচ্ছে পানিতে।

রেমিংটন দিয়ে অস্টিনও তা-ই করছে, তবে ওর লাল বলয়ের সংখ্যা কম, মারা যাচ্ছে দু'একটা। নিজের কারবাইনটাকে সিঙ্গেল শট-এ রেখেছে মনিকা, গুলি করছে শান্ত ও নিখুঁতভাবে।

ঝাঁকটা ইতস্তত করছে। দু'একটা পিছন ফিরল, কিন্তু পরমুহূর্তে ঘুরল আবার। প্রথম ক্লিপ খালি করল রানা, দ্রুত আরেকটা ভরল। ইতিমধ্যে একেবারে কাছে চলে এসেছে সিন্ধুঘোটকরা। চট করে একবার মনিকাকে দেখে নিল ও।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, ধড়টা একদিকে সামান্য ফেরানো, প্রফেশনালদের মত একটু ঝুঁকে গুলি করছে। মাথা ঝাঁকাল রানা, নিঃশব্দে হাসল, নিজের কারবাইন ফিরিয়ে আনল কাঁধে। সিলেক্টর টেনে এনে প্রতিবার তিন কি চারটে করে গুলি ছুঁড়ছে।

পানি থেকে উঠছে আর ডুবছে, আড়াআড়ি লাইনে অনেকগুলো মাথা, সাইটে ওই সারিটাকে ধরে রাখছে রানা, ট্রিগার টিপে মাজল্ সরিয়ে নিচ্ছে এক পাশ থেকে আরেক পাশে। প্রতিটি টার্গেট বিস্ফোরিত হয়ে আকৃতিহীন স্তূপে পরিণত হলো, আইভরিগুলো কাত হয়ে পড়ল গাছের মত।

দ্বিতীয় ক্লিপটা ছুঁড়ে ফেলল রানা, নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইছে না অনেক আগেই পানিতে ভরে উঠেছে ওর চোখ। গা-টা বমি বমি করছে ওর। ওহ্, আল্লাহ, কী ভয়ঙ্কর একটা কাজ করছে ওরা! ওদের কি কোনও অধিকার আছে এই আড়ষ্ট, অদ্ভুত সুন্দর প্রাণীগুলোকে এভাবে খুন করবার?

রানার বিবেক ইতস্তত করছে, তবে হাত দুটো নয়। এমনকী প্রশ্নটা যখন তৈরি হচ্ছে মনে, ওর শরীর একবিন্দু দ্বিধা না করে আবার রিলোড করল কারবাইন। প্রশ্নটা তৈরি করে মন যখন উত্তরের জন্য স্থির হলো, ততক্ষণে ওটার স্টক আবার কাঁধে উঠে গেছে, ডান হাতের তর্জনী টিপে ধরেছে ট্রিগার।

মনিকার মনটা খালি হয়ে গেছে। আগে কখনও কিছু মারেনি

ও, মারতে কখনও চায়ওনি। তিমিগুলোর উপর রাগ হওয়াতেও এক ধরনের অপরাধ বোধে ভুগছে। অথচ একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে অভ্যস্ত, অভিজ্ঞ শিকারির মত। কাজটা কেন করছে ও? সারভাইভ করবার জন্য? নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে? *রানাকে সাহায্য করবার জন্য?*

শেষ প্রশ্নটা রীতিমত ঝাঁকি দিল ওকে। ঝট করে ওর দিকে তাকাল মনিকা; রানাও ফিরল ওর দিকে, দুজনের দৃষ্টি এক হলো।

পানির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উঠে এল একটা সিন্ধুঘোটক, মনিকার ডান বুট থেকে মাত্র তিন ফুট দূরের বরফে আইভরি গাঁথল। আঁতকে উঠল ও, ভয়ে চেঁচাচ্ছে। পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেল, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল বরফের উপর। কোমরের কাছে ধরা কারবাইনটা অনায়াস ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ওটার মাথার বেশিরভাগটাই উড়িয়ে দিল রানা।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল মনিকা, সময় নষ্ট না করে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু কাঁধে রাইফেল তুলে হকচকিয়ে গেল ও, কারণ টার্গেট পাওয়ার জন্য সরাসরি নীচের দিকে তাক করতে হচ্ছে ওকে। সিন্ধুঘোটকরা ওর পায়ের কাছে চলে এসেছে! শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

কোমরে বাঁধা রশিতে হ্যাঁচকা টান অনুভব করল মনিকা। পিছনদিকে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে রানা, ওর সঙ্গে সে-ও আছাড় খেল। মাত্র একটা সিন্ধুঘোটক ছিল বরফের কিনারায়, ওটার লাশ নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত নিজের পজিশনে জমে আছে, তারপর অকস্মাৎ এক পলকের মধ্যে ওখানে জড়ো হলো আরও বিশটা।

ওগুলো একযোগে বিস্ফোরিত হলো, বিরাট আইভরিগুলো সজোরে গাঁথল বরফের কিনারায়, সেই ধাক্কায় দুলে উঠল ওদের ফ্লো। আওয়াজটা রোমহর্ষক। বরফের উপর উঠে বসে কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে রানা।

নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে বসল মনিকাও, হাতের অস্ত্র ঘুরিয়ে মেরুন-ব্রাউন রঙের পাঁচিল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপছে। অনেক সিন্ধুঘোটক উঠে আসছে ফ্লোর উপর, কিনারায় ফ্লিপার আটকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিরাট শরীর, বরফে আবার গাঁথার জন্য উঁচু করছে আইভরি।

প্রথম সারির সিন্ধুঘোটকরা এখনও পানিতে ডুবে আছে অর্ধেকটা। বুলেটের ক্ষত নিয়ে মন্থর হয়ে পড়েছে বেশ কটা। এই সময় পৌঁছে গেল দ্বিতীয় সারি। আতঙ্কে উদভ্রান্ত হয়ে আছে ওগুলো, সেই আতঙ্ক প্রথম সারির মধ্যেও এক নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় সারি পানি থেকে মাথা তুলল ঠিকই, কিন্তু দখল করবার মত বরফের কিনারা খালি না পেয়ে সামনের সারির সিন্ধুঘোটকদের পিছনে দাঁত বিঁধাতে শুরু করল। তারপরে একটার উপর একটা চড়ে যত দ্রুত পারা যায় সামনে এগোল ওগুলো।

রানা ও মনিকা স্থির হয়ে গেল। প্রথম সারিকে টপকে সামনে চলে আসছে দ্বিতীয় সারি। কাজটা তখনও শেষ হয়নি, এবার পৌঁছে গেল সিন্ধুঘোকটদের তৃতীয় সারি। ওগুলোও সামনে যেটাকে পাচ্ছে সেটার পিছনে আইভরি গেঁথে নিজেদের পথ করে নিচ্ছে, বাধা সরিয়ে দাঁত বসাচ্ছে বরফের কিনারায়।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভরে উঠল বাতাস। পিছনের সারি আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে, সামনের দুটো সারি—ওগুলোর মধ্যে যারা এখনও বেঁচে আছে—তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার যখন ফায়ার শুরু করল রানা ও মনিকা, ততক্ষণে ওদের সামনের বরফে প্রায় পঞ্চাশটা সিন্ধুঘোটক উঠে এসেছে। আতঙ্কিত ও দিশেহারা, আড়ষ্টভঙ্গিতে সামনে চলে আসছে ওগুলো: তবে নাগালের মধ্যে পেলে হয় দাঁত দিয়ে গেঁথে, নয়তো শরীর দিয়ে চেপে মেরে ফেলবে ওদেরকে।

চব্বিশ

জুনো আর অস্টিন ভাগ্যবান। প্রফেসর মনসুর যেখান থেকে হারিয়ে গেছেন, সেই পাহাড়ের ঢালটা ওদের সামনের কিনারা বরাবর আড়াআড়িভাবে নেমে গেছে। গুলি করবার জন্য ভাল একটা পজিশন পেয়েছে ওরা; শুধু তাই নয়, সামনে স্বচ্ছ পাঁচিল পড়ায় ওটায় চড়ার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না সিন্ধুঘোটকরা।

ফ্লোর উত্তর প্রান্তে রানা যেখানে পজিশন নিয়েছে, সিন্ধুঘোটকের ঝাঁকটা ওখানে পৌঁছাচ্ছে দেখেই পিছাতে শুরু করল জুনো, উদ্দেশ্য ফ্লোর বাকি কিনারাগুলোকে কাভার দেওয়া।

কিন্তু রক্তপিপাসা মেটাতে এমনই মগ্ন হয়ে উঠল অস্টিন, এস্কিমো জুনোর গতিবিধি খেয়াল করল না, এমনকী কোমরে বাঁধা রশির জরুরি টানেও সাড়া দিল না।

অস্টিন যদি দ্রুত সরে আসত, ফ্লোর তলা দিয়ে ওগুলোর উঠে আসা হয়তো ঠেকাতে পারত ওরা, কিংবা হয়তো পারত না। সে যাই হোক, ওরা যখন তাঁবুগুলোর দক্ষিণে পৌঁছাল, দেখল রানা আর মনিকার সামনে যা ঘটছে এখানেও সেই একই দৃশ্য, ক্যাম্প থেকে মাত্র দশ গজ দূরে।

ওদিকে কারবাইনে ক্লিপ ভরার সময় কোমরে জড়ানো রশিতে খুব জোরাল ঝাঁকি অনুভব করল রানা। লম্বা অস্ত্রটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে পিছলে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, শূন্যে অর্ধবৃত্ত তৈরি করছে ক্লিপ।

মনিকার দিকে নয়, ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ঝাঁকটার দিকে

তাকাল রানা, দেখল একটা ষাঁড় হামলা চালিয়েছে—জোড়া আইভরি ওর বুক বরাবর উঠে এসেছে, ওকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবার জন্য তৈরি।

ষাঁড়টা সম্ভবত সতেরো ফুট লম্বা। ফ্লিপার থেকে মাথা ছ'ফুটেরও বেশি। দাঁত দুটো লম্বায় চার ফুট। ওজন হবে দু'টনের কিছু কম। জন্তুটা ওকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে।

রানার মাথার ভিতর চিন্তার ঘূর্ণি বইছে। কোমরের রশি থেকে এক ঝটকায় কুড়ালটা টেনে নিল ও, তারপর ষাঁড়টার দিকে লাফ দিল। যেন একটা ট্রেন আর একটা প্রাইভেট কার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, ভেজা দাঁত দুটো ওর বুকে সেঁধোবার ঠিক আগে, একপাশে ডাইভ দিল রানা। বরফের উপর পা দুটো এদিক-সেদিক পিছলাচ্ছে, তারই মধ্যে শরীরটাকে মোচড়াল ও, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতের কুড়াল নামিয়ে আনছে ওটার কাঁধের উপর, উদ্দেশ্য কাঁধ আর মাথার মাঝখানে আঘাত করে শিরদাঁড়াটা গুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু বরফে পা পিছলে যাওয়ায় লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো রানা। ওর হাতের মুঠোয় ঘুরে গেল কুঠারের হাতল; ভারী ও ধারাল ফলা নয়, উল্টোদিক লাগল ওটার কাঁধে, প্রায় কোনও ক্ষতিই করতে পারল না।

হাতলটা সোজা করে ধরছে, এই সময় ওর দিকে ঘুরে আবার হামলা চালাল হিংস্র সিন্ধুঘোটক। এবার রানা ডাইভ দিয়ে সরে গেল না। কুড়ালটা চার ফুট লম্বা, হাতটা লম্বা দু'ফুটেরও বেশি—নাগাল পাওয়ার জন্য সিন্ধুঘোটকের চেয়ে দু'ফুট বেশি পাচ্ছে ও।

নিজের জায়গায় অটল দাঁড়িয়ে থেকে হামলাটা ঠেকাল রানা, হাতের কুড়াল আসুরিক শক্তিকে নামিয়ে আনল ষাঁড়ের দু'চোখের ঠিক মাঝখানে। ওখানেই ঢলে পড়ল জন্তুটা, ওর বুটের কয়েক ইঞ্চি দূরে বরফ ভেঙে ভিতরে বেশ খানিকটা সেঁধিয়ে গেল দাঁত

দুটো।

ঝাঁকি দিয়ে কুড়ালটা ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সিন্ধুঘোটকের প্রকাণ্ড কপালে আটকে থাকল ওটা। বার কয়েক হ্যাঁচকা টান দিয়েও এক ইঞ্চি নড়ানো গেল না। শেষ চেষ্টা হিসাবে ঘুরে আরেকদিকে চলে এসে হাতলটার মাথার দিকটা ধরল রানা, চাপ দিয়ে দেখবে কোনও লাভ হয় কি না।

সিন্ধুঘোটকের গা প্রায় দশ ফুট উঁচু পাঁচিলের মত পড়ে আছে ওর সামনে। বরফে পা দুটো শক্তভাবে বাধিয়ে হাতলটা টানতে শুরু করল রানা। এই সময় প্রথম কিলার ওয়েইলটা পানি থেকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল, তারপর শরীরটাকে মুচড়ে সরাসরি সিন্ধুঘোটকদের স্তূপে নামল। ছিঁড়ে, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে ওগুলোকে।

দোল খাচ্ছে ফ্লো, সেই সঙ্গে একটু নিচু হলো। আবার পড়ে গেল রানা, পিছলে কিনারার দিকে চলে যাচ্ছে। ওর কাছ থেকে ত্রিশ ফুট পিছনে মনিকা, ওদের এই দূরত্ব রশিটাকে টান টান করতে পারেনি। রানা পিছলে দূরে সরে যাচ্ছে, চোখের কোণ দিয়ে সেটা দেখামাত্র মনিকা বুঝল এরপর কি হবে।

রশিতে টান পড়বে, পরমুহূর্তে বরফের উপর ছিটকে পড়তে হবে ওকেও, পিছলে পৌঁছে যাবে সিন্ধুঘোটকদের স্তূপে, কিংবা হাঁ করা তিমিটার পেটে—রানার চেয়ে দু'চার সেকেন্ড পর। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বরফে হাঁটু গাড়ল মনিকা, ঝট করে হাতের কারবাইন নরম বরফে গেঁথে ওটার উপর নিজের পুরো ওজন চাপিয়ে দিল।

রশিতে টান পড়তে থামল রানা। কিলার ওয়েইল নেমে গেল পানিতে।

রানার পা সিন্ধুঘোটকদের পাহাড় থেকে মাত্র দু'গজ দূরে। শরীরটাকে মোচড়াল ও, পায়ে বরফ বাধাল, খপ করে ধরল কুড়ালটা, তারপর এক লাফে দাঁড়াল। ইস্পাতের ফলা আগেই

মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এলোমেলো পা ফেলে ওখান থেকে সরে আসছে রানা।

কিলার ওয়েইলদের লিডার আর তার সাঙ্গিনী এবার উঠে আসছে পানি থেকে, পিছু নিয়ে দলের বাকি সদস্যরাও। সিন্ধুঘোটকদের অস্থির স্তূপ যেন আতঙ্কিত চিৎকার আর আর্তনাদ তৈরির কারখানা, তিমিগুলো সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাইকারী হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠল—গুঁতো মারছে, জ্যান্ত সিন্ধুঘোটকের মাংস ছিঁড়ে চিবাচ্ছে, কামড়ে ছিন্নভিন্ন করছে।

হঠাৎ রানা দেখল প্রায় হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মনিকার দিকে ছুটল। ওর পিছনে সিন্ধুঘোটকদের তৈরি চঞ্চল পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছে, এখন সেটা মস্ত ঢেউ; বুড়ো সরদারের লাশটাকে ঢেকে ফেলে ওদের দিকে তীরবেগে ছুটে আসছে সেই ঢেউ।

এখনও ছুটছে রানা, জানে ঢেউটা ওর নাগাল পাওয়া মানেই নির্ঘাত মৃত্যু। মাথার ভিতর ঝড় বইছে—কী করা যায়, কী করা যায়!

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল সিন্ধুঘোটকদের ঢেউ ওর নাগাল পেতে যাচ্ছে! হায় আল্লাহ, এখন কী হবে! নিজে তো মরবেই, মনিকাও বাঁচবে না।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত আইডিয়াটা ঢুকল মাথায়। স্মোকবম্!

ছুটতে ছুটতেই হাতঘড়ির গায়ে বসানো দুটো বোতামে পরপর কয়েকটা চাপ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির কিনারা খুলে গিয়ে টুপ করে একটা ক্যাপসুল ঝরে পড়ল।

শূন্যে থাকতেই ওটাকে লুফে নিল রানা। নড়াচড়ায় একবিন্দু বিরতি না দিয়ে খুদে পিন খুলেই পিছনের সিন্ধুঘোটকদের তৈরি পাঁচিল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল ক্যাপসুলটা।

ঢেউটার উপর পড়ে নীলচে ধোঁয়া উদ্গিরণ শুরু করল স্মোকবম্। তিন কি চার সেকেন্ড পার হলো, কিছুই ঘটল না।

তারপর ঘাড় ফেরাতে রানা দেখল মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে সিন্ধুঘোটকরা। বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে ওগুলো, বেশিরভাগই এখন ঘুমিয়ে পড়বে, মারাও যাবে কিছু।

সিন্ধুঘোটকরা ধাওয়া করছে না, সেজন্য স্বস্তি বোধ করবে কী, হঠাৎ রানা খেয়াল করল একটা ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে ও। আতঙ্ক আরও বাড়ল, কীভাবে এ-সব সম্ভব হচ্ছে জানে না।

বাজ পড়ার মত বিকট আওয়াজ ঢুকল মনিকার কানে। সপাং করে শব্দের সঙ্গে টান টান হলো রশি। বরফ থেকে উপড়ে এল কারবাইন, বরফের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটছে।

তারপর মনিকা দেখল ওর পায়ের সামনের সমতল বরফ চোখের পলকে পাহাড়-প্রাচীর হয়ে গেল। ওর কোমরে জড়ানো রশি ওকে ওই পাঁচিলের উপরে টেনে নিয়ে চলেছে, পাহাড়-প্রাচীরের স্বচ্ছ কিনারায়।

ওদের নিরাপদ আশ্রয় ফ্লোটা ফেটে দু'টুকরো হয়ে গেছে, রানা রয়েছে আরেকদিকে।

মনিকার কোমরে জড়ানো রশি টান টান হলো, বরফ থেকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল ওকে; লূপটা কোমর থেকে চামড়ায় ঘষা খেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকল, যতক্ষণ না বগলের তলায় আটকাল। সিধে হলো ও, নড়াচড়া করছে খুব সাবধানে, কারণ অনুভব করল কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত পিঠের সব চামড়া বোধহয় তুলে নেওয়া হয়েছে। মা মেরিকে ধন্যবাদ, অন্যদিকে মুখ করে ছিল ও!

হঠাৎ করে ঢিল পড়ল রশিতে, সামনে পাঁচ ফুট অস্থির পানি দেখতে পাচ্ছে মনিকা, অপর পারে ভারসাম্য ঠিক রাখবার জন্য টলমল করছে রানা।

রশিটাকে টান টান করবার জন্য দ্রুত পিছু হটছে মনিকা।

রানাও এই সময় লাফ দিল। ওর হাত থেকে ছুটে গেল

কুড়ালটা, উড়ে যাচ্ছে আরেকদিকে। টান টান হলো রশি। শূন্যে রয়েছে ও, ঝাঁকি খেল সামনের দিকে। বরফের উপর আছড়ে পড়ল মনিকা। ওর কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে পতন হলো রানার, ফ্লোর সদ্য তৈরি নতুন কিনারায়।

বিচ্ছিন্ন ফ্লোর ওদের অর্ধেকটা থরথর করে কেঁপে উঠল, তারপর ঝাঁকি খেল; ছিটকে নেটের উপর পড়ল জুনো আর অস্টিন, ওই একই সময়ে ঠাণ্ডা হিম পানির একটা ঢেউ ছুটে এসে ডুবিয়ে দিল সচল সিন্ধুঘোটকদের ঝাঁকটাকে। ওগুলোর মূল অংশটার পিছু নিয়েছে কিলাররা, এখনও এদিকে একটাও নেই, কাজেই মেরুন প্রাণীগুলোর মন্থরগতি আগমন ঠেকাতে জুনো আর অস্টিনের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

প্রথম সারির গোটা বিশেক বেঁচে আছে। বরফের রঙ এখন শীতের ঝরে পড়া পাতার মত, চারদিকে বেঢপ আকৃতি নিয়ে পড়ে রয়েছে মাংস, রক্ত আর চর্বির স্তূপ।

তবে ফ্লোর আকস্মিক ঝাঁকিটা অস্টিনের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনল। নেটে পা বেধে যাওয়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও, হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল রেমিংটন, বরফের উপর দিয়ে পিছলে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে ডুবে গেল।

'শালা মড়া খেকো সাগর!' গালি দিল অস্টিন, টলতে টলতে সিধে হলো। তাড়াহুড়ো করে গ্লাভ জোড়া পরল আবার হাতে, তারপর ঝুঁকে একটা হার্পুন তুলে নিল। শেষ প্রান্তে রশি বাঁধছে, কারণ ওটাকে হারাতে চায় না।

সিন্ধুঘোটকরা বিরতিহীন এগোচ্ছে, জুনোও অবিরাম গুলি করছে। হঠাৎ ঘাড় ফেরাতে চমকে উঠতে হলো—ওদের অগোচরে একটা সিন্ধুঘোটক ক্যাম্প আর পাহাড়ের মাঝখানের নরম বরফ ভেঙে উঠে এসেছে ফ্লোর উপর। শুধু ওঠেনি, তাঁবুর ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে ওদের দিকে এগিয়েও এসেছে। ওটা ওদের

দ্বিতীয় তাঁবু, খালি।

প্রথমে তাঁবুটাকেই টার্গেট করল সিন্ধুঘোটক, এক নিমেষে বরফের মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছে অস্টিনের পিঠ লক্ষ্য করে।

'অস্টিন!' চিৎকার করলে কী হবে, জুনোর কণ্ঠস্বর সিন্ধুঘোটকদের চেঁচামেচি আর কান্নায় চাপা পড়ে গেল। ঝট্ করে ওয়েদারবাইটা কাঁধে তুলেই ট্রিগার টিপে দিল ও। দানবটার মাথায় লাগল গুলি, কিন্তু লাইট হাই ভেলোসিটি বুলেট খুলির শক্ত হাড়ে লেগে পিছলে গেল।

কাজটা আসলে রেমিংটনের, কিন্তু সেটা তো নেই। যত দ্রুত পারা যায় সামনের দিকে ছুটছে জুনো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এখনও কিছু জানে না অস্টিন, হার্পুনে রশি বাঁধতে ব্যস্ত ও। থেমে আরেকটা গুলি করল জুনো। জন্তুটার মাথার উপরদিকটা মনে হলো উড়ে গেল, অথচ তারপরেও ওটার গতি কমছে না, আগের মতই এগিয়ে যাচ্ছে।

জুনোর কাছ থেকে আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে ওটা। ট্রিগার টিপল ও। জ্যাম হয়ে গেছে অস্ত্র। বিদ্যুৎবেগে উল্টো করে ধরল ব্যারেলটা; তারপর মুগুরের মত মাথার উপর তুলে আরও সামনে বাড়ল।

অস্টিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ঝট্ করে মাথাটা পিছিয়ে নিল সিন্ধুঘোটক, ঘাড়ের পিছনের চর্বি ফুলে উঠছে। বিরতিহীন চেঁচামেচির মধ্যে অবশেষে কিছু একটা শুনে সচকিত হলো অস্টিন, তাকাল পিছন দিকে।

উল্টো করে ধরা অস্ত্রটা সিন্ধুঘোটকের মাথার চাঁদিতে সবেগে নামিয়ে আনল জুনো, দাঁতগুলো ঠিক যখন অস্টিনের শরীরে গর্ত করতে যাচ্ছে। অস্ত্রের বাঁট ভেঙে গেল। ঝাঁকিটা জুনোর সারা শরীর অবশ করে দিয়েছে।

থামল সিন্ধুঘোটক, হামলাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে; দাঁত দুটো

অস্টিনের বুক থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। এই সময় চেঁচিয়ে উঠল ওটা, ঘাড় ফিরিয়ে জুনোর দিকে তাকাল।

হোঁচট খেয়ে পিছনদিকে পড়ে গেল জুনো, অসহায়। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছে সিন্ধুঘোটক, ইতস্তত করছে ঘুরে ওর দিকে এগোবে কি এগোবে না, চেঁচাচ্ছে এখনও। ওটার মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, দাঁত বেয়ে শ্লথ গতিতে বুকে পড়ছে।

বসে-বসেই পিছু হটছে জুনো, আত্মরক্ষার জন্য কিছু একটা খুঁজছে, তবে জানে কিছুই পাওয়া যাবে না।

অস্টিন দেখল হার্পুনটা এখনও ধরে আছে ও; পরিস্থিতি বুঝে ওর মাথা রিয়্যাক্ট করবার আগেই ক্ষিপ্রবেগে অ্যাকশন শুরু করল শরীরটা। জুনোর দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাবার ফলে নিজের গলাটা অস্টিনের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সিন্দুঘোটক, এবং হার্পুনটা যেন নিজে থেকেই মাঝখানের অল্প কয়েক ফুট দূরত্ব এক নিমেষে পেরিয়ে এল।

যেন সবসময় ওখানেই ওটা ছিল, ওই রুপালি শাফট; হঠাৎ লাফ দিয়ে সিন্ধুঘোটকটার থলথলে মেরুন গলার ভিতর থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল। স্থির হয়ে গেল অস্টিন, ওটার দিকে তাকিয়ে আছে, হতবিহ্বল।

ঘাড় সোজা করবার চেষ্টা করল জন্তুটা, কিন্তু গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে হার্পুনটাকে সামনের দিকে ঠেলছে অস্টিন, ওটাকে ডান বগলের নীচে আটকে নিয়ে। ঠেলছে আর মোচড়াচ্ছে, একটু একটু করে জন্তুটার গলার আরও ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে অস্ত্রটা, যতক্ষণ না মেরুন কাঁধের সঙ্গে ওর বুকটা ঠেকে গেল।

আবার চেঁচিয়ে উঠল সিন্ধুঘোটক, তবে আওয়াজ খুব কমই বেরুল, খোলা মুখ থেকে ভক্ ভক্ করে বেরিয়ে এল বেশ খানিকটা রক্ত। পিছলে গেল ফ্লিপার দুটো। নুয়ে পড়ল মাথা। জুনোর গোড়ালির দু'পাশের বরফে সেঁধিয়ে গেল দাঁত দুটো।

ফ্লোর নতুন কিনারায় এখনও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে রানা, এই সময় আরেকটা সিন্ধুঘোটক তুমুল আলোড়ন তুলে পানির উপর মাথা তুলল। রানার কাছ থেকে মাত্র দু'ফুট দূরের বরফে ফ্লিপার আটকাল ওটা, আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে আসছে উপরে, চিৎকার করে ক্ষোভ আর অসন্তোষ প্রকাশ করছে। পানির তলায় ছিল ওটা, গ্যাস বোমায় আক্রান্ত হয়নি।

রানা বিবেচনা করছে নড়বে কি নড়বে না, তবে মনে হলো যেন বহুকাল আগের কোনও এক স্বপ্নের জগতে রয়েছে ও। ভাবল—থাক, লাভ নেই কোনও।

তবে মনিকা আছে, হাতে ওর ফেলে আসা কুড়ালটা। মনিকা কী করেছে দেখবার সুযোগ হয়নি ওর। শুধু আবিষ্কার করল সিন্ধুঘোটকটা নেই। মনিকা আছে।

'রানা! রানা!' কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে জোরে চিৎকার করতে হওয়ায় মুখ ফুলে লাল হয়ে উঠল মনিকার, তারপরও অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে রানা।

ধীরে ধীরে নড়ল ও। মনিকার সাহায্য ছাড়াই উঠে বসতে চেষ্টা করছে। পারল। তারপর সিধে হলো। দাঁড়াবার পর মনিকার কাঁধে হাত রাখল। কেউ ওরা কথা বলছে না। সাগর শান্ত, এমনকী কোথাও একটা কালো সেইল ফিনও নেই।

মরা কিংবা বেহুঁশ সিন্ধুঘোটক বেশিরভাগই পানির নীচে তলিয়ে গেছে। তলাতেও নিশ্চয় নেই, এতক্ষণে চালান হয়ে গেছে তিমিদের পেটে।

তাও মন্দ নয়, ভাবল রানা। নার্ভ গ্যাসে আক্রান্ত সিন্ধুঘোটকদের মাংস খেয়ে থাকলে লম্বা ঘুম দেবে কিলার ওয়েইলরাও, ওই ফাঁকে ফ্লোটা ওদেরকে নিয়ে অনেক দূরে সরে যাবে। অন্তত, আশা করতে দোষ কী?

কিছু সিন্ধুঘোটক এখনও বেঁচে আছে, তিমিদের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় ফ্লোর নীচে।

সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন, যেন একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা; মনিকার কাঁধ জড়িয়ে রেখেছে রানার ডান হাত, দুটো মাথা খুব কাছে, দুজনের নিঃশ্বাস ওদের মাথার উপর ম্লান টাওয়ার তৈরি করছে।

প্রথমে অলসভাবে, তারপর ব্যস্ততার সঙ্গে বেঁচে থাকা সিন্ধুঘোটকরা দ্বিতীয় ফ্লোর উপর উঠছে। খানিক পর মনিকাকে নিয়ে যখন ফিরতে যাবে রানা, আগোছাল মেরুন স্তূপের আকৃতি নিয়েছে সিন্ধুঘোটকরা, স্তূপের গায়ে কাত হয়ে দাগ কেটেছে নিষ্প্রভ হলুদ আইভরি। এখন আর ওগুলো চেঁচামেচি করছে না, নীরব সাগরের উপর দিয়ে কখনও-সখনও ভেসে আসছে সেই দুই সুরে বেজে ওঠা বেল—অর্থাৎ এখন আর কেউ কাউকে খুব একটা ডাকছে না ওরা।

ফিরে আসছে রানা ও মনিকা, এলোমেলোভাবে পা ফেলে হাঁটছে। ওদিকের দ্বিতীয় ফ্লো অবশিষ্ট সিন্ধুঘোটকদের জন্য যেমন নিরাপদ, ওদের জন্য এটাও এখন তেমনই নিরাপদ। দুই কি তিন পা মাত্র হেঁটেছে, এই সময় বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা কিছু একটা লাগল মনিকার পায়ে।

দুজনেই বোকার মত তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। জিনিসটা ওদেরই, ইস্পাতের একটা গোঁজ। গোঁজটার সঙ্গে কমলা রঙের একটা রশি বাঁধা রয়েছে।

ওরা জানে গোঁজটা থেকে চল্লিশ ফুট দূরে শুরু হয়েছে ওদের নেট। তার মানে ওদের ফ্লো আর অবশিষ্ট আছে মাত্র দুশ' পঞ্চাশ ফুট।

স্থির হয়ে আছে ওরা, ব্যাপারটা উপলব্ধি করে পাথরের মত জমে গেছে।

সময় কীভাবে বেরিয়ে গেছে বোঝা যায়নি। সিন্ধুঘোটকদের সঙ্গে একঘণ্টারও বেশি লড়তে হয়েছে। সেই লড়াইয়ে ওরা জিতেছে, জিতে বেঁচে আছে। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতে হেরে গেছে

আরেক যুদ্ধে। ভাঙার পর বরফের যে টুকরোটায় ওরা রয়েছে, সেখানে শুধু ওদের ক্যাম্পটাই ধরবে, অতিরিক্ত জায়গা বলতে প্রায় কিছুই থাকবে না।

শুধু তা-ই নয়, ওরা ওদের বেশিরভাগ স্টোরও হারিয়েছে। শুধু বৃষ্টির কবল থেকে যেগুলো সরাতে পেরেছিল, সেগুলো আছে। আর আছে বিচ্ছিন্ন বোট, ডাইনামাইট স্টিক। হারিয়েছে সবগুলো আগ্নেয়াস্ত্র। হারিয়েছে আবার যুদ্ধ করবার মনোবল। এমনকী বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও বোধহয় ধরে রাখতে পারছে না ওরা আর।

পঁচিশ

মরা সিন্ধুঘোটকের ঠাণ্ডা গায়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো অস্টিন। জন্তুটার গলা থেকে বেরিয়ে আসা স্পিয়ারটা ডান হাতে ধরল, চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। সিন্ধুঘোটকরা আসবার আগে যেমন ছিল, সব সেই আগের মতই আছে—ভারী, গাঢ় আকাশ সীসা রঙের সাগরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, চারদিকের দিগন্ত পুরোপুরি ঝাপসা, খানিকটা উজ্জ্বলতা আর রঙ অবশিষ্ট আছে শুধু ফ্লোগুলোয়।

দ্বিতীয় ফ্লো, যেটায় বেঁচে যাওয়া সিন্ধুঘোটকরা আশ্রয় নিয়েছে, ডান দিকে প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে এখন—ভাগ্যগুণে একটা চ্যানেল পেয়ে মৃদু দোল খেতে খেতে আরেকদিকে চলে যাচ্ছে।

ওর ক্লান্ত চোখ নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে এল। ক্যাম্পের

চারদিকে এখনও পড়ে আছে বিশটার মত লাশ। ওর পিছনের সিন্ধুঘোটকটাকে ধরলে একুশটা। টয়লেট-কাম-স্টোরেজ, আর প্রথমে রানা ও জুনো যেটায় ছিল, শুধু এই দুটো তাঁবু রক্ষা পেয়েছে।

ওর তাঁবুটা যেখানে ছিল সেখানে এখন গোলাকার একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে, ওটার চারধারে তৈরি হয়েছে মাকড়সার জাল আকৃতির ফাটল। ঘাড় ফেরাতে আরও একটা গর্ত দেখতে পেল, মরা সিন্ধুঘোটকটার পিছনে। ওদের ফ্লোর আকৃতি এখন প্রায় চৌকো—লম্বায় যদি সত্তর গজ হয়, চওড়ায় হবে পঞ্চাশ, তা-ও আবার এরইমধ্যে দু'জায়গায় দুটো গর্ত তৈরি হয়েছে। শিউরে উঠল অস্টিন।

তারপরেও, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনবার তো কোনও মানে হয় না। জানা কথা বিধ্বস্ত স্টোরেজ তাঁবু থেকে কিছু বাঁচাতে হলে এখনই কাজ শুরু করতে হবে। তাঁবুটার অবশ্য কোনও চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না, তবে বিচ্ছিন্ন বোটের টুকরো ছাড়াও বাক্সে ভরা নানা জিনিস চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

একটা বাক্স চিনতে পারল অস্টিন, ওটার ভিতর ডাইনামাইট আছে। ফাটল ধরেছে কাঠে, পড়ে আছে সামনের গর্তটার কিনারায়। আর আছে রাজ্যের আবর্জনা। 'শালার তিমি!' দাঁতে দাঁত পিষল ও। 'শালার আর্কটিক!'

হঠাৎ করে ওর সমস্ত রাগ রানার উপর গিয়ে পড়ল। 'ওই কুত্তাটার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা! ওর কথা শুনেই আমাকে শাস্তি দিয়েছিল নুমা-চিফ। দু'বছর হলো আমাকে এই ঠাণ্ডা নরকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। যিশুর কিরে, ওকে আমি ছাড়ব না!'

গর্ত দুটো থেকে কলকল করে পানির আওয়াজ ভেসে আসছে। নিজের কাপড়চোপড়ের উপর চোখ বুলাল, পারকা আর

ওভারট্রাউজারে রক্ত লেগে রয়েছে, তবে খুব বেশি নয়। এস্কিমো জুনোর দিকে এগোল ও।

চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে জুনো, ভঙ্গিটা বিশেষ ভাল লাগল না অস্টিনের। শালা মারা গেল নাকি! পা দিয়ে ধাক্কা মারতে গিয়েও মারল না, ডান হাঁটুটা গাড়ল ওর পাশে। 'অ্যাই,' ডাকল ও, জুনোর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

নড়ে উঠে নাক ডাকতে শুরু করল জুনো। স্বস্তি বোধ করল অস্টিন, উন্মাদের মত হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। বিড়বিড় করল, 'কই মাছের জান, এত সহজে কী মরবে! এই শালা, ওঠ!'

'কী?' চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল জুনো। 'আমি কোথায়?' তারপর আবার নেতিয়ে পড়ল সে—ঘুমাল, নাকি জ্ঞান হারাল, বলা মুশকিল।

'বোঝো!' বলে ওকে ছেড়ে রানা আর মনিকার দিকে এগোল অস্টিন। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা দুজন।

অস্টিনকে দেখে যেন একটা ঘোর ভাঙল রানার, তাগাদার সুরে বলল, 'আগুন!'

'কী?' হকচকিয়ে গেল অস্টিন।

'আগুন জ্বালতে হবে। জলদি! তাঁবুতে শুকনো কাঠ আছে।' হাঁটতে শুরু করে রানা ভাবল, শরীরটা গরম হয়ে গেলে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে জুনো। মনিকার দিকে ফিরল ও। 'তুমি কফির ব্যবস্থা করো।'

'পানি পাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মনিকা, রক্ত লেগে থাকা বরফের দিকে হাত তুলল।

'খুঁড়ে বের করো। রক্ত বোধহয় আমাদের উপকারেই লাগবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বরফ খুঁড়তে শুরু করল মনিকা।

টয়লেট-কাম-স্টোর তাঁবু থেকে এক পাউন্ড ওজনের গরুর মাংসভর্তি টিন, কয়েক ক্যান মটরশুঁটি, ডিমের শুকনো পাউডার,

পাউরুটি, মাখন, জেলি আর কিছু মেডিসিন নিয়ে এল রানা। হেঁটে ফেরার সময় টের পেল ওদের ফ্লো পুরোপুরি স্থির নয়, ঢেউয়ের দোলায় সামান্য হলেও নড়ছে।

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আপাতত কিছু খাবার, গরম কফি আর ঘুম দরকার ওদের। তারপর আবার নতুন করে ভাবা যাবে বাঁচার কোনও উপায় করা যায় কিনা।

রান্না শুরু করবার আগে ধরাধরি করে তাঁবুর ভিতর নিয়ে এল ওরা জুনোকে। পারকা, বুট আর ওভারট্রাউজার খুলে নিল রানা, তারপর সারা শরীর কম্বলে জড়াল। সবশেষে স্লিপিং-ব্যাগে ভরল।

কাজটা শেষ করে রানা আর অস্টিন বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল ইতিমধ্যে ফায়ার-ট্রেতে আগুন জ্বেলে কফি বানাতে বসেছে মনিকা। টিনের কৌটা খুলে একটা পটে মাংসটাও চড়িয়ে দিল রানা।

মাংস আর মসলার গন্ধে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। মাংস সেদ্ধ হয়ে আসতে তাতে মটরশুঁটি দিল রানা, সবশেষে দিল ডিমের পাউডার। অপেক্ষার সময়টা সবাই কথা বলছে, নিজেদের মধ্যে শত্রুতা আর ঘৃণা যা-ই থাকুক, এই মুহূর্তে কেউ তা মনে রাখছে না।

পেট ভরে, তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা। ভাগ্য ভাল যে নিরাপদ জায়গায় সরানো জিনিসগুলোর মধ্যে প্লেটও পাওয়া গেছে—কারণ ফায়ার-ট্রের পাশে যে সেটটা ছিল সিন্ধুঘোটকদের হামলার সময় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সেটা। খাবার সময় অবশ্য তেমন কোনও কথা হলো না।

চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরলেও, মড়ার মত এখনও একটানা ঘুমাচ্ছে জুনো।

সাগর আর আকাশ যেমন ছিল তেমনি আছে। বিচ্ছিন্ন ফ্লোর

দ্বিতীয় অংশ ঝাপসা দিগন্তে হারিয়ে গেছে। কিলার ওয়েইলরা সেই যে অদৃশ্য হয়েছে, চোখে বিনকিউলার তুলেও ওগুলোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

আকাশে কোনও প্লেন বা হেলিকপ্টার নেই।

আজ সবাই আরও চুপচাপ। কফি খাওয়া শেষ হতে উঠে দাঁড়াল মনিকা। 'রানা, তোমার এস্কিমো বন্ধুকে অনেকক্ষণ ঘুমাতে দেওয়া হয়েছে, আর নয়,' বলে তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ল।

'মিস্টার ডট জুনো? মিস্টার জুনো?' ডাকল ও। 'খাবার রেডি।'

স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর নড়ে উঠল জুনো। 'যিশু অ্যান্ড মেরি!' বলল ও, একটু বিস্মিত। 'এখনও আমরা বেঁচে আছি?'

'তা আছি, বেশ ভালভাবেই।'

'আমি কিন্তু সত্যি ভাবিনি আমরা বাঁচব।'

'মিরাকল তো মাঝে-মধ্যে ঘটেই।'

জুনোর ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটল। 'আমি এ-ও ভাবিনি যে একই যাত্রায় দু'রকম ফল ফলবে!'

'একই যাত্রায় দু'রকম...মানে?'

'এই যে, দোস্তের বেলা আটপৌরে রানা, অথচ আমার বেলা আনুষ্ঠানিক মিস্টার!' মুচকি হেসে বলল ও। 'আমার প্রতি এত অনাদর কেন?'

মুখটা লাল হয়ে উঠছে মনিকার, তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, এখন থেকে এ-ব্যাপারে কোনও বৈষম্য করা হবে না। এখন উঠুন, মিস্টার...থুড়ি, ওঠো, জুনো!'

সন্তুষ্টচিত্তে হাসল জুনো। 'জীবন সত্যি খুব মধুর। শুধু বেঁচে থাকাটাও ভারি আনন্দের।'

'আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, সেজন্যেই তো চাইছি না এত তাড়াতাড়ি মারা যাই আমরা কেউ।'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি?' জানতে চাইল জুনো।

'চব্বিশ ঘণ্টার কম নয়।'

'হোয়াট! বলো কী!' চমকে উঠল জুনো, স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসছে। 'ওগুলো...সিন্ধুঘোটক আর তিমি?'

'আমাদের ফ্লো অনেক ছোট হয়ে গেছে,' বলল মনিকা। 'দেখলে অবাক হয়ে যাবে। সিন্ধুঘোটকরা চলে গেছে, আর তিমিগুলো ফিরে আসেনি।'

ভ্রু কোঁচকাল জুনো। 'ফিরে আসেনি? ওগুলোর তো ফিরে না আসবার কথা নয়! '

'সম্ভবত সিন্ধুঘোটকদের মাংস খাওয়ার ফল,' বলল মনিকা। 'ওগুলোকে অজ্ঞান করার জন্যে গ্যাসবোমা ফাটিয়েছিল রানা। ওটা আসলে এক ধরনের নার্ভ গ্যাস। অজ্ঞান সিন্ধুঘোটকদের মাংস খেয়ে তিমিরাও সম্ভবত ঘুমাচ্ছে।'

'হুঁ-হুঁ, শালার মানুষটার ঘটে বুদ্ধি আছে বটে!' গালি দিলেও, কণ্ঠস্বরে ভক্তির কোনও অভাব নেই।

'আচ্ছা, বলতে পার, কদিন হলো এখানে আছি আমরা?' হঠাৎ জানতে চাইল মনিকা।

'কী জানি। পাঁচদিন। বেশিও হতে পারে।'

'পাঁচদিন না, বেশিই হবে,' বিড়বিড় করল মনিকা। বাইরে থেকে ভেসে আসা আগুনের গর্জন শুনতে পাচ্ছে ও, শুনতে পাচ্ছে অস্পষ্ট গলায় রানা আর অস্টিনের আলাপ। সব কেমন স্বাভাবিক লাগছে। কেমন বাস্তব আর রুটিন মাফিক।

যেন সারাজীবন এখানেই রয়েছে ওরা। যেন এখানেই চিরকাল থেকে যাবে। সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা, অবাস্তবতা কিছুই ওকে ভয় দেখাতে পারছে না। অদ্ভুত হলেও, গভীর একটা তৃপ্তি বোধ করছে মনিকা। কোথাও থেকে যেন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ওকে, এ-যাত্রা সমস্ত বিপদকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ও, গায়ে একটা আঁচড়টিও লাগবে না

'জুনো?'

'বলো।' কাপড় পরছে জুনো।

'আমার একটা কৌতূহল আছে,' বলল মনিকা। 'সেটা তো কোনও বন্ধুকে বলাই যায়, তাই না?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জুনো বলল, 'যায়।'

'আমাকে তুমি রানা সম্পর্কে কী জানো বলবে?'

লেকচার শেষ করে জুনো বেরিয়ে যাওয়ার পরেও চুপচাপ একা তাঁবুর ভিতর বসে থাকল মনিকা। অস্থির মনটাকে শান্ত করতে পারছে না ও। সবটুকু না বুঝে যতই উৎসাহ দেখাক জুনো, ওর নিজের উপলব্ধি হলো—রানাকে একান্ত করে চিরকালের জন্য পাওয়া অসম্ভব।

খানিক পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়ে উঠল মনিকা, তারপর ক্রল করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

বাইরে ফায়ার-ট্রের উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা আর অস্টিন। স্টোরেজ তাঁবুর চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে কিছু জিনিস, দেখেশুনে সেগুলো কুড়াচ্ছে জুনো।

'আরও কফি চাই?'

'খুব যদি গরম হয়,' বলল মনিকা, অন্যমনস্ক।

কিছুক্ষণ যেমন ছিল তেমনি রইল ওরা; পুরুষ দুজন আগুনটার উপর ঝুঁকে কাজ করছে, মেয়েটা ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে—চুপচাপ, বিষণ্ন, চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে এস্কিমো তরুণের দিকে।

একটু পর রানা জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, মনিকা?'

'উম্? না, কিছু না।' নিজের উপর রেগে আছে মনিকা। সত্যিকার ভালবাসা কাকে বলে, ও আদৌ কারও প্রেমে পড়েছে কি না, ইত্যাদি কিছুই পরিষ্কার নয়; অথচ যেই শুনল রানা ওর পেশার কারণে কোনও মেয়েকে নিজের সঙ্গে জড়ায় না, অমনি দুনিয়াটাকে বাস করবার অযোগ্য মনে হবে কেন ওর?

নিজের উপর জোর খাটিয়ে ওদের কাজে হাত দিল মনিকা, রানার কাছ থেকে রান্নার দায়িত্ব বুঝে নিল। নিঃশব্দে জুনোকে সাহায্য করতে চলে গেল রানা।

'মনিকার কী হয়েছে?' কাজের ফাঁকে এক সময় বিড়বিড় করে জানতে চাইল রানা, মনিকা যাতে শুনতে না পায়।

'তোমার সম্পর্কে এটা-সেটা নানা কথা জানতে চাইছিল।'

'জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা কি ভাল হয়েছে, জুনো?'

'তোমার মুড দেখে মনে হচ্ছে—না।'

ভাঙা বাক্স থেকে ছিটকে পড়া যেখানে যত টিনের কৌটা ছিল সব একে একে সংগ্রহ করে নতুন স্টোরেজ তাঁবুতে রেখে এল ওরা। ভাঙা কাঁচ সহ অন্যান্য আবর্জনা তুলে গর্ত দুটোয় ফেলল।

'এটা আর খুব বেশি ধকল সহ্য করতে পারবে না,' কাজটা শেষ করে বলল রানা, অবশিষ্ট ফ্লোর চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। 'এর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ,' বলল জুনো। 'এরকম শান্ত আবহাওয়ায় খুব বেশি হলে তিনদিন টিকবে। তবে কিলারগুলোর ঘুম ভেঙে গেলে কী হবে জানি না।'

'ঘুমটা কত লম্বা হবে বলা মু·কিল। ওগুলো সরাসরি নার্ভ গ্যাসে আক্রান্ত হয়নি। সিন্ধুঘোটকদের মাংস খেয়ে ঘুমাচ্ছে—আদৌ যদি আমার ধারণা সত্যি হয় আর কি। হয়তো ঘুমাচ্ছে না, প্রচুর মাংস খেয়ে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে।'

'চলে এসো, জুনো, খেয়ে নাও!' ডাকল মনিকা।

খাওয়া শেষ হতে আবার একা একদিকে চলে গেল জুনো। বাকি তিনজন সব ধুয়ে পরিষ্কার করল, তারপর তাঁবুতে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

অস্থির বরফের উপর দিয়ে ফিরে এসে জুনো যখন তাঁবুতে

ঢুকল, তিনজনই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। রানা আর অস্টিনের মাঝখানে অল্প একটু জায়গার মধ্যে শুতে হলো ওকে। স্লিপিং-ব্যাগের ভিতর বেশ কিছুক্ষণ জেগে থাকল, রানা আর মনিকার কথা ভাবছে।

ওদের ব্যাপারটাকে শুধু প্রেম বলতে মন চাইছে না জুনোর। প্রফেসর মনসুর মারা যাওয়ার পর সম্পূর্ণ একা আর অসহায় হয়ে পড়েছিল মনিকা, ওকে দেখে সেটা বুঝতে কারও আর বাকি ছিল না। ঠিক ওই সময় এমন একজনকে দরকার ছিল ওর, যে ওকে অভয় দেবে, আশ্বস্ত করবে, পাহারা দেবে, পূরণ করবে অভিভাবকের শূন্যস্থানটা। আর রানা ঠিক তা-ই করেছে।

কাজেই এটা শুধু প্রেম নয়, তারচেয়েও বেশি কিছু।

তারপর একসময় জুনোও ঘুমিয়ে পড়ল।

একটানা প্রায় আট ঘণ্টা নির্বিঘ্নে ঘুমাল ওরা। প্রথমদিকে সামান্য হাত-পা ছুঁড়ে এ-পাশ ও-পাশ করল জুনো; চিৎ হয়ে শোয়ার সময় দু'একবার ফুঁপিয়ে উঠল মনিকা; কিন্তু রানা আর অস্টিন মড়ার মত ঘুমাল, কোনও স্মৃতি বা স্বপ্ন ওদেরকে বিরক্ত করতে পারছে না।

ওদের মাথার অনেক উপরে ঘন পাঁশুটে মেঘ হালকা হতে শুরু করেছে। দিনটা, সন্ধের দিকে ঢলে পড়ছে, নিঃশব্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সাগর এখনও চুপচাপ, শুধু পুবদিক থেকে আসা শান্ত বাতাস একটু যা বিরক্ত করছে। ফ্লোগুলোর অস্থির নড়াচড়াও আগের মতই, বাড়েনি; আকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ওগুলো, মাঝে-মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে।

এক ঝাঁক পাখি অনেক উপর দিয়ে দ্রুত আলাস্কার দিকে উড়ে যাচ্ছে, দু'একটাই চেঁচাল, কান পাতলে হয়তো ডানা ঝাপটানোর শব্দ পাওয়া যাবে।

সাগরের তলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনটে কিলার ওয়েইল মৃদু সুরে গান ধরেছে।

জুনো বলতে পারবে না ঠিক এই মুহূর্তে, ঠিক এভাবে কেন ওর ঘুমটা ভাঙল। চোখ মেলে দেখল শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে ও, মনে করতে পারছে না এমন একটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে শরীর। তাঁবুর চারদিকে তাকাল ও। বাকি সবাই দিব্যি শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।

আবার শুলো জুনো, কিন্তু চোখ দুটোকে আর এক করতে পারছে না। তা ছাড়া, ওর একবার টয়লেটে যাওয়াটাও জরুরি হয়ে উঠছে। কোনও শব্দ না করে আবার বসল, হামাগুড়ি দিয়ে ফ্ল্যাপের কাছে পৌঁছাল, তারপর সাবধানে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বাইরে বাতাস ছেড়েছে। আকাশেরও হাসি আর ধরে না। জয়েন্টগুলো মটমট করে আওয়াজ না করা পর্যন্ত আড়মোড়া ভাঙল জুনো, তারপর নেটের উপর দিয়ে টয়লেটের দিকে এগোল।

জুনো তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় ঘুম ভাঙল অস্টিনের। পাশ ফিরল, তারপর কিছু না ভেবে সে-ও আড়মোড়া ভাঙল। ওর ডান কনুই রানার পাঁজরে গেঁথে গেল, একটা পা মনিকার পেটে বেশ জোরেই গুঁতো মারল।

'উপস্। দুঃখিত। মনে ছিল না এতটুকু জায়গায় শুয়েছি আমরা।'

আবার নীরবতা। একটু পর অস্টিনও ক্রল করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। পাশ ফিরল মনিকা, সঙ্গে সঙ্গে গুঙিয়ে উঠল চামড়া ছড়ে যাওয়া পিঠে চাপ পড়ায়। উঠে বসল রানা, আড়ষ্ট কাঁধ দুটোকে ধীরে ধীরে নাড়ছে।

আধবোজা চোখে ওকে দেখছে মনিকা।

খুবই সাবধানে সিধে হলো রানা, শার্টটা খুলল গা থেকে. সন্দেহের দৃষ্টিতে মনিকার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল

ঘুমাচ্ছে কি না, তারপর গা থেকে খুলতে শুরু করল গেঞ্জিটা। কিন্তু পারছে না, কারণ ওর গায়ের চামড়া গভীরভাবে কেটে-ছিঁড়ে গেছে। ক্ষতগুলো থেকে রক্ত আর রস বেরিয়ে গেঞ্জির সঙ্গে আঠার মত সেঁটে আছে।

'ইস্, রানা!' আঁতকে উঠল মনিকা, তারপর ওর ছেলেমানুষির কথা ভেবে রেগে গেল। 'তুমি তো দেখছি আশ্চর্য মানুষ!' ঝট করে উঠে বসল ও। 'ওখানে অয়েন্টমেন্ট লাগানো দরকার, তারপর ব্যান্ডেজও করতে হবে।'

'আমি ভাবলাম তুমি ঘুমাচ্ছ!' রানার গলায় অভিযোগের সুর।

'জেগে থাকাটা আমার কোনও অপরাধ নয়,' বলল মনিকা। 'মনে আছে তো, আমি একজন ট্রেইন্ড নার্স? একটু সরে এসো, কোথায় কী হয়েছে আমাকে দেখতে দাও।'

রানা আসছে না দেখে স্লিপিং-ব্যাগ থেকে নিজেই বেরুল মনিকা, তারপর ক্রল করে ওর দিকে এগোল। একদৃষ্টে তাকিয়ে ওকে দেখছে রানা। 'কী হলো, রানা? খোলা সব, আমাকে দেখতে দাও!'

চোখ বড় বড় করল রানা। 'ওরা শুনলে কী ভাববে...'

'তুমি খুব ভাল করেই জানো আমি কী বোঝাতে চাইছি!' মনিকা অনুভব করল গরম হয়ে উঠছে ওর মুখ, হয়তো লালও।

সেটা গোপন করবার জন্য ফার্স্ট এইড বক্সের খোঁজে তাঁবুর একটা কোণ লণ্ডভণ্ড করছে। বাক্সটা পেয়ে ভিতর থেকে অয়েন্টমেন্ট ভর্তি টিউব আর ব্যান্ডেজ বের করল।

'সাহায্য লাগবে,' বলল রানা।

রক্ত আর রসে ভেজা গেঞ্জিটা অত্যন্ত সাবধানে রানার গা থেকে খুলে আনল মনিকা। 'হয়েছে। এবার আমাকে দেখতে দাও।' ওর মত, রানার পিঠের চামড়াও রশির ঘষা লেগে ছড়ে গেছে। বেগনি মলম দিয়ে লম্বা ক্ষতগুলো ঢেকে দিল ও।

কাটা-ছেঁড়ার দাগ বুক আর পাঁজরেও কম নয়। ডানদিকের পাঁজরের ক্ষতটা বেশ গভীর। 'এটা বিপজ্জনক,' বলল মনিকা, বুকে চাপ অনুভব করায় গলার আওয়াজ একটু বেসুরো হয়ে উঠল। 'একটু জ্বালা করতে পারে।'

যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগল, ঝাঁকি খেল রানা। ওটার উপরে, কলার-বোন থেকে বুকের বোঁটা পর্যন্ত, আরেকটা চওড়া আঁচড়ের দাগ, একই রকম বিপজ্জনক। এখানেও প্রচুর আইওডিন ব্যবহার করল মনিকা; অনুভব করল সিল্ক-এর মত মসৃণ বুকের লোমগুলো ওর তালু, আঙুল আর হাতের উল্টোপিঠে কেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

চোখ তুলে তাকাল মনিকা, রানার কালো চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মুখে, দৃষ্টিতে খুব গভীর কী যেন একটা আছে—কৃতজ্ঞতা, না ভালবাসা, বলা কঠিন। 'এবার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

বাক্সটা থেকে ব্যান্ডেজ বাঁধার সাদা রোল বের করে খুলল মনিকা, একটা প্রান্ত রানার বুকের উপর দিকে আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। ওর হয়ে ধরার জন্য উঠে এল রানার হাত, মনিকার হাতটা ঢেকে রাখল এক মুহূর্ত।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বোকার মত বলল মনিকা।

'দ্যাট'স ওকে।'

সামনের দিকে ঝুঁকতে হলো রানাকে, ব্যান্ডেজটা ওর বুক আর পিঠে আড়াআড়িভাবে কয়েক প্রস্থ জড়াল মনিকা। কাজটা এমনই যে সাবধান হওয়া সত্ত্বেও দুজনেই প্রায়ই খুব বেশি কাছে চলে আসছে, ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে—মনিকার হাত রানার বুকে, হাতে, পিঠে; রানার হাত মনিকার বাহুতে। ওদের উরু সেঁটে যাচ্ছে, এমনকী ছ'প্রস্থ পরিচ্ছেদের ভিতর দিয়েও। বাহুতে বাহু ঠেকছে। মনিকার চুল রানার মুখে আর কাঁধে। মনিকার নিঃশ্বাস রানার ঘাড়ে। মনিকার স্তন রানার বুকে, কাঁধে, হাতে।

'ব্যস,' খানিক পর বলল মনিকা, রীতিমত হাঁপাচ্ছে, চেষ্টা

করেও আওয়াজটা চেপে রাখতে পারছে না।

'একটা সেফটি পিন হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ও, হ্যাঁ।' বাক্স থেকে বের করবার জন্য ঘুরল মনিকা, পিঠের চামড়ায় টান পড়ায় ব্যথা পেয়ে মুহূর্তের জন্য অন্ধকার দেখল চোখে। আবার যখন ঘুরল, নীল দেখাল চেহারাটা, চোখে পানি। কোনও মন্তব্য না করে পিনটা ওর হাত থেকে নিল রানা, ব্যান্ডেজটা জায়গামত আটকাল।

'এবার তোমার পালা,' বলল ও।

'কী বললে তুমি?' আঁৎকে উঠল মনিকা।

'এবার তোমার পালা,' বলল রানা; শান্ত, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। 'শার্ট আর ভেস্ট খুলে ফেলো।'

'রানা। আমি...'

অয়েন্টমেন্টের টিউবটা তুলল রানা। 'কী দরকার তোমার? বডিগার্ড? জলদি।' ভ্রূ জোড়া পলকের জন্য কুঁচকে এক হলো, তারপর হাসল ও। 'খুব সাবধানে লাগাব, কোনও ব্যথাই পাবে না, কথা দিচ্ছি।'

'এ-ধরনের কথা বইয়ে পড়েছি।' শার্টের বোতাম খুলছে মনিকা। কাজটা হাত চালিয়ে করতে চাইছে, যেন ওর কোনও আপত্তি বা আড়ষ্টতা নেই, বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে মাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুভব করল অনেকটা যেন স্ট্রিপ-টিজ হয়ে যাচ্ছে।

চোখ তুলল মনিকা। অয়েন্টমেন্টের টিউবে ছাপা নির্দেশগুলো পড়ছে রানা। দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে ও, চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাল রানা।

ভেস্টের নীচের দিকটা ধরল মনিকা, কোমরের জিনস আর সিলস্কিন ওভারট্রাউজারের উপর দিয়ে তুলে আনল, সতর্কতার সঙ্গে ঢিলে করল ওটার পিছনদিক, তারপর হাত দুটো ক্রস করে সাবলীলভাবে মাথার উপর দিয়ে খুলে আনল, নড়াচড়ায় ফুটে

উঠল অনিচ্ছাকৃত সেক্সি একটা ভাব।

ভেস্ট থেকে হাত দুটো ছাড়াবার পর তাকাল মনিকা। টিউবে ছাপা নির্দেশগুলো আবার পড়ছে রানা।

'আমি রেডি,' বলল মনিকা। কাঁধ দুটোকে শিথিল করে দিল, হাত দুটো ক্রস করে রাখল কোলের উপর। রানার চোখ সরাসরি ওর মুখে উঠল না, বুক সমান উপরে এক মুহূর্ত থামল, তারপর বাকিটা উঠল।

'একটু যদি সামনে ঝোঁকো...' বলল রানা।

সামনে ঝুঁকছে মনিকা, থামল ওর কাঁধ রানার বুক স্পর্শ করবার পর। অয়েন্টমেন্টটা ঠাণ্ডা, হু-হু করে জ্বলছে। নিজের অজান্তেই ঝট করে পিঠ সোজা করল ও, ফলে স্তন দুটো ধাক্কা খেল রানার বুকে। স্থির হয়ে গেল মনিকা, স্পর্শটা সচকিত ও কাতর করে তুলেছে ওকে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'খুব জ্বালা করছে বুঝি?'

'না। ঠাণ্ডা,' বলল মনিকা।

পিঠটা আবার ধনুকের মত বাঁকা করল ও। কাটা-ছেঁড়ার উপর সাবধানে, নরম হাতে মলম লাগাচ্ছে রানা। হাত দুটোকে কোথাও আরাম করে রাখবার জায়গা না পেয়ে, অগত্যা হালকাভাবে রানার কোমরে রাখল মেয়েটা।

মনিকার পিঠে রানার হাত খুব নরম পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ দুটো আধবোজা হয়ে এল। সচেতনভাবে নয়, ডান গালটা রানার কাঁধে ঠেকাল ও, যেন নিশ্চয়তা খুঁজছে কোনও শিশু। সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, জানে না কখন শুরু হয়েছিল ব্যাপারটা; রানা মুখ খুলতে মনে হলো সারাটা দিন এভাবেই কাটিয়েছে ওরা।

'ঠিক আছে। শেষ।'

সিধে হয়ে বসল মনিকা, হাত দুটো কোলের উপর ফিরিয়ে আনল স্কুলছাত্রীর মত। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। মনিকার

হাত দুটো বাঁকা হয়ে রানার ঘাড়টা জড়াল, ধরে রাখল লোহার মত শক্ত করে, দু'জোড়া ঠোঁট যখন এক হচ্ছে।

আর ঠিক তখনই ফ্ল্যাপটাকে উড়িয়ে দিয়ে তাঁবুর ভিতর মাথা ঢোকাল অস্টিন, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'রানা! রানা, ওগুলো ফিরে এসেছে! ফ্লোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে শালারা!'

ছাব্বিশ

অস্টিনের মাথা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা আর মনিকা, ওদের চোখ থেকে লোভ আর প্রত্যাশার ভাবটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে থেকে আবার ডাকল অস্টিন, 'রানা!'

দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করল রানা, বোকার মত ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছে মনিকা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে এক মুহূর্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকল ও, তারপর নিজের ভেস্টটা টেনে নিল। তবে ওর কাপড় পরা শেষ হওয়ার আগেই তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল রানা।

যে শারীরিক চাহিদা অপ্রত্যাশিত ও বিধ্বংসী শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছিল সেটা বিদায় নিয়েছে, সেখানে এখন খাঁ-খাঁ শূন্য একটা অনুভূতি; প্রথমে সেটাকে অনুতাপ বলে মনে হলেও, একটু পরেই মনিকা উপলব্ধি করল ওটা আসলে ভয় আর রাগের সংমিশ্রণ।

রাগ এই কারণে যে এত তাড়াতাড়ি বাধা পড়ল; ভয়, আর হয়তো জীবনে এরকম সুযোগ পাওয়া যাবে না।

কাপড় পরা শেষ হতে হাতে গ্লাভ পরল মনিকা, তারপর ক্রল করে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল।

ফ্লোর এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা তিনজন, সিন্ধুঘোটকদের ভারে যেখানটা দু'ভাগ হয়ে গেছে ওদের আশ্রয়। দাঁড়াবার জন্য আদর্শ জায়গা হওয়া উচিত ছিল নিচু পাহাড়টা, কিন্তু ক্যাম্পের পিছনে গোটা এলাকা, সাগর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ গজ, ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে—এর কারণ, সিন্ধুঘোটকদের প্রকাণ্ড দুটো লাশ বরফ ভেঙে নিঃশব্দে ডুবে গেছে, ওরা যখন ঘুমাচ্ছিল। নরম বরফে মরা সিন্ধুঘোটকদের তৈরি গর্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে।

ধীর পায়ে, সাবধানে হেঁটে, ওদের লাইনে এসে দাঁড়াল মনিকা। হাত দুটো পারকার পকেটে যতটা পারা যায় ঢুকিয়ে দিল ও। ডান হাতের আঙুলে ফ্লেয়ার পিস্তলটা ঠেকল। আগ্নেয়াস্ত্রের কাছাকাছি অস্ত্র বলতে গেলে এটাই শুধু রয়ে গেছে ওদের কাছে।

জিনিসটা যত্ন করে রেখে দেওয়া উচিত, ভাবল মনিকা। আল্লাহই বলতে পারবে কখন এটা দরকার হবে ওদের, কী কাজেই বা দরকার হতে পারে। চোখ সরু করে পানির দিকে তাকাল ও। খুদে ঢেউগুলোর পিঠ প্রায় সাদা, জ্বলজ্বলে ফ্লোগুলোর মাঝখানে সাগর তার আয়নার মত মসৃণ ভাবটা ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে।

'ওই যে,' বলল জুনো।

জুনোর লম্বা করা হাত দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল মনিকা। ওদিকে, আশ্চর্য রকম কাছাকাছি, তিনটে বিরাট কালো সেইল ফিন—ওদের ফ্লোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। তাকিয়ে আছে ও, নিঃশ্বাসের তিনটে মেঘ বিস্ফোরিত হয়ে উপরে উঠল, যেন কোনও সংকেত দিয়ে।

'কী করছে ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন।

'আমাদের চারদিকে সাঁতরাচ্ছে,' বলল জুনো।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি! আসলে করছেটা কী?'

'আসলেও সাঁতরাচ্ছে,' বলল রানা।

'কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল অস্টিন।

জুনো বলল, 'ওগুলো বোধহয় বাকি সবার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় আছে।'

'ওরে বাবা, কী ভয়ঙ্কর!' অস্টিনের গলায় ভয়। 'তুমি সত্যি তা-ই মনে করো?'

'কে জানে!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'আমি জানতে চাইছি, ওগুলো কি সত্যি অতটা ইন্টেলিজেন্ট?' অস্টিন সিরিয়াস।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল রানা।

'কী সাংঘাতিক!'

নীরবতা।

মনিকা ভাঙল সেটা। 'আমরা তা হলে কী করব?'

ধমকে উঠল অস্টিন। 'করার আবার কী আছে!'

'কেন, মারব,' বলল মনিকা।

'কীভাবে?' কোটি টাকার প্রশ্ন।

'দেখতে হবে কী আছে আমাদের কাছে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল নিকা। রানা কিছু বলল না, তবে ওর সঙ্গে ঘুরে ক্যাম্পের দিকে ফরছে।

'কীসের জন্যে দেখতে হবে কী আছে?' পিছন থেকে প্রশ্ন করল অস্টিন।

'ওগুলোকে মারার জন্যে,' গলা চড়িয়ে জবাব দিল মনিকা।

'তিনটে হার্পুন,' বলল রানা।

'আর কুড়াল, যদি খুব কাছে যাও আর কি।'

'রাইট।'

'ও, হ্যাঁ, ডাইনামাইট,' বলল মনিকা। 'ভাল কথা, আমরা কি বুলেটগুলো কোনওভাবে ব্যবহার করতে পারব? মানে, রাইফেল

না থাকুক, বেশ কিছু অ্যামিউনিশন তো আছে।'

'কী জানি,' বলল রানা। 'চিন্তা করে দেখতে হবে।'

'ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে তো চট-জলদি চিন্তা করতে পারতে হয়, নাকি আমি ভুল জানি?' মনিকার চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

হেসে ফেলল রানা। 'হার্পুন আর কুড়ালটা নিয়ে এসো, কেমন? ফিরে এসে শুনো বুলেট দিয়ে কী করা যায়।'

ক্যাম্পের নানা জায়গায় ছড়ানো রয়েছে হার্পুনগুলো। সিন্ধুঘোটকদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর কেউ কুড়িয়ে এনে তুলে রাখেনি। তবে কুড়ালটা রয়েছে ফায়ার-ট্রের পাশে। ওগুলো নিয়ে রানার কাছে ফিরে এল মনিকা।

টয়লেটের পাশে বরফে হাঁটু গেড়ে রয়েছে রানা। 'ধন্যবাদ,' বলল ও। তারপর লাল ও সাদা ডোরা কাটা একটা বান্ডিল উঁচু করে ধরল। 'এটা কাটো, প্লিজ।' কুড়াল দিয়ে সাবধানে কাটল ওটা মনিকা। 'ধন্যবাদ।'

'কী জিনিসটা?'

'চট-জলদি আমি যা চিন্তা করেছি,' বলল রানা। একটা খালি টিনের কৌটায় লাল ও সাদা বান্ডিলটা চাপ দিয়ে ভরছে। 'এখন শুধু দরকার এটা দিয়ে লক্ষ্যস্থির করার একটা উপায়।'

মনিকা দেখল রেমিংটন অ্যামিউনিশনের ছ'টা রাউন্ড বার্নিং ফিউজ দিয়ে জড়িয়েছে রানা, তারপর বান্ডিলটাকে টিনের কৌটায় গুঁজে দিয়েছে। মাঝখান থেকে বেরিয়ে রয়েছে ডোরা কাটা এক ইঞ্চি ফিউজ।

'ঠিক,' সায় দেওয়ার সুরে বলল মনিকা। 'লম্বা কিছু। ওটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা জিনিস।'

'তা আর বলতে, অকৃত্রিম দু'ধারি তরোয়াল।'

'নামটা ভাল দিয়েছ। কিন্তু এটাকে দিয়ে আমরা লক্ষ্যস্থির করব কীভাবে? মানে, শুধু ছুঁড়তে যাওয়াটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক হবে। কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে।'

‘জানি, জানি।’ রানার চোখ দুটো ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ‘পেয়েছি। আমাকে একটা মগ দাও।’

‘মগ? মগ দিয়ে কী হবে?’

‘আগে দাওই না।’

মাঝারি আকারের, এনামেল করা, নীল মগ ব্যবহার করছে ওরা। শক্ত, তবে হালকা। ছুটে গিয়ে একটা নিয়ে এল মনিকা। টিনের কৌটাটা কোনওরকমে ঢুকল ওটার ভিতরে, ঢোকার পর আঁট হয়ে থাকল। একটা তিন-ফুটী তক্তার শেষ প্রান্তের সঙ্গে মগের হাতলটা বাঁধল ওরা।

‘হয়েছে,’ বলল রানা। ‘কৌটা টুকরো টুকরো হবে, মগ ভাঙবে, হাতলটা অবশ্যই খুলে আসবে, রশিও ছিঁড়বে—তবে বুলেটগুলো চারদিকে ছুটতে শুরু করার আগে নয়।’

‘এটাকে কোনদিনই অ্যাটম বোমার বিকল্প হিসেবে চালানো যাবে না।’

ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে অস্টিন। ফ্লোর কিনারা থেকে এখানে আসতে মাত্র দশ সেকেন্ড লেগেছে ওর। ‘ওগুলো চলে গেছে,’ বলল ও। ‘সবগুলোকে ডাইভ দিতে দেখলাম। জুনো অবশ্য বলছে তলা দিয়ে...’

ঢিব্!

লাফিয়ে উঠল ফ্লো, নেটের ভিতর ফাটলটা থেকে ছলকানো পানি ওদের পায়ের কাছে গড়াচ্ছে। সিন্ধুঘোটকদের লাশগুলো নড়ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এল জুনো।

ক্বড়াৎ!

দ্বিতীয় আওয়াজটা এলো একই জায়গা থেকে, দক্ষিণের নরম বরফে কুঁজ তৈরি হলো, ওটা ভেঙে উঠে এল কিলারদের সবচেয়ে বড়টা—ক্ষতবিক্ষত মুখ থেকে পানি নেমে আসছে, পিছনদিকে মেঘে পরিণত হচ্ছে বিস্ফোরিত নিঃশ্বাস।

আড়মোড়া ভাঙছে বরফ। এখানে সেখানে ফাটল ধরছে

মড়মড়, কটকট, ঠাসঠাস, কড়-কড়াৎ আওয়াজ শুনে ওদের গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। চোখে ঘৃণা নিয়ে তিমিটা চারদিকে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেল।

সদ্য তৈরি গর্তের কাছে পড়ে থাকা সিন্ধুঘোটকের লাশটা একটু একটু করে কাত হচ্ছে, যেন নিজের শক্তিতেই। ওটার চাপে গর্তের কিনারার বরফ ভেঙে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝপাৎ করে কালো পানিতে পড়ল ওটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর তিনটে ফিনকে আবার একসঙ্গে দেখা গেল, ফ্লোরটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

'ডাইনামাইট,' বলল জুনো। 'শুধু যদি ওগুলোই এখন আমাদেরকে বাঁচাতে পারে।'

'আত্মহত্যা করা হবে না তো?' রানা সন্দিহান।

'আর কী আছে আমাদের?' প্রশ্ন করল অস্টিন।

'কিছুই নেই,' ঢোক গিলে বলল মনিকা।

'কাজেই ডাইনামাইটই,' বলল জুনো। 'কোথায় ওগুলো?'

'এখানে।' টয়লেটের ছায়া থেকে কাঠের বাক্সটা টেনে এনে খুলল রানা।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ কাটছে, একটা টিমের মত নিঃশব্দে কাজ করছে সবাই। কুড়ালটা ধরে আছে মনিকা, ছোট করে কয়েক প্রস্থ ফিউজ কাটছে রানা, জুনো আর অস্টিন ব্যস্ত হাতে ডাইনামাইটের মোটা স্টিকে ফিউজ জড়াচ্ছে।

'ছ'টা স্টিক যথেষ্ট?' জিজ্ঞেস করল অস্টিন।

'বোধহয়।'

'ফ্লোর যে অবস্থা, কতটুকু সহ্য করতে পারবে বলা মুশকিল।' বাক্স আর ঢাকনিটা তুলল রানা।

আগে যেখানে সাপ্লাই তাঁবু ছিল এখন সেখানে গর্ত, সেটাকে পাশ কাটিয়ে রানার পিছু নিল ওরা, একশ' ফুট হেঁটে ফ্লোর কিনারায় এসে থামল। এই পুব দিকের কিনারাটাই ওদের দৃষ্টিতে

সবচেয়ে নিরেট প্ল্যাটফর্ম বলে মনে হয়েছে।

ঢাকনিটা নামিয়ে রাখল রানা। ফিউজ সহ বাক্সটা রাখল একটু দূরে—বলা তো যায় না।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, শান্ত সাগরের উপর চোখ বুলিয়ে কালো ফিন খুঁজছে। ওদের সবার হাতে দেশলাই থাকলেও, ডাইনামাইটের স্টিক রয়েছে শুধু জুনো আর অস্টিনের কাছে। প্রতিটি মিনিট যেন নিজে থেকেই দীর্ঘ হচ্ছে, শেষ হতে চাইছে না। টেনশন অসহ্য হয়ে ওঠায় এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিচ্ছে ওরা।

অবশেষে রানার দিকে ফিরল মনিকা, বলল, 'রানা...'

'ওই!' কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠস্বর, হাত তুলে দেখাল। দুশ' গজের মত দূরে, তিনটে ফিন নিঃশব্দে বাতাস কেটে এগোচ্ছে, প্রকাণ্ড গোলাপ কাঁটার মত। আবারও একযোগে বেরিয়ে আসা নিঃশ্বাস ওগুলোর মাথার উপর মেঘ তৈরি করল, তারপর শব্দটাও শোনা গেল।

নিজের ফিউজ ধরাল জুনো।

অস্টিনের কাঠিটা নিভে গেল। আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে ওর, দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বালতে সময় নিচ্ছে।

দ্রুত কয়েক পা সামনে এগোল জুনো, তারপর সবটুকু শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিল স্টিকটা।

বাঁকা একটা পথ ধরল ওটা, ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটল, ম্লান আকাশের গায়ে ধোঁয়ার রেখা তৈরি করছে। একসময় শুরু হলো নীচে নামা। টার্গেটের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই পড়ে গেল। খুব তাড়াতাড়ি বিস্ফোরিত হলো, পানির সারফেস এক গজ দূরে থাকতে। বাতাসের একটা ঢেউ তৈরি হলেও, পানিতে কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না।

এতক্ষণে নিজের ফিউজটা ধরাতে পেরেছে অস্টিন। ঝট করে পানির দিকে ঘুরল ও। কিন্তু ততক্ষণে তিমিগুলো অদৃশ্য হয়ে

গেছে দেখে স্থির হয়ে গেল।

'তবু আন্দাজ করে ছোঁড়ো,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কী? ও।' যত জোরে পারল ছুঁড়ল অস্টিন। দীর্ঘ একটা ধনুকের আকৃতি পেল ওটার পথ, বিস্ফোরিত হলো সারফেসের নীচে ডোবার পর। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, সাগরের পানি একটা স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে লাফিয়ে উঠল।

'এতে আসলে কিছুই হচ্ছে না,' বলল রানা।

'কী আশ্চর্য, আমি আমার সাধ্যমত করছি,' রেগে উঠে বলল অস্টিন।

'না, অস্টিন, শুধু তোমাকে বলছি না। গোটা ব্যাপারটাই। শোনো, আগুনটা থেকে একটা মশাল জ্বেলে আনুক মনিকা।' মাথা ঝাঁকিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল মনিকা। 'দুজন মিলে ওটা ধরে থাকো, আমরা দুজন ফিউজে আগুন ধরিয়ে স্টিকগুলো ছুঁড়ি।'

'বেশ,' বলল জুনো।

অস্টিনও মাথা ঝাঁকাল।

ঢিব্!

ফুলে উঠল ফ্লো। ঝাঁকিটার সঙ্গে সবাই ওরা হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করল। ক্যাম্পের দক্ষিণে, সিন্ধুঘোটকদের লাশগুলো যেখানে পড়ে আছে, নরম ও দূষিত বরফ ভেঙে মাথা তুলল দুটো তিমি। কেউ বাধা দেওয়ার আগেই অস্টিনের অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল।

এবার ওর দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভল না, দপ্ করে আগুন ধরল ফিউজে। ডাইনামাইটের স্টিকটা ধরবার জন্য হাত বাড়াল রানা, কিন্তু নাগাল পাওয়ার আগেই ঘুরে গেছে অস্টিন; তিমি দুটোকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েও দিয়েছে স্টিকটা।

সাতাশ

ক্যাম্পের উপর দিয়ে অলসভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে বিস্ফোরকের স্টিক, হিসহিস করে জ্বলছে উজ্জ্বল হলুদ শিখা, যাওয়ার পথে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে ফুলকির ঝুরি। রানা ডাকল: 'মনিকা!'

আগুন থেকে চোখ তুলতেই মনিকা দেখল স্টিকটার পতন শুরু হয়েছে, ইতোমধ্যে ক্যাম্প থেকে যথেষ্ট দূরে সরে গেছে ওটা, তবে ফ্লোর উপরেই পড়তে যাচ্ছে। তিমিগুলোকেও দেখল, সদ্য তৈরি গর্তে ডুব দিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সাদা-কালো মাথা দুটো।

আড়াল পাওয়ার জন্য ডাইভ দিল মনিকা, গড়িয়ে উত্তপ্ত ট্রের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে এল। খালি গর্ত দুটোর মাঝখানে পড়ল স্টিকটা, পড়েই মসৃণ সারফেসে পিছলাতে শুরু করল। দু'গজ দূরে সবচেয়ে বড় সিন্ধুঘোটকের লাশ পড়ে রয়েছে, সরাসরি ছুটে গিয়ে ওটার গায়ে গোঁজের মত আটকে গেল ডাইনামাইট।

তার পর ফাটল ওটা। সিন্ধুঘোটক অদৃশ্য হলো, তার বদলে হাওয়ায় লাল-খয়েরি স্তম্ভ খাড়া হতে দেখল ওরা। বাতাসের সঙ্গে ছুটল আওয়াজটা, হ্যাঁচকা টান দিল তাঁবুতে, ফায়ার-ট্রে থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ফুলকির বিরাট একটা মেঘ।

মনিকার ফুসফুস খালি হয়ে গেছে, কয়েক সেকেন্ড আচ্ছন্ন ও অবশ হয়ে পড়ে থাকল। পুরুষ তিনজন চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে—জুনো আর অস্টিন ফ্লোর দক্ষিণ দিকে, রানা মনিকার

দিকে।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল মনিকা, পরমুহূর্তে হঠাৎ আবার সটান পড়ে গেল। কর্কশ ঘর্ঘরে একটা আওয়াজ শুনল ওরা, সঙ্গে মিশে আছে পানি ছলকানোর শব্দ, চারদিকের বাতাসকে যেন ভরাট করে তুলছে।

ফ্লো ফুলে উঠছে আর দুলছে। তাঁবুর ভিতরের ফাটল থেকে জলোচ্ছ্বাসের একটা পরদা সগর্জনে উপরে উঠল। রশিগুলো নেটটাকে জায়গামত ধরে রেখেছে, এক করে রেখেছে ক্যাম্পকেও, প্রতি মুহূর্তে গোঙাচ্ছে আর প্রসারিত হচ্ছে। কমলা রঙের চৌকো নেট মোচড় খেয়ে প্রায়ই আকৃতি হারাচ্ছে, আবার ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে নিজের চেহারা।

ফ্লোর দক্ষিণ-পশ্চিমে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে পাহাড় ।

বিস্ফোরণের শক্তি খুব বেশি না হলেও, সিন্দুঘোটকের প্রকাণ্ড লাশটা লাফিয়ে উঠে বরফের যা ক্ষতি করবার করে ফেলেছে। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকের বরফে একাধিক গর্ত তো ছিলই, ওদিকের বরফ যেমন পাতলা তেমনি নরমও।

বিস্ফোরণের ধাক্কাটা সেই একেবারে পাহাড় পর্যন্ত ফাটল তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট। ফ্লোর দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হলো, স্রোতের সঙ্গে ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে ওভারহ্যাংটা নড়ে উঠল, ঠেক দেওয়ার কিছু না থাকায় ধীরে ধীরে কাত হয়ে যাচ্ছে। তারপর বিপুল পানি ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সাগরে।

ওদের ফ্লো এখন বুলেটের আকৃতি পেয়েছে, ভোঁতা দিকটা পশ্চিমে মুখ করা। একশ' পঞ্চাশ ফুট লম্বা, সত্তর ফুট চওড়া, শক্তভাবে বিছানো নেটের সাহায্যে এক করা। প্রায় পুরো জায়গাটাই ক্যাম্পের দখলে, চল্লিশফুটী রশিগুলো চারদিক থেকেই পানির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে। নেটের উত্তর প্রান্তের দুই কোণে যেখানে তাঁবু ছিল, এখন সেখানে গর্ত।

'শালার কপাল সত্যিই এবার পুড়েছে!' শব্দ করে ঢোক গিলল অস্টিন, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, শরীরটা কাঁপছে।

'কোথায় ওগুলো?' ধৈর্য হারাবার সুর জুনোর গলায়। সবাই জানে যে এখন যেখান দিয়েই উঠুক তিমি, সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না—ওদের সবাইকে পানিতে পড়তে হবে।

'মনিকা?' ডাকল রানা।

'ভাল আছি।' আবার দাঁড়াল মনিকা। ও আহত হয়নি দেখে স্বস্তি ফুটে উঠল রানার চেহারায়।

'কী করব এখন আমরা?' ম্লান, করুণ সুরে জানতে চাইল অস্টিন; গভীর সংকটে পড়ে এখন সে যে ভয়ানক অসহায় বোধ করছে, এটা গোপন করবারও কোনও চেষ্টা নেই তার মধ্যে।

'মারব,' বলল রানা। 'যতক্ষণ পারা যায় এই একটাই কাজ আমাদের। তা না হলে ওগুলোর হাতে মরতে হবে।'

'কিন্তু আমরা কি জিততে পারব?' রানার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল অস্টিন।

'জিততেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'এ-ধরনের সংকটে সাধারণত দুটো শত্রু থাকে—একটা কমন—তার নাম ভয়। এই ভয়কে আগে জয় করতে হবে। তা না হলে আসল বিপদ হয়তো কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু ভয়ই মেরে ফেলবে আমাদের।'

অস্টিনের চেহারায় খানিকটা যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে এল।

'ওগুলো কি বুঝতে পারছে, আমাদেরকে খুন করা এখন পানির মত সহজ?' জিজ্ঞেস করল জুনো। পানির একেবারে ধারে চলে গিয়ে সামনেটা ভাল করে দেখছে ও, ডাইনামাইটের স্টিকটা দু'হাতে লোফালুফি করছে। 'কোথায় ওগুলো?' আবার জিজ্ঞেস করল।

একটা গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্টিন, ঠিক যেখানটায় ওদের সাপ্লাই তাঁবুটা ছিল; একটু ঝুঁকে পানির

গভীরতায় কিছু আছে কি না দেখবার চেষ্টা করছে। 'ওই যে,' বলল ও। 'এক শালা উঁকি-ঝুঁকি মারছে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জুনো। ওর সঙ্গে রানাও ঝট করে ঘুরল।

'ওখানে,' দেখাল অস্টিন। ওর হাত গর্তটার উপর লম্বা হয়ে রয়েছে।

পানির ছোট বৃত্ত থেকে উঠে এল তিমি। লিডারকে যেমন করতে দেখেছে, প্রসারিত হাতটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল। তবে হামলাটা সম্পূর্ণ করবার আগে ওটার ফ্লিপার দুটো দু'দিকের বরফে বাধা পেল, ফলে ভাঁজ খেয়ে গেল শরীরটা, বিরাট হলুদ দাঁতগুলো খটাস করে বন্ধ হলো ফাঁকা বাতাসে।

অস্টিন চেঁচাচ্ছে, পিছু হটতে গিয়ে আছাড় খেল। ওর নাগাল পাওয়ার জন্য আবার লাফ দিল কিলার। শরীরটাকে গড়িয়ে দিল অস্টিন, সাদা চিবুক এক ইঞ্চির জন্য ওর নাগাল পেল না।

খপ্ করে একটা রুপালি হার্পুন তুলে নিয়ে সামনে এগোল রানা, দেখতে পেয়ে আঁৎকে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল মনিকা, বিড়বিড় করছে, 'না, প্লিজ, না!'

পিছলে এসে তিমিটার ঠিক পাশে থামল রানা, দুর্বল একটা জায়গা খুঁজছে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাচ্ছে অস্টিন, ওকে ধরতেই ব্যস্ত হয়ে আছে কিলারটা, রানার দিকে খেয়াল নেই।

মাথা নয়, ভাবল রানা, ওটা মোটা হাড় দিয়ে ঢাকা। চোখও নয়, ওগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে না। তা হলে ঘাড়ের পিছনটা। হ্যাঁ!

আবার প্রকাণ্ড শরীরটা ঝাঁকিয়ে সামনে এগোল তিমি, নিঃশব্দে। ওটার এই নীরবতা রোমহর্ষক। বরফ কেঁপে উঠল। টলল রানা, তবে পড়ল না। ঘুরে গর্তটার আরেকদিকে চলে এল ও, চোখ সরু করে একটা টোল খুঁজছে, যেটা দেখে বোঝা যাবে ব্লো-হোলটা কোথায়।

আপাতত হতাশ হয়ে গর্তের ভিতর নেমে যাচ্ছে কিলার, শ্বাস নেওয়ার সময় ফাঁক হলো ব্লো-হোল। সবটুকু শক্তি দিয়ে আঘাত হানল রানা। কিলারের শরীরের ভিতর বর্শার প্রথম দু'ফিট বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে দৃশ্যটা দেখল মনিকা, পরম স্বস্তিতে কান্না পাচ্ছে ওর।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মাথা তুলল কিলার, প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করে আছে, অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ দুটো অস্থির।

কিলার সবেগে মোচড় খাচ্ছে, ওটার ঘাড়ে গাঁথা হার্পুন শিস কাটছে বাতাসে, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে দূরে সরে আসছে রানা। গলায় নিজের রক্ত জমে ওঠায় বিষম খেল কিলার, বার বার ঝাঁকিয়ে মাথাটাকে মুক্ত করতে চাইছে, কিন্তু ওটার পিছন থেকে বেরিয়ে আসা ইস্পাতের অপরপ্রান্ত বরফের গায়ে বেধে গেছে, কোনওমতে বেরুতে দিচ্ছে না।

ঘনঘন খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে তিমির মুখ। কখনও এদিক, কখনও ওদিক তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু গর্ত থেকে বেশি উঠতে গেলেই দু'পাশের ফ্লিপার দুটো আটকে যাচ্ছে বরফে, ঝাঁকি খেয়ে নেমে যাচ্ছে খানিকটা বিশ ফুটী শরীর, সেই সঙ্গে ভেঙে ফেলছে ফ্লোর ভঙ্গুর বরফ।

আতঙ্কিত, বিহ্বল, অসুস্থ, অথচ চোখ ফেরাতে পারছে না রানা আর অস্টিন; দেখছে কী তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে নিজেকে মুক্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তিমিটা। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল ওটা। মুখ আর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। শেষ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল তরুণ কিলার ওয়েইল।

অস্টিনের পাশে এসে দাঁড়াল রানা, ঝুঁকে সিধে হতে সাহায্য করল তাকে। তারপর দুজন একযোগে ঘুরে ক্যাম্পের দিকে তাকাল। আগুনের ধারে হাঁটু গেড়ে রয়েছে মনিকা। ওর পিছনে

জুনোও হাঁটু গেড়েছে বরফের একেবারে কিনারায়, ডাইনামাইটটা এখনও হাতে, চোখ ঘুরিয়ে সাগরটা দেখছে।

বরফের কিনারা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে দুটো কালো সেইল ফিন চোখে পড়ল, এত কীসের শব্দ দেখবার জন্য এইমাত্র এদিকে রওনা হয়েছে।

পিছনদিকে না তাকিয়ে জুনো বলল, 'ধরাও।' ওর গলার আওয়াজ এত অস্পষ্ট যে কোনও রকমে শোনা গেল। এখন ধরাতে পারলে দুটোকেই মারতে পারব আমি, ভাবল ও। ফিন দুটো যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে।

'ধরাও!' চাপা গলায় তাগাদা দিল জুনো।

রানা দেখতে পাচ্ছে জুনোর পিছনে ডিনামাইটের বাক্সটা ধীরে ধীরে বরফের নীচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'আল্লাহ!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'ফ্লো ভেঙে যাচ্ছে!' ডাইভ দিল হঠাৎ ভিজে ওঠা হিম বরফে। 'জুনো, ভাঙছে এটা!'

তরুণ তিমি স্থির হয়ে যাওয়ার আগে শেষ যে ঝাঁকিটা দিয়েছে, তার ফল। পরপর কয়েকটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, কেউ যেন স্মল আর্মস প্র্যাকটিস করছে। কালো ফিন দুটো, তার মধ্যে একটা রানার চেয়েও লম্বা, আরও কাছে চলে আসছে।

'জুনো!' ডাইভ দিলে কী হবে, নাগাল পাওয়া যাবে না; বুঝতে পেরে হাতটা লম্বা করে দিল রানা। ওর এস্কিমো বন্ধু, অবশেষে ঘাড় ফিরিয়ে বিপদটা দেখতে পেয়েছে, একই সঙ্গে বাড়িয়ে দিল নিজের হাত যতটুকু সম্ভব। দুটো হাত প্রায় এক হলো। ব্যবধান মাত্র এক কি দু'ইঞ্চির।

ওই এক কি দু'ইঞ্চির ব্যবধানটা আর ঘুচলই না। মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড হয়ে উঠল অনন্তকাল, ওভাবেই স্থির হয়ে থাকল প্রকৃতি, সময় এবং প্রাণপ্রিয় দুই বন্ধু—পরস্পরের নাগাল পাচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না।

তারপর খেয়ালি একটা স্রোত এসে ফ্লোর চিড় ধরা দুটো

অংশকে আলাদা করে ফেলল। চোখে অবিশ্বাস আর বিপন্ন ভাব নিয়ে প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে স্রোতের টানে দূরে সরে যেতে দেখছে রানা।

হাত-পা মেলে দিয়ে যে ভেলাটায় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে জুনো, আকারে সেটা ওর চেয়ে সামান্য যদি বড় হয়। বরফের ছোট্ট টুকরোটা পাক খাচ্ছে, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর্কটিক মহাসাগরের আরও একটা বলিকে।

'জুনো!' আর্তনাদ করে উঠল রানা, এরইমধ্যে অস্টিনের হাত থেকে হার্পুনটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে বিশ ফুটী রশিটা খুলে ফেলেছে ও। বিদ্যুৎ বেগে ছুঁড়ল ওটা।

অস্থির ভেলায় উঠে বসে ওটা ধরার চেষ্টা করল জুনো, কিন্তু নাগালের কাছাকাছিও পেল না। লম্বা রশিও আছে, তবে সেটা ক্যাম্পের দূরপ্রান্তে: সিন্ধুঘোটকদের হামলার সময় মনিকা যেখানে রেখেছিল।

'অস্টিন!' রানার নির্দেশ কর্কশ। 'লম্বা রশিটা!'

তিমিটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটছে অস্টিন, উন্মত্ত ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে পার হলো গর্তটা। তারপর রশিটা পেল, এবার ফিরে আসছে। রশি ধরা হাতটা সামনে বাড়ানো, রানার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। লাফ দিয়ে গর্ত পেরুল, এবার তিমিটাকে পাশ কাটাচ্ছে...

আবার লম্বা করা হাতটা দেখতে পেল তিমি। সংক্ষিপ্ত, অথচ রক্তাক্ত যে শিক্ষা হয়েছে, তারপর কি ওটা আর অস্টিনকে পাশ কাটাতে দেয়! গোটা শরীরটাকে যেন স্প্রিং বানিয়ে শেষবারের মত বিরাট একটা লাফ দিল কিলার ওয়েইল।

এবার বরফের বাধা চুরমার করে দিয়ে উঠে এল দু'পাশের ফ্লিপার। অস্টিনের একপাশে আঘাত করল ভোঁতা নাকটা, বরফ থেকে শূন্যে উঠে গেল তার পা দুটো। পতনের পর শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে সে, ফুসফুসে বাতাস না থাকায়

হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে।

অস্টিনকে লক্ষ্য করে চোয়াল বন্ধ করল কিলারটা, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য নাগাল পেল না। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, রশির ভারী কুণ্ডলী কঁধের উপর তুলল অস্টিন, তিমিকে আঘাত করল ওটা দিয়ে।

প্রকাণ্ড হাঁ-র ভিতর গপ্ করে কুণ্ডলীটা পুরে নিল কিলার, মাথা ঝাঁকিয়ে অস্টিনের হাত থেকে ছাড়াল, খটাস করে আবার বন্ধ করল পঞ্চাশটা দাঁত, নাইলনের মোটা রশি এক কামড়ে অসংখ্য টুকরোয় পরিণত করল। তারপর আবার লাফ দিল সামনে।

'অস্টিন!' রানার ডাকটা হাহাকার হয়ে উঠল।

এবার মরিয়া হয়ে সাহায্য করতে দাঁড়িয়ে গেল মনিকা। বুলেট আর তক্তা দিয়ে বানানো ঠেকার কাজ চালাবার অস্ত্রটা তুলে নিয়েছে ও, ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে থাকা ফিউজে আগুন ছোঁয়াল।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যান্ত হয়ে উঠল ওটা। নিজের সামনে তক্তার গোড়াটা ধরে আছে মনিকা পুরোপুরি লম্বা করা হাতে, তারপর দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে সরাসরি তিমির গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিল ওটা।

ঠিক ওই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো প্রথম রাউন্ড, প্রচণ্ড ঝাঁকি মনিকার হাতটাকে প্রায় ছিঁড়ে নেওয়ার উপক্রম করল। আরও সহস্রগুণ জোরে ঝাঁকি খেয়ে পিছাল কিলার, তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ঘুরে পালিয়ে আসছে মনিকা, রানার হাতেবানানো অস্ত্রটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল বাকি ম্যাগনাম শেলগুলো ফাটতে শুরু করায়। তিমির ভিতর বিস্ফোরিত হয়ে মাথার পুরোটা চূড়া উড়িয়ে দিল বুলেটগুলো। রশির কিছু অংশ এখনও আটকে আছে চোয়ালে, সেগুলো নিয়েই গর্তের ভিতর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে কিলার, পিছনে রেখে যাচ্ছে মরচে রঙের লম্বা একটা দাগ।

৭

আটাশ

রানার পাশে বরফে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিকা, শান্ত সাগরের দিকে চোখ, দুজনেই যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। ওদের কাছ থেকে ষাট কি সত্তর গজ দূরে বরফের ছোট্ট ভেলাটায় হাঁটু গেড়ে রয়েছে রানার এস্কিমো বন্ধু ডট জুনো, মাঝখানের পানিতে আর কিছু নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রয়েছে সে। স্রোতের মধ্যে পড়ে দ্রুত আরও দূরে সরে যাচ্ছে ভেলাটা।

বাকি দুটো কিলার আপাতত চলে গেছে।

'আমাদের কিছু করার নেই,' বলল মনিকা।

মাথার ভিতর চিন্তার ঘূর্ণি বইছে, ঝট করে ওর দিকে ফিরল রানা। চোখ দুটো গাঢ়, মুখটা সরু, ফেটে যাওয়া ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আগে মনিকা লক্ষ করেনি, ওর মুখের কোণে ঠাণ্ডাজনিত ক্ষত দেখা দিয়েছে। 'তুমি দেখছ না...' আওয়াজটা এমন ভাঙা যে নিজের গলা চিনতে পারল না রানা। নিজের ব্যর্থতায় নিদারুণ অসহায় বোধ করছে, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে নীরবে। পানির ধারা বরফ হওয়ার আগেই হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে ফেলল। '...ও আমার বন্ধু।'

কথাটা পুনরাবৃত্তি করল মনিকা, প্রতিবন্ধী শিশুর মত, নরম সুরে, 'আমাদের কারও কিছু করার নেই।'

হঠাৎ বিদ্রোহ করে উঠল রানার মন। ভিতর থেকে কে যেন ওকে বলছে—হার মেনো না! কেন হার মানবে? 'কিছু একটা নিশ্চয়ই...'

'রানা!' জরুরি সুরে অস্টিন ডাকল। 'জুনো! হাত নাড়ছে ও!'

ঝট করে ঘুরল রানা। সরে এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল মনিকা। সাগরের গায়ে কালো একটা আকৃতি এখন জুনো।

'কী আছে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নেই, আর কিচ্ছু নেই।'

'ডাইনামাইট...'

'ওগুলো ডুবে গেছে,' শান্ত সুরে ফিসফিস করল মনিকা, দম দেওয়া পুতুলের মত।

বরফের উপর বসে পড়ল রানা। নিজেও জানে সত্যি কারও কিছু করবার নেই। সামান্য একটু বাতাস লাগল চোখে, আবার পানি মুছল ও। তারপর, সাগরের উপর থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ভেসে এল।

জুনো হাত দুটো নাড়ছে। 'রা-আ-আ-না-আ-আ!' যত জোরে পারা যায় চিৎকার করে বন্ধুর নাম ধরে ডাকছে সে, জানে না অত দূর থেকে রানা শুনতে পাবে কি না।

হাত দুটো খুব সাবধানে নাড়ছে জুনো, এমনকী এই সামান্য নড়াচড়াতেও ওর হাঁটুর নীচে দুলে উঠছে বরফ, কিনারা থেকে ছলকে ওঠা পানিতে ওর সিলস্কিন বুট আর ট্রাউজার ভিজে যাচ্ছে।

অনেক দূরে, চিনতে পারা যায় কি যায় না, রানার কাঠামোটাও ওর মত মাথার উপর হাত তুলে নাড়ছে। আনন্দে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তরটা ছেয়ে গেল—যাওয়ার সময় এইটুকুই তাঁর কাছে চাওয়ার ছিল আমার, প্রাণপ্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে যেন বিদায় নিতে পারি।

বিরতি নেই, হাত দুটো এখনও নাড়ছে জুনো, ভুলে গেছে ওর গ্লাভ পরা বাম হাতে ডাইনামাইটের স্টিকটা এখনও ধরা। রানার নামটা উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছু বলবার নেই ওর, শুধু আশ্বস্ত

করতে চাওয়া এখনও সব ঠিক আছে। কাজেই হাত দুটো নেড়েই যাচ্ছে ও। বরফের ভেলাটাও তার সঙ্গে দুলছে।

খুদে ঢেউগুলো বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে, নীলচে-খয়েরি আর কালো। ওর দিকে এগিয়ে আসছে ওগুলো, কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে দেখছে জুনো।

তারপর পরিষ্কার হলো নিরেট কালো আকৃতি, তীরচিহ্নের মাথার মত স্পষ্ট, ছুরির মত ধারাল। সগর্জনে শূন্যে উঠল জলকণার বিস্ফোরণ। ভেলাটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল তিমি দুটো।

একবার চোখ বুজল জুনো। তারপর ধ্যান শুরু করল, সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে।

বেশ কিছু সময় পর চোখ মেলে তাকাল, দেখল ফিনগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জুনো, ঘনঘন হাত নাড়ছে। সাড়া দিয়ে রানাও হাত নাড়ল। হাত দুটো আরও উঁচু করল জুনো, থামাল: কী যেন...

মৃদু বাতাস চাপ দিচ্ছে ওর পিঠে। ভেলাটা অলসভঙ্গিতে নড়ছে। একটা ঢোক গিলল জুনো: ফ্লোর দিকে এগোচ্ছি না?

কিনারা টপকে ছোট ছোট ঢেউ বরফের উপর উঠে আসছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর হাঁটুর কাছে। না, কোনও সন্দেহ নেই, ভেলা নড়ছে। ফিরতি পথে যাচ্ছে ওটা, ফ্লোর দিকে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দাঁড়াল জুনো, ওর খাড়া কাঠামো আরও ভাল পাল হিসাবে কাজ করবে। হে যিশু, হে মেরি, শুধু যদি বাতাসটা এভাবে বইতে থাকে!

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে ফ্লোতে দাঁড়ানো প্রতিটি কাঠামো। ওগুলোর রঙও পরিষ্কার হচ্ছে। জুনোর হৃৎপিণ্ডটা যেন ওর কণ্ঠায় উঠে এসে লাফাচ্ছে। পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো মেলে দিয়েছে নিজের দু'পাশে, যেন বাতাসে চড়ে

ফিরে আসছে সে।

এক মিনিট পার হলো। আরও এক মিনিট। অসহ্য দীর্ঘ হয়ে উঠছে প্রতিটি মিনিট, এমনকী সেকেন্ডগুলোও।

'আর বেশি দূর নয়!' রানার চিৎকার ভেসে এল।

'নয়, দোস্ত!' জবাব দিল জুনো। 'এই এসে পড়ছি...'

বাতাস থমকাল। মুখ তুলল জুনো। আকাশে পাতলা হচ্ছে মেঘ। পরিবর্তন আসছে আবহাওয়ায়। হয়তো তাপমাত্রা একটু বাড়বে, ভাবল ও। ভেজা কাপড়ে কাঁপছে।

'একটা ঝড়ও আসতে প্যারে,' গলা চড়িয়ে বলল ও, বলবার মত ভাল আর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

'কী?'

'আবহাওয়া। সম্ভবত...' এই সময় জুনোর পিছনে উথলে উঠল সাগর। উথলানো বিপুল পানিকে চারপাশে সরিয়ে দিয়ে সারফেসের উপর মাথা তুলল কিলার—ফুটের পর ফুট উঠছেই, তিনতলার জানালার সমান উঠল, আকাশের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে।

এখনও থামেনি, গজের পর গজ উঠছেই; মুখটা ক্ষতবিক্ষত, কালো তরল চোখ, পেট যেন সাদা পাহাড়-প্রাচীর। আরও উঠছে, উঠতেই থাকল, যতক্ষণ না খুদে ভেলাটার শেষপ্রান্তের কিনারায় পৌঁছাল ফ্লিপারগুলো।

জুনোর নাগাল পেল ওটা। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই ফ্লিপার দিয়ে ধরল ওকে।

টলমলে পায়ে পিছু হটছে জুনো, তারপর অনুভব করল ওর কাঁধ দুটো তুষার-ধবল পেটে ঠেকে গেছে। নিজের শরীরের সঙ্গে ওকে চেপে ধরে রেখেছে কিলার ওয়েইলদের লিডার।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে জুনো: 'আইপালুকভিক! আইপালুকভিক!' এস্কিমোদের দেবতার নাম জপছে সে, ইনি আইসবার্গের তলায় অবস্থান করেন, উত্তুরে বাতাসের দাঁতও বলা

হয় তাঁকে, শক্ত কামড় দেন এবং খেয়ালখুশি মত যখন-তখন ধ্বংসকাণ্ড ঘটান, ধরতে পারেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ।

খুনি তিমি প্রায় নিরাপত্তা দেওয়ার ভঙ্গিতে জুনোকে টেনে নিল বুকের উপর, খুদে ভেলাটাকে স্থির রাখবার জন্য বিশাল লেজটা নাড়াচাড়া করছে। দিশেহারা, বিহ্বল হয়ে জুনো ভাবছে দেবতা আইপালুকভিক ওকে পরম যত্নে নিজের অন্তরে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সবকিছু শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে জুনো, হতাশ হয়ে ভাবছে এরকম একটা দেবতার বিরুদ্ধে কার কী করবার আছে!

অপেক্ষারত জুনোকে বিস্মিত করে দিয়ে খুনি আইপালুকভিক, উত্তুরে বাতাসের দাঁত ও বিধ্বংসী শক্তির প্রতিমূর্তি, আশ্চর্য মৃদু স্বরে ভালবাসার গান ধরল।

জুনোর কাছ থেকে বড়জোর এক গজ দূরে ভাগ হয়ে গেল সাগরের পানি। দেবতার সঙ্গিনীর কালো ফিনের ছুঁচালো ডগা, কালো সেইল, কালো কাঁধ উঠে এল সারফেসের উপরে; হাঁ করা মুখটা সাগরকে একপাশে ঠেলে দিচ্ছে। জুনো প্রার্থনা শুরু করল, 'ও লর্ড, আউট অভ দ্য ডেপথস্!'

শুধু ঠোঁটই নড়ছে, কোনও আওয়াজ বেরুচ্ছে না। ওর নাগাল পেয়ে গেছে সঙ্গিনী। চোয়ালটা বন্ধ হতে যাচ্ছে ওর পায়ের চারপাশে।

ও লর্ড, আউট অভ দ্য ডেপথস্... জুনো অনুভব করল তিমির দাঁত ওর হাড়ে কামড় বসাচ্ছে। কামড় বসিয়েই এক ঝটকায় পিছু হটল কিলারের সঙ্গিনী।

নোংরা ন্যাকড়ার মত পতপত করছে জুনোর ট্রাউজার কোমরের নীচে রক্তাক্ত ক্ষতের উপর। চোখ নামিয়ে সেদিকে তাকাচ্ছে না সে।

ও লর্ড, আউট অভ দ্য ডেপথস্...মনে মনে আবৃত্তি করছে: তারপর ওর গলা চিরে বেরিয়ে এল ডাকটা: 'রানা!' যেন এর

একটা বিহিত করতে বলছে সে।

বন্ধুর অবস্থা দেখে আক্রোশে কাঁপছে রানা। তার ডাকটা ওর সংবিৎও যেন ফিরিয়ে আনল। 'ডাইনামাইট!' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'জুনো, ডাইনামাইট!'

বিস্ফোরকের স্টিকটা এখনও বাম হাতে ধরে আছে জুনো, ফিউজ জড়ানো, ধরাবার জন্য প্রস্তুত। দেশলাইয়ের খোঁজে হাতড়াচ্ছে। চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ও। রানাকে দেখতে পাচ্ছে, মুখটা যেন হাড় খোদাই করে বানানো। দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

দেশলাই জ্বালল জুনো, কিলারের শরীর বাতাস আটকে রেখেছে। হিসহিস করে জ্যান্ত হয়ে উঠল ফিউজ, আগুন ছড়াচ্ছে...

আর ঠিক তখুনি আবার জুনোর কাছে উঠে এল সঙ্গিনী, মাংসের স্বাদে মজা পেয়ে গেছে। ওর হাঁটুর কাছে ওটার প্রকাণ্ড মুখ খুলে যাচ্ছে। দাঁতগুলো দেখতে পেল ও, খুদে লাল স্রোতের মত ওগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে পানি, জলপ্রপাত হয়ে বেরিয়ে আসছে মুখের বাইরে। বিরাট জিভের লালচে-সাদা ফলা মোচড় খেতে দেখল, আরও ভিতরে টকটকে লাল গলা।

ঝুঁকল জুনো, বাম হাতটা ঠেলে দিল বাইরের দিকে। সঙ্গিনীর হাঁ করা মুখের গভীরে ডাইনামাইটসহ কাঁধ পর্যন্ত পুরো হাত ঢুকিয়ে নিল।

ফিউজের শিখা মুখের ছাদ পোড়াচ্ছে। ঝাঁকি দিয়ে পিছু হটল ওটা, বন্ধ হলো দাঁতগুলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে পিছু হটে নেমে যাচ্ছে, দাঁতের ঘষায় জুনোর কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত সমস্ত মাংস তুলে নিয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল হলদেটে-সাদা হাড়।

কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে খানিকটা ঢিলে করল জুনো, বরফের উপর হাঁটু গাড়ল। সঙ্গিনীর মুখের ভিতর থেকে ওর হাতের শুধু কনুইটা বেরিয়ে রয়েছে।

জুনোর ডান কাঁধটা শেষবারের মত দেবতা আইপালুকভিকের আড়ষ্ট ফ্লিপারে ধাক্কা খেল, তারপর মাতালের মত সামনের দিকে ঝুঁকল ও, ঢলে পড়ল সঙ্গিনীর অপেক্ষারত হাঁ করা মুখের ভিতর।

'হেই, রানা, দোস্ত,' বলল জুনো, তিমির মুখে ভিতর থেকে। 'আবার দেখা...' আর ঠিক তখুনি ফাটল ডাইনামাইট।

ফ্লোর উপর স্থির হয়ে গেল ওরা। রানার কাঁধটাকে একহাতে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে মনিকা। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে অস্টিন, মুখ খোলা, হাতে এখনও রশির কুণ্ডলী। ব্যাঙের ছাতা আকৃতির কুয়াশা সাগরে নেমে যাচ্ছে, আর কিছু নেই ওখানে।

'যিশুর কিরে, জুনো সাকসেসফুল!' পাগলের মত হেসে উঠল অস্টিন।

'কী বলল? কী বলল ও?' ব্যাকুল সুরে জানতে চাইল রানা। 'আমি ওর কথা শুনতে পাইনি!'

ভাল করে মনিকাও শুনতে পায়নি, তবে রানাকে জানাল: 'জুনো বলল, আবার দেখা হবে তোমাদের, কোথায় যেন তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে ও।'

ঊনত্রিশ

ভাগ্য ভাল যে ক্ষতটা আরও উপরদিকে, সাদা মুখ পর্যন্ত ওঠেনি, তা হলে চোখ দুটো হারাতে হত।

হিম পানির ভিতর দিয়ে চল্লিশ ফুটী শরীরটা নিয়ে সরে যাচ্ছে কিলার ওয়েইলের লিডার, পিঠটা সারফেসের উপর তুলে রেখেছে

যাতে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুসে বাতাস ভরতে পারে। ওটার চিবুক আর বুকের উপর দিকে লাল দাড়ির মত রক্ত লেগে রয়েছে—বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কার সঙ্গে ওটার সঙ্গিনীর প্রকাণ্ড খুলি আর জুনোর বাকি হাড় লাখ লাখ শ্র্যাপনেলের মত ছুটে এসে ওখানকার নরম চামড়া ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

সঙ্গিনীকে হারিয়ে বিষণ্ন হয়ে পড়েছে লিডার। সোনার-এ প্রথমে তার আকৃতি ধরা না পড়ায় অস্থির হয়ে উঠেছিল, তারপর মাথাবিহীন কাঠামোটা চিনতে পেরে কেঁদে ফেলেছে।

দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে কিলার। ফুসফুসের মত কানেরও ক্ষতি হয়েছে, যে-জন্য সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে শিষ্যরা ডাক দিলেও শুনতে পাচ্ছে না ওটা। তবে শেষ হামলাটা শুরু হওয়ার সময় কোথায় ওগুলো ছিল জানা আছে, কাজেই সেদিকেই ফিরছে। নিশ্চয়তা ও আশ্বাস পাওয়ার জন্য দলের সদস্যদের সঙ্গ দরকার ওটার।

পরবর্তী আধঘণ্টায় ওটার শক্তি ফিরে আসতে শুরু করল, সেই সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে এল মাথা, নতুন আইডিয়া গজাচ্ছে সেখানে। অকস্মাৎ শরীরটাকে মুচড়ে দিক বদল করল লিডার, ফিরে আসছে উত্তরে।

রানাই প্রথমে নড়ে উঠল। ওর কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল মনিকা। তার বুকের ভিতরটা ধকধক করছে, শুধু জুনোর বীভৎস মৃত্যু দেখে নয়, ভাল লেগে যাওয়া মানুষটার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেই ভয়েও।

রানাকে ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে গেল মনিকার দৃষ্টি, অস্টিনের দিকে তাকাল।

হাতের রশিটা ফেলে দিল অস্টিন, তারপর রানার দিকে ফিরল। 'রানা, আমি...' শুরু করলেও, বুঝতে পারল ওর কিছু বলবার নেই।

কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, তারপর ক্লান্ত পায়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল। নেটের নাগাল পেতে ষোলো পা হাঁটতে হলো ওকে, আরও পাঁচ কদম দূরে এসে ফায়ার-ট্রের পাশে থামল।

ওর সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে অর্ধবৃত্ত আকারের বরফ, পরিধির হিসাবে দশ কদম। তারপরেই খয়েরি-বাদামী মহাসাগর। ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে গনগনে আগুনের উপর হাত দুটো লম্বা করে দিল, ঝাপসা খয়েরি দিগন্তটা একদৃষ্টে দেখছে।

কী করতে হবে বা বলতে হবে জানা নেই রানার। এমনকী বিশ্লেষণ করবার মত কোনও অনভূতিও নেই যে সেখান থেকে নির্দেশ আসবে।

না, করবার কিছু আর বাকি নেই। চোখ বন্ধ করল রানা, ওখানে জুনো রয়েছে।

ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে, ঝট করে আগুনের উপর থেকে হাত দুটো টেনে নিল ও। পোড়ার জ্বালা অসুস্থতা দূর করতে খানিকটা সাহায্য করল। সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, শোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

জ্বলন্ত গ্লাভ দুটো পারকার পকেটে ঢুকিয়ে ঘুরল ও। ওর পিছনে, কাছাকাছি চলে এসেছে মনিকা; নেটের নীচে ফাটল ধরা বরফের অস্থির চোয়ালটা অত্যন্ত সাবধানে টপকাচ্ছে। নাকের ফুটো কুঁচকে বাতাস শুঁকল।

'কী যেন পুড়ছে।'

'আমার গ্লাভ। হাত দুটো আগুনে ধরেছিলাম।'

'পুড়ে গেছ নাকি? দেখাও আমাকে।'

'আরে, না।'

আগুনের উপর কফির পানি চড়াল মনিকা।

মাঝে-মধ্যে দু'একটা ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা হচ্ছে।

'আমি চিরকাল মম্‌কেই মিস করব,' বলল মনিকা। 'ড্যাডিকে

কখনওই কাছে পাইনি, এভাবে ওঁর চলে যাওয়াটা সারাজীবন মনে গাঁথা থাকবে, কিন্তু কিছু হারাবার ফিলিংসটা আমাকে ভোগাবে না।'

ওর কথার মধ্যে যুক্তি আর বাস্তবতা খুঁজে পেল রানা। তবে কিছু বলল না, ইঙ্গিতে শুধু দেখাল কফির পানি ফুটছে।

কফির গন্ধ পেয়ে চলে এল অস্টিন, কিন্তু থাকল না বেশিক্ষণ। আড়চোখে ওদের দুজনকে বারকয়েক দেখল, কী নিয়ে যেন তার খুব সন্দেহ হচ্ছে, তারপর চলে গেল আবার, গ্লাভ পরা হাতে ধরা মগটা থেকে ধোঁয়া উঠছে।

সময় বয়ে চলল। রানার মনটাকে বর্তমান থেকে অতীতে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় পুরোপুরি সফল মনিকা। অক্সফোর্ডে থাকতে ওর জীবনে যে-সব রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে, তার আবেগঘন বর্ণনায় মুগ্ধ ওর একমাত্র শ্রোতা।

'রানা! টয়লেটকে পাশ কাটিয়ে, বরফে গাঁথা তাঁবুর গোঁজে হোঁচট খেয়ে, ওদের দিকে এগিয়ে আসছে অস্টিন। মুখটা ধবধবে সাদা হয়ে আছে।

'এই, কী হলো আবার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার কথা বোধহয় শুনতে পেল না অস্টিন, ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছনদিকটা দেখছিল। 'রানা!' চিৎকার শুরু করল সে। 'ওটা ফিরে এসেছে! ওটাকে আমি দেখেছি...'

রানা অনুভব করল ওর গোটা শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। যেন একটা বোতাম টিপে দিয়েছে কেউ, সঙ্গে সঙ্গে মনিকাকে ভাল লাগার যে অনুভূতিটা মনটাকে ছেয়ে ফেলছিল সেটার বদলে জেগে উঠল প্রচণ্ড ঘৃণা, কিলার ওয়েইলের প্রতি। অকস্মাৎ আবার দেখতে পেল জুনোকে, বিশাল বুকের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে, সাদা কিনারা সহ দুটো ফ্লিপার আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে জড়িয়ে রেখেছে তাকে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'চলো, বেজন্মাটাকে খতম করি।'

'খতম করি? কী বলছ, কী করে খতম করব? আরে, জান বাঁচাবার উপায় কী তা-ই বলো!'

তবে তার কথা রানা শুনছে না। ওর ঠাণ্ডা দৃষ্টি অবশিষ্ট ফ্লোর উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনের খাতায় তৈরি হচ্ছে একটা ক্যাটালগ, ওদের যা কিছু আছে সেগুলোর মধ্যে থেকে অস্ত্র হিসাবে কোন্‌গুলো ব্যবহার করা যাবে।

তালিকাটা ছোট—দুটো হার্পুন, একটা কুড়াল, আর হয়তো আগুনটা। সামান্য অ্যামিউনিশন। বুলেট দিয়ে আরও বোমা বানাবার কথা ভাবল রানা, তারপর মনে পড়ল ডাইনামাইটের সঙ্গে ফিউজও হারিয়েছে ওরা। তারপর মনে পড়ল রানার কয়েকটা ফ্লেয়ারও আছে ওদের।

ঠিক আছে, এগুলো দিয়েই কাজ চালাতে হবে। হাতাহাতি, আনআর্মড কমব্যাট। রানা ভাবছে, এমন একটা কিছু যদি থাকত, যার সাহায্যে ওটাকে অচল করে রাখা যায় কয়েক সেকেন্ড, সেই সুযোগে ওটার মাথায় হার্পুন কিংবা কুড়াল গেঁথে দিত ওরা!

মাথায় এরকম অবাস্তব চিন্তা আসছে বলে নিজের উপর রাগ হচ্ছে রানার। চোখ নামিয়ে কমলা রঙের রশির উপর জমে থাকা বরফে লাথি মারল। ওদের আসলে দরকার, উপলব্ধি করল ও, একটা নেট।

নেট!

বিদ্যুৎচমকের মত মাথায় এল ব্যাপারটা। নেট তো ওদের আছেই! বিশদ কিছু পরিষ্কার হওয়ার আগেই হাঁটা ধরেছে ও। 'অস্টিন। বোটটা জোড়া লাগাও। ওটায় লাইফজ্যাকেট তোলো।'

'বোট?' চোখে অবিশ্বাস, কলাপসিবল ডিঙ্গি নৌকাটার দিকে তাকাল অস্টিন। গর্তের পাশে রাজ্যের আবর্জনার মধ্যে পড়ে রয়েছে ওটা, যেখানে সাপ্লাই তাঁবু দাঁড়িয়ে ছিল। 'রানা, আসলে কী ভাবছ বলো তো?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল সে। 'ওটাকে

ধাওয়া করবে?'

উত্তর দেওয়ার সময় কোথায়, কুড়াল দিয়ে রশিগুলোর শেষপ্রান্তের গোঁজ আলগা করতে ব্যস্ত রানা, যেগুলো নেটটাকে জায়গামত ধরে রেখেছে। পানির কিনারা থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে এখন গোঁজগুলো। কাজটা করবার সময় পানির উপর তাই একটা চোখ রাখতে হয়েছে, ওর পরম শত্রু যদি এসে পড়ে।

আপনমনে বিড়বিড় করছে রানা: 'আর কয়েক মিনিট, বেজন্মা আইপালুকভিক; আরেকটু ধৈর্য ধরো।'

আট প্রস্থ রশি নেটটাকে পজিশনে আটকে রেখেছে। প্রতিটি কোণ থেকে বাইরের দিকে একটা করে বেরিয়েছে, প্রতিটি সাইড-এর মাঝখান থেকে বেরিয়েছে আরেকটা করে। প্রথমে পুবদিকে মুখ করে থাকা তিনটে রশির গোঁজ আলগা করল রানা, তারপর দক্ষিণদিকে মুখ করা একটা রশির গোঁজ। ওর পায়ের বুট কয়েক ইঞ্চি গভীর পানির নীচে ডুবে আছে।

সাগরের শান্ত পানির উপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। উত্তেজনায় ওর ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। কিলার ওয়েইলটাকে অপেক্ষা করতে বলতে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু কপালে খুব খারাবি আছে ওটার যদি কথা শোনার মুড না থাকে। গোঁজে একটা করে বাড়ি মারছে, আর চোখ তুলে দৃষ্টি বুলাচ্ছে পানিতে। মুখটা ঘেমে যাচ্ছে।

একটা গোঁজ মুক্ত হলেই দ্রুত সরে গিয়ে আরেকটাকে ধরছে রানা। এখনও চারটে বাকি।

আরও একবার ছদ্মবেশী শান্ত সাগরের উপর চোখ বুলাল রানা। নেটের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ও। কুড়ালের বাড়ি মারল বরফে। আবার চোখ তুলে দেখে নিল। তবে অস্থির নীল ফ্লো আর খয়েরি ঢেউ ছাড়া কিছুই নড়ছে না।

নেট বরাবর এগোল রানা, আরও একটা গোঁজ খুলল। কাজটা শেষ করে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে ফিরে আসছে। উল্টোদিকে আর

মাত্র দুটো গোঁজ বাকি আছে, নেটের কিনারায় আছে আরও কয়েকটা, সবগুলো মিলে কোনওরকমে ফ্লোটাকে এক করে ধরে রাখছে।

'অস্টিন,' ডাকল রানা। 'তুমি ভুল দেখোনি তো?'

বোটের শেষ সেকশনটা জায়গামত জোড়া লাগিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছে অস্টিন, প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকাল। রানাকে ধীর পায়ে হেঁটে আসতে দেখল, খয়েরি সাগরের গায়ে পরিচিত কাঠামো। আর, তারপর, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, রানার মাথায় গজাতে শুরু করল তরোয়ালের কালো একটা ফলা।

হাঁ হয়ে গেল অস্টিন। কী ঘটছে?

তারপর ধরতে পারল। 'তোমার পেছনে!'

ত্রিশ

চিৎকারটা শুনে সামনের দিকে ডাইভ দিল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকে তাকায়নি। পিছু নেওয়া তিমির আওয়াজ রক্ষা করল ওকে। ডাইভ দিয়েছে, পরমুহূর্তে বিরাট জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ল পিঠে, ওর গতি আরও বেড়ে গেল।

ডাইভ দিলেও, রানা যেন একটা পাঁচিলে বাড়ি খেল—তিমিটা ফ্লোর সরু অংশটায় চড়াও হওয়ায় অকস্মাৎ ওর সামনে খাড়া একটা ঢাল তৈরি হয়েছে। নেটের কিনারা হাতের নীচে পেয়ে ওটা ধরে নিজেকে উপরে তুলছে ও।

চারভাগের তিনভাগ পানি থেকে উঠে এসেছে তিমি, উঁচু হয়েছে মেলে দেওয়া ফ্লিপার দুটোয় ভর দিয়ে, ওটার হাঁ করা মুখ

রানার পা থেকে মাত্র এক গজ দূরে। ক্রল করে ঢাল বেয়ে উঠছে, ঘাড় ফিরিয়ে এই প্রথম পিছনে তাকাল রানা।

সাদা-কালো প্রকাণ্ড অবয়বটা দেখতে পেল, নাকে আর আশপাশের ক্ষতগুলো চিনতে পারল, চিবুকটা ফুলে আছে। ও তাকিয়ে আছে ঠিকই, তবে কাজও করছে—ডান হাতটা ফায়ার-ট্রের তলায় সেঁধিয়ে দিল, তারপর হ্যাঁচকা টানে মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে এনে ছুঁড়ে মারল গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে।

সরাসরি লিডারের কলঙ্কিত নাকে গিয়ে লাগল ওটা, সারা মুখে ফুলকির বিস্ফোরণ ঘটাল। চেঁচিয়ে উঠল তিমি, ঝাঁকি দিয়ে পিছু হটল। বরফ ডুবে গেল পানিতে, তবে নেটের চারধারের কয়েকটা গোঁজ শক্তভাবে টিকে থাকছে, এক করে রাখছে ফ্লোর অর্ধেকটাকে।

'ওহ্, খোদা!' নেতিয়ে পড়ল রানা, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে।

'রানা! কোথাও লেগেছে?' ওর পাশে এসে হাঁটু গাড়ল মনিকা। 'তুমি ভাল আছ?'

'হ্যাঁ। ভাল। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি। ওই বাস্টার্ড...' রানার চোখ দুটো তীব্র ঘৃণায় জ্বলছে, রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা চেহারা যেন ভুতে পাওয়া কোনও মানুষের। মনিকার সামনে হাত পাতল। 'ফ্লেয়ার পিস্তলটা দাও।'

একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা, সেই সঙ্গে ক্ষিপ্ত আরেক শত্রুর মুখোমুখি হলো।

'ইউ ফাকিং ইডিয়ট!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অস্টিন। 'তুমি শালা কোন্ আক্কেলে ফায়ার-ট্রেটা ছুঁড়লে? আমরা সবাই তো এখন জমে বরফ হয়ে যাব!'

অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল রানা। 'আগে জন্তুটাকে মারতে হবে, তা না হলে বরফ হবার সুযোগও পাব না!' শান্ত সুরে বলল ও। 'তা ছাড়া, আরেকটা আগুন যদি না-ও জ্বালতে

পারি, শরীর গরম রাখার আরও অনেক কিছু আছে আমাদের— তাঁবু, স্লিপিং-ব্যাগ, কম্বল।'

একটু শান্ত হলো অস্টিন। 'ঠিক আছে, বুঝলাম,' বলল সে। 'এবার শোনা যাক তোমার প্ল্যানটা কী।'

'অস্ত্র বলতে শুধু হার্পুন আর কুড়াল,' বলল রানা। 'ওগুলো ব্যবহার করার জন্যে তিমিটাকে স্থির অবস্থায় পেতে হবে কোথাও।'

'বাহ্, গ্রেট আইডিয়া!' খেঁকিয়ে উঠল অস্টিন। 'সেটা কীভাবে সম্ভব শোনা যাক।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে আকাশের চারকোণ লক্ষ্য করে চারটে ফ্লেয়ার ছুঁড়ল রানা। তারপর ব্যাখ্যা করল: 'আমরা নেটটা ব্যবহার করব।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল মনিকা, রানার বাড়ানো হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে পারকার পকেটে রেখে দিল।

'তোমার মনে আছে, তাঁবুর ভেতরে অস্টিনের সঙ্গে আমার যখন লাগল?' হাত তুলে গর্তটা দেখাল রানা, যেখান দিয়ে উঠে এসেছিল তিমিটা। 'কিলার শব্দ অনুসরণ করে পৌঁছায় ওখানে, ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে আমরা ঠিক তা-ই করব। মক ফাইট আর কী— দাপাদাপি, চিৎকার-চেঁচামেচি। লোভ দেখিয়ে ওটাকে আমরা হয়তো নেটের তলায় এনে ফেলতে পারি। বরফ ভেঙে মাথাচাড়া দিলেই জড়িয়ে যাবে। নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে, এই সময় কেটে টুকরো টুকরো করব।'

'বাহ্, দারুণ!' বলল অস্টিন। 'কিন্তু ওটা যে ফ্লোটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, তার কী হবে?'

'আমরা অযথা দেরি করলে তবেই ওটা ভাঙার সুযোগ পাবে,' বলল রানা। 'দুটো ছাড়া বাকি সব গোঁজ আমি আলগা করে

রেঁখেছি। তিমিটা মাথাচাড়া দিলে শুধু বরফ থেকে ছিঁড়ে যাবে নেট, তারপর কিলারের চারপাশে জড়িয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করব আমরা, তা হলে আর ফ্লোর কোনও ক্ষতি হবে না।'

কুড়ালটা আবার তোলার জন্য ঘুরল রানা। কিন্তু মাত্র দু'পা এগিয়েছে, ওর পিঠে কীসের একটা বাড়ি পড়ল।

'কী?' হোঁচট খেয়ে খানিকটা সামনে এগোল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। গর্তের পাশে, নেটের ভিতর, আক্রমণের ভঙ্গি নেওয়া বক্সার-এর মত লাফাচ্ছে অস্টিন। 'এই, কী ব্যাপার?'

'আমি ভাবলাম তুমি আমার সঙ্গে লড়তে চাও!'

বিড়বিড় করল রানা, 'শালা বলে কী।'

'সং সেজে দাঁড়িয়ে থেকো না, এসো, আমার সঙ্গে লড়ো!' হাসছে অস্টিন, তবে এভাবে শুধু কোনও উন্মাদই বোধহয় হাসতে পারে—আওয়াজটা বদলে প্রায় মেয়েলি হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত বেসুরো, থামারও কোনও লক্ষণ নেই।

'অস্টিন, শান্ত হও,' ভারি গলায় বলল রানা।

'আমরা মারা যাব, তাই তো? অথচ তারপরও আমার সঙ্গে শত্রুতা বাধিয়ে রেখেছ তুমি,' হাসি থামিয়ে বলল অস্টিন, অন্তত এই মুহূর্তে তার চেহারায় পাগলামির ছিটেফোঁটাও নেই। 'এখানে মেয়েমানুষ তো একটাই, সেটাকেও একা তুমি দখল করে রেখেছ, আমাকে তার ভাগ দিচ্ছ না। সুযোগ পেলেই তার কানে আমার বিরুদ্ধে যা-তা বলছ, তার মনটাকে বিষিয়ে তুলছ...'

'মিস্টার অস্টিন!' দূর থেকে প্রতিবাদ করল মনিকা। 'আপনি অসভ্যতা করছেন! এ-সব সত্যিও নয়, আপনি প্রলাপ বকছেন।'

'পারলে বোঝাও তুমি, এ আমার কাজ নয়,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, কুড়ালটার দিকে এগোল। তিন পা এগিয়েছে, অস্টিনের কাঁধ আবার ওর পিঠে ধাক্কা মারল। এবার ছিটকে বরফের উপর পড়ে গেল ও।

এবার সত্যি খেপে গেল রানা। স্প্রিং-এর মত এক লাফে

সিধে হলো, ঘুরল, ফ্লোর ঠাণ্ডা আভায় চোখ দুটো জ্বলছে। 'অলরাইট, ইউ স্টুপিড বাস্টার্ড,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল ও, বরফের উপর সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছে।

নাচতে নাচতে পিছিয়ে গেল অস্টিন, মুখ থেকে বিদ্রূপাত্মক আওয়াজ বের করে রানাকে প্ররোচিত করতে চাইছে। গ্লাভ পরা হাত দুটো শিথিলভাবে শরীরের পাশে ঝুলছে।

বেশ খানিক দক্ষিণে কিলার ফিনের কালো কাঁটাটা সাগরের নিঃশব্দ পানিকে চিরে দিল, ফ্লোটাকে ঘিরে ঘুরছে।

কিছুটা দূরে এখনও নিজের জায়গায় বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিকা, হাতে দুটো হার্পুন, দেখল ওরা দুজন অশান্ত ফাটলটার দু'পাশে পরস্পরের মুখোমুখি হলো।

'শোনো,' বলল অস্টিন, এগোল আবার, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। 'দুজনেই জানি আমার জীবনে তুমি একটা অভিশাপ...' হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে, নাগাল পাওয়ার আগেই ঘুসি চালাল, রানার কাঁধে লাগল না। আসলে ওটা ছিল ভান, ঘুসিটা লাগাবার জন্য মারেনি সে। ঘুসির পিছু নিয়ে আরও সামনে চলে এল, তারপর চিরশত্রুর ঊরুসন্ধি লক্ষ্য করে লাথি চালাল।

ছুটে গেল রানার ডান বুট, অস্টিনের হাঁটুর দেড় ইঞ্চি নীচে শক্ত হাড়ের উপর ওটা যেন দা-র কোপ মারল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল অস্টিন। ভাঁজ হয়ে গেল রানার ডান পা, হাঁটুটা অস্টিনের ঊরুতে ঘষা খেয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল তলপেটের নীচে।

চোখে অন্ধকার দেখছে, হুঁশ-জ্ঞান আছে কি নেই, সামনে ঝুঁকে পড়ল অস্টিনের মুখ—রানার ঘুসি তার নাকটা ভেঙে দিল। ওর বামদিকে ঢলে পড়ল সে, ফাটলটার পাশে। তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল শরীরটা, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে ঊরুসন্ধি।

মনিকার হাত থেকে হার্পুন দুটো পড়ে গেল।

অস্টিনের মাথা লক্ষ্য করে লাথি মারল রানা, তবে ওর ভারী পারকার কাঁধে লেগে পিছলে গেল পা। শরীরটা গড়াল অস্টিন,

আড়ষ্ট হাত-পায়ের সাহায্যে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। আবার এগোল রানা, সরাসরি তার মুখে লাথি মারতে যাচ্ছে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল মনিকা। 'রানা, না!' ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অস্টিনের শরীরের উপর, দু'হাত দিয়ে আগলে রাখল তাকে, রানা যাতে মারতে না পারে। 'প্লিজ, আর না!'

'কিন্তু ওর কি যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে?' কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়েছে, হয়েছে,' চেঁচিয়ে উঠল মনিকা, অস্টিনকে ছেড়ে সিধে হচ্ছে। 'দুজনকেই বলছি, এবার থামো তোমরা! তিমিটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে! যিশুই জানে ফের কী মতলব করছে ওটা!'

রানাকে টেনে সরিয়ে আনছে মনিকা। ফাটলটার দিকে যাচ্ছে ওরা, টপকে পার হয়ে যাবে।

এই সময় আবার লাফ দিয়ে দাঁড়াল অস্টিন, মারমুখো হয়ে ছুটে আসছে। 'বেজন্মা কুত্তা! তোকে আমি খুন করব, রানা...' ছুটে আসছে সে।

পিছিয়ে পড়ল মনিকা, ঘুরে অস্টিনকে বাধা দিতে গেল। দু'হাত দিয়ে সরাসরি ওর বুকে ধাক্কা মারল অস্টিন, চোখে-মুখে অশ্লীল হাসি লেগে রয়েছে।

ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়ল মনিকা, শক্ত বরফে খুলিটা ঠুকে যাওয়ায় জ্ঞান হারাল।

এই সময় হঠাৎ উঠে এল তিমি, ঠিক যেখানে উঠবে বলে আন্দাজ করেছিল রানা; ফ্লোর ফাটল দিয়ে সরাসরি নেটে।

ওদের দুজনের নীচে উঁচু হলো নেট, গড়িয়ে এনে দুজনকে একটা স্তূপে পরিণত করল, ফ্লোর বড় অংশটায়।

নেটটা মাথায় জড়িয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক সেকেন্ডের জন্য স্থির হলো কিলার, পরমুহূর্তে উন্মত্তের মত মাথাটাকে এদিক-ওদিক ঝাঁকাতে শুরু করল। নিজেকে ওটা মুক্ত করবার

ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বরফের ছোট ফ্লোটা দুলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে।

হারপুনের নাগাল পাবার জন্য ক্রল শুরু করল অস্টিন, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই ফ্লো ঝাঁকি খাওয়ায় ছিটকে আরেকদিকে সরে গেল। দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না।

হারপুনের নাগাল পাওয়ার জন্য আরও আগে থেকে ক্রল শুরু করেছে রানা, তবে অস্টিনের মতই বারবার ছিটকে পড়ছে। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত পিষল ও।

নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে, অগত্যা উপর দিকে লাফ দিল লিডার। বরফ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে উঠে গেল নেট, তিমিটাকে পুরোপুরি জড়িয়ে নিয়েছে। ফ্লোর দুটো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আলাদাভাবে ভাসছে। শুধু দুটো লম্বা রশির সঙ্গে আটকানো রয়েছে নেটটা এখন, প্রতিটি ফ্লোর আলাদা অংশে; গোঁজের সঙ্গে বাঁধা।

ফাটল চওড়া হতে শুরু করায় মুক্তির উপায় দেখতে পেল তিমি, লাফ দিল সামনে। এই মুহূর্তে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে অস্টিন, তার ঠিক সামনেই রয়েছে রুপালি একজোড়া স্পিয়ার।

শক্রতার কথা এখন আর মনে নেই। খপ করে একটা স্পিয়ার ধরল সে, গড়িয়ে চিৎ হলো, তারপর ধরিয়ে দিল রানার বাড়ানো হাতে।

হার্পুনটাকে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। বরফের উপর বারবার ছিটকে পড়ায় এখনও আচ্ছন্ন বোধ করছে, টলতে টলতে সামনে এগোল। একটু পরেই পায়ের তলায় আর বরফ পাওয়া গেল না। এতক্ষণে চোখ তুলে তাকাল ও, দেখল সবকিছু কী ভয়ঙ্কর চেহারা পেয়েছে।

ঠিক ওর টলমলে পায়ের পাশ থেকে, দুটো রশির একটা,

চল্লিশ ফুট দূরে নেটের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডানদিকে, পাঁচ ফুট দূরে, দ্বিতীয় ফ্লোটাকে টেনে নিয়ে চলেছে চল্লিশ ফুটী আরেকটা কমলা রঙের রশি। দুই প্রস্থ রশি এক হয়েছে নেটের যে অংশে, সেটা তিমির মাথার চারপাশে শক্তভাবে জড়ানো।

এগুলোর সবই—বরফ, রশি, নেট ও তিমি পানির উপর দিয়ে ক্রমশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। ফ্লোর কিনারায় বিরতিহীন আঘাত করছে ঢেউ, পাতলা বরফ ভেঙে যাচ্ছে।

'হায় আল্লাহ!' আঁৎকে উঠল রানা। ঘুরে অস্টিনের দিকে তাকাল। গলা চড়িয়ে সাবধান করতে যাচ্ছে, এই সময় পায়ের পাশের গোঁজটা বরফ ভেঙে বেরিয়ে গেল। সাপের মত ছুটে গেল রশি, বাতাসে সপাং সপাং আওয়াজ করছে।

গতি কমে গেল, ঘুরে দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল হলো ফ্লো। বিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় ফ্লো, আকারে ছোট, প্রায় এক নট স্পিডে দূরে সরে যাচ্ছে, উন্মত্তের মত সাঁতরে টেনে নিয়ে চলেছে তিমিটা।

বরফের উপর সাবধানে পা ফেলে ক্যাম্প আর অস্টিনের কাছে ফিরে আসছে রানা। গর্তের পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ওদের ক্যানু, ঠিক যেখানে পুরানো সাপ্লাই তাঁবুটা ছিল, ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে হলুদ লাইফজ্যাকেটের প্রান্ত। টয়লেটটা ভেঙে পড়েছে।

কোথাও আর কিছু নেই।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওই নেট থেকে ওটা কোনদিনই মুক্ত হতে পারবে না,' বলল ও। 'আমরাই জিতলাম।'

কিন্তু তিমির পিছু নিয়ে ছুটে চলা ছোট ফ্লোটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অস্টিন, তার চেহারার নগ্ন আতঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হলো রানার চোখে। ঝট করে ঘুরল ও, হাত তুলল চোখের উপরে। সাঁতরাচ্ছে কিলার, তবে এখনও খুব একটা দূরে চলে যায়নি; ওটার পিছু নেওয়া ছোট ফ্লোকে আরও কাছে মনে হচ্ছে।

ছোট্ট ফ্লোর সমতল মেঝেতে চোখ বুলাল রানা। ও

তাকিয়েছে, আর ঠিক এই সময় জ্ঞান ফিরে পেয়ে নড়ে উঠল মনিকা। ধীরে ধীরে উঠে বসছে সে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় রয়েছে, তার সঙ্গীদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না কেন!

তারপর ওদেরকে দেখতে পেয়ে আঁৎকে উঠল মনিকা, রানার উদ্দেশে পাগলের মত হাত নাড়তে শুরু করল, বাতাসে তার সোনালি চুল উড়ছে।

একত্রিশ

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করল রানা। অস্টিনের কাছে ফিরে আসছে, বলল, 'জলদি, অস্টিন! বোটটা পানিতে নামাতে একটু সাহায্য করো আমাকে।'

দাঁড়িয়ে থাকল অস্টিন, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী বলছি তোমাকে, ড্যাম ইউ, আমার সঙ্গে বোটটা ধরো! ওকে আমরা এভাবে মরতে দিতে পারি না। যেভাবে হোক ওকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে।' এর বেশি আপাতত আর কিছু ভাবতে পারছে না রানা।

'ওকে শুধু বোটে তুলে নিলে কোনও লাভ হবে না,' বলল অস্টিন, রানার চেয়ে পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে সে। 'কিলারটাকে আমাদের মারতে হবে। তা না হলো বোট সহ আমাদেরকে গিলে ফেলবে। ওকে বাঁচাবার একটাই উপায়, ওটাকে মারা।'

তার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল রানা, ঝুঁকে ইস্পাতের স্পিয়ারগুলো তুলে নিল। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'তিমিটাকে সত্যি মারতে হবে। আসছ তুমি?'

ভারী কাঁধটা ঝাঁকাল অস্টিন, থেঁতলানো ও রক্তাক্ত মুখটা কোঁচকাল একবার। 'না,' বলল সে, 'যদি তুমি একা পারবে ভেবে থাকো।'

মাথা নাড়ল রানা, জানে সম্ভব নয়। ক্যানুর প্রতিটি জয়েন্ট আর বাঁধন ভাল করে চেক করে দেখে নিচ্ছে ও।

কর্ক দিয়ে কিনারা মোড়া উজ্জ্বল হলুদ রঙের লাইফজ্যাকেটটা পরে লেস দিয়ে শক্তভাবে আটকে নিল অস্টিন। তারপর কমলা রশিসহ হার্পুন দুটো বোটে তুলল।

ধরাধরি করে সাত ফুট লম্বা ভারী বোটটা ফ্লোর কিনারায় নিয়ে এল ওরা, তারপর ধীরে ধীরে পানিতে নামাল। লাফ দিয়ে চড়ল রানা, বো-র কাছে বসে বৈঠা তুলে নিল হাতে।

পিছন থেকে বোটটাকে ঠেলে দিল অস্টিন, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সে-ও চড়ল। 'গো, গো, গো!' তাগাদা দিল, যেন কমান্ডোবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। একটা বৈঠা নিয়ে সে-ও চালাচ্ছে প্রাণপণে।

তরতর করে ছুটল ক্যানু।

'ফ্লোর কাছাকাছি পৌঁছে দাও আমাকে,' গলা চড়িয়ে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল অস্টিন, মিনিট তিনেক দ্রুতবেগে বৈঠা চালাবার পর বলল, 'তুমি থামো, রানা। লড়াইটা তোমাকে করতে হবে, কাজেই একটু বিশ্রাম নাও। আমি তোমাকে ওখানে পৌঁছে দিচ্ছি!'

বৈঠা রেখে দিয়ে হার্পুন দুটো টেনে নিল রানা, ওগুলোর ওজন অনুভব করল, মাপ নিল রশি সংযুক্ত থাকায় ভারসাম্যের কতটুকু পরিবর্তন হয়, পরীক্ষা করল ডগাগুলো কী রকম তীক্ষ্ণ।

আবার যখন মুখ তুলে তাকাল, দেখল দ্বিতীয় ফ্লোর খুব কাছে

চলে এসেছে ওরা। ওটার সারফেস সারাক্ষণ দুলছে বলে দাঁড়াতে পারছে না মনিকা, ক্রল করে একেবারে কিনারায় সরে আসছে, ওর হাঁটুর কাছে ছলকাচ্ছে ঢেউ-ভাঙা পানি।

'রানা!' ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল ও।

'আরও কাছে,' গলা চড়িয়ে অস্টিনকে নির্দেশ দিল রানা।

বরফের কিনারায় চোখ বুলাল অস্টিন, পানি ভাঁজ খেয়ে ঢেউ আর খুদে ঘূর্ণিতে পরিণত হচ্ছে, তারপর হারিয়ে যাচ্ছে ওটার তলায়। চোখ সরু করে ফ্লোটার পাশে পৌঁছাবার জন্য আরও এক ফুট এগোল সে। তারপর আরও একটু সামনে বাড়ল, এবং নিয়মিত ছন্দে বৈঠা চালিয়ে একই গতিতে, সমান্তরাল রেখায় থাকল—প্রয়োজনে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিমিটার সঙ্গে এগোতে পারবে ওরা।

'আমি ওটার ব্যবস্থা করছি,' গলা চড়িয়ে মনিকাকে বলল রানা। 'তারপর তোমাকে নিতে আসব।'

'সাবধান!'

'ঠিক আছে।'

আর কারও কিছু বলবার নেই। বৈঠা চালাতে ব্যস্ত অস্টিনের কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'চলো, শয়তানটাকে ধরি এবার।'

'ইয়েস, বস্!' উত্তেজনায় কেঁপে গেল অস্টিনের গলা, বৈঠা চালাবার গতি বাড়িয়ে দিয়ে ফ্লোটাকে ছাড়িয়ে সামনে এগোল।

হার্পুন দুটো আবার তুলে নিয়ে ভারমাস্য অ্যাডজাস্ট করল রানা। কাঁধ দুটো শক্ত হয়ে আছে ওর। নাগালের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা।

অস্টিনের সারা দেহ-মনে ভাললাগার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছে গান গায়। নিজের কাছে অকপটে স্বীকার করল, কেউ জানে না যে আমি একটা ভীতুর ডিম। শুধু রানা সঙ্গে থাকলে মারাত্মক সাহস পাই, যেন বিশ্বজয় করতে পারি।

তারপর নিজেকে প্রশ্ন করছে, তা হলে ওর মত একজন মানুষ আমার শত্রু হয় কী করে? অপরাধ তো আমি করেইছিলাম! সাজা ভোগ করছি, এ তো আমার প্রাপ্যই ছিল!

তারপর ভাবল, আমি আসলে জাত হিরো, আমার ভিতরে রয়েছে নেতৃত্ব দেওয়ার দুর্লভ গুণ; শুধু একজন সহকারী দরকার হয় আমার, যে আমাকে অনুপ্রাণিত করবে, প্রয়োজনে আমাকে গাইড করবে। কিন্তু এরকম কোনও ভূমিকায় রানাকে রাজি করানো অসম্ভব।

তবে এই মুহূর্তে বোটের দায়িত্ব ওর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে রানা। অর্থাৎ তার গুণ আর দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছে ও। এর বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে!

মাথায় জড়িয়ে থাকা নাইলন নেট খুলতে না পেরে আতঙ্কিত কিলার ছুটছে—প্রচণ্ড শক্তিতে, পানির তলায় ডুব না দিয়েই। যেইমাত্র নেটটা জড়িয়েছে মাথায়, অমনি শৈশবের একটা স্মৃতি ফিরে এসেছে ওটার মনে: অ্যান্টার্কটিকায় যখন তাকে নেটের ভিতর জড়ানো হয়, তারপর তোলা হয় বোটে। বড় দুঃসহ সময় গেছে সেটা। যা কিছু পরিচিত ও প্রিয়, সব তখন হারাতে হয়েছিল।

তবে ধীরে ধীরে আতঙ্কটা কেটে যাচ্ছে। নেটটা ওকে পানির নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। এখনও মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ আছে। সাঁতার কাটার সময় নেটের সরু রশিগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ছে, ইতিমধ্যে মুখ আর নাক মুক্ত করে ফেলেছে ওটা।

'আরও কাছে!' চেঁচাল রানা। 'আরও দশ ফুট।' দানবটা যেন আগের চেয়ে জোরে ছুটছে। তবে ওদের ক্যানুও কম যাচ্ছে না, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে কমিয়ে আনছে ব্যবধান।

নেটের তলায় পৌঁছে গেছে রানা। মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল। এক কি দেড় গজ দূরে দানবটার কালো মাথা খাড়া হয়ে

আছে আলোড়িত সাগর থেকে উঠে আসা ভেজা পাথরের মত, শ্বাস নেওয়ার সময় ওটার ব্লো-হোল খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

'এক গজ!' তাগাদা দিল রানা। 'আর একগজ এগিয়ে দাও আমাকে!'

আরও জোরে বৈঠা চালাল অস্টিন। প্রথম হার্পুনটা বাগিয়ে ধরল রানা। কমলা রঙের বিশ ফুটী রশি ক্যানুর সামনে হুক দিয়ে আটকে নেওয়া উচিত, কিন্তু ভুলে গেছে ও। তিমির ডানদিকে পৌঁছাচ্ছে ওরা, নিজেদের বাম দিকে। ওটার বুকে গাঁথতে হবে অস্ত্রটা, কাজেই খুব কাছ থেকে আঘাত করতে হবে। ওর মুখ আর পারকা পানির ছিটায় ভিজে যাচ্ছে।

'আরেকটু!'

কমলা রঙের চৌকো জালে ঢাকা উঁচু কাঁধ এখন বো-র নীচে, বোটের বাম দিকে এক ফুটেরও কম দূরে পানি থেকে উঠে এসেছে। নিজের বাম দিকে ঝুঁকল রানা, মাথার উপর শক্ত করে ধরা হার্পুন, উত্তেজনায় দম আটকে রেখেছে, তিমির উষ্ণ নিঃশ্বাস পাচ্ছে মুখে।

সামনে তাকিয়ে আছে অস্টিন, বোটটাকে গাইড করে তিমির মাথার দিকে নিয়ে যাচ্ছে—সচেতন, বিরাট কালো সেইল ফিনটা এই মুহূর্তে তার কাঁধের সামান্য পিছনে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এইবার, রানা, এইবার!'

যেন চিৎকার করে অস্টিন কী বলল বুঝতে পেরেছে কিলার, ওটার মাথা ডান দিকে গুঁতো মারল, প্রচণ্ড আঘাত করল বোটের পাশে।

বাম পাশে ছিটকে পড়ল রানা, বোট ঘুরে গেল ডানদিকে। হার্পুন সবেগে নেমে এল ব্লো-হোলের পিছনে, দানবটার ঘাড়ের সবচেয়ে চওড়া অংশে। রোমহর্ষক একটা দৃশ্য—সাগরের উপর ঝুলে রয়েছে ও, এক হাতে হার্পুনের রড ধরে পেন্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে, ঝুলন্ত পায়ের নীচে বোটটা এই থাকছে এই থাকছে

না; প্রকাণ্ড শরীর ঝাঁকিয়ে ওকে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে কিলারটা।

পায়ের নীচে আবার বোটটাকে দেখতে পেয়ে হার্পুন ছেড়ে দিল রানা। কিলার এবার শরীরটাকে আরও উপরে তুলতে চাইছে, চোদ্দো ফুট লম্বা লেজের ঝাপটায় আরোহীসহ ডুবিয়ে দেবে বোটকে।

ঘন ঘন বৈঠা চালিয়ে সময়মত সরে আসায় তিন ফুটের জন্য লেজটা ওদের নাগাল পেল না। তারপরেও জলোচ্ছ্বাসে ভিজে গেল ওরা। অস্থির বয়ার মত উঁচু-নিচু হচ্ছে ক্যানু, নড়াচড়া না করে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকতে বাধ্য হলো দুজনেই, হাঁপাচ্ছে।

হিস্স্ শব্দ করে পানিতে নেমে যাচ্ছে লাইন, শেষ প্রান্তটা বোটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখনও ধীর গতিতে সামনে এগোচ্ছে ফ্লো, একটু কাত হলো, তারপর পাক খেতে শুরু করল—অত্যন্ত মন্থর একটা লাটিম।

'পালাই, বাবা!' ঘন ঘন বৈঠা চালিয়ে স্থান ত্যাগ করছে অস্টিন, ফ্লোর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসছে ওরা।

'অস্টিন! কী করছ তুমি?'

'ফ্লো থেকে একশ' গজ দূরে। বেশি হলে আরও ভাল।'

তারপরেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না রানা।

ব্যাখ্যা করল অস্টিন। 'শোনো। ফ্লোর সঙ্গে আটকে আছে কিলার, ঠিক? চল্লিশ থেকে ষাট ফুটের বেশি ডাইভ দিতে পারবে না ওটা। ফ্লোর অত বরফ নিয়ে তার বেশি নীচে নামা ওটার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমরা যদি ফ্লোর ষাট ফুটের মধ্যে থাকি, ওটার কিলিং জোনের মধ্যে থাকা হবে আমাদের। সোজা বোটের তলা লক্ষ্য করে উঠে আসবে, তারপর ছিঁড়ে খাবে দুজনকে। পরিষ্কার?'

মাথা নাড়ল রানা, কিন্তু ওকে কিছু বলবার সুযোগ দিচ্ছে না অস্টিন।

'আর আমরা যদি,' আবার লেকচার শুরু করল সে, তার শ্রোতা যেন পিছিয়ে পড়া কোনও ছাত্র, 'নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকি, বাতাসের অভাবে ওটা...'

'অস্টিন! মুভ!' ছায়ার ভিতর থেকে ওদের দিকে ছুটে আসছে দানবটা, পানির উপর দৃষ্টিভ্রমের কারণে আকারে অনেক বড় আর খুব কাছে মনে হলো, জলে ডোবা মানুষের মত জালে আটকানো। ভয়ঙ্কর দৃশ্য, প্রায় অপার্থিব; মাথার পিছনে গাঁথা রূপালি হার্পুনটা চকচক করছে।

রানার চিৎকার শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল অস্টিনের শরীরে, উন্মত্তের মত বৈঠা চালাচ্ছে। শরীরটাকে মুচড়ে আক্রমণের কোণ পরিবর্তন করল কিলার, ক্যানুর নীচে পৌঁছাবার মতলব করেছে।

'আরও জোরে!' নির্দেশ দিল রানা, এখনও তিমিটাকে দেখতে পাচ্ছে ও।

'আসছে ওটা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল অস্টিন।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? চাও ওটা তোমার মাথাটা চিবিয়ে খাক?'

আতঙ্কে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, আগের চেয়ে জোরে বৈঠা চালাচ্ছে অস্টিন।

গায়ে জড়ানো নেট বাধা সৃষ্টি করায় শরীরটাকে ঠিকমত মোচড়াতে পারল না কিলার, একেবারে শেষ মুহূর্তে পানির সারফেস ভেঙে উপরে উঠে এল, ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে, ওটার ক্রুদ্ধ চিৎকার বিস্ফোরণের মত ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

রশির ঝাঁকি গলায় চেইন পরানো কুকুরের মত পিছু টেনে নিল ওটাকে। ছিটকে বরফের উপর পিঠ দিয়ে পড়ল মনিকা। সাগরে আছড়ে পড়ল কিলার, সারফেসের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে আক্রোশে।

'ঘোরো!' নির্দেশ দিল রানা, দু'হাঁটুর উপর সিধে হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে রেখেছে, হাতে বাগিয়ে ধরা দ্বিতীয় হার্পুন—

সাদা-কালো গলা আর পেট নাগালের সামান্য বাইরে। 'জলদি!'

আহত ভালুকের মত মাথা নেড়ে ক্যানুটাকে দ্রুতই ঘুরিয়ে নিল অস্টিন। আবার ওরা আক্রমণে, ওদের সামনে কিলার এখন অসহায়ভাবে ছটফট করছে পানিতে। এক সেকেন্ডের জন্য কিলারের অস্থির গায়ে ঠেকল ওদের বোট। তৈরি ছিল, সবটুকু শক্তি দিয়ে হার্পুনটা গেঁথে দিল রানা।

পেটের ভিতর ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শ লাগায় চিবুক থেকে লেজ পর্যন্ত কিলারের সমস্ত পেশি ঝাঁকি খেল। প্রচণ্ড শব্দে আবার পানিতে আছড়ে পড়ল ওটা, চেষ্টা করল ডাইভ দিতে।

বরফে উঠে বসে মনিকা যেন স্বপ্নের ভিতর দৃশ্যটা দেখছে—হার্পুনটা রানা নামিয়ে আনতেই খুদে ক্যানুটা সবেগে ঘুরে গেল, তারপর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো তিমির পিছনে। এরপর হঠাৎ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আবার ফিরে এল ক্যানুটা; ভেঙে গেছে, শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে।

রানাকেও উড়তে দেখছে মনিকা, যেন একজন অ্যাক্রব্যাট খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু অস্টিনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। 'রানা!' ডাকল মনিকা, দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। 'রানা!'

এবার রশির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় ধস্তাধস্তির মাত্রা বেড়ে গেছে কিলারের। পানির উপর পিঠ তুলল। পরমুহূর্তে চেষ্টা করল ডাইভ দেওয়ার। পানির নীচে চলে গেল ওটার মাথা। হঠাৎ ওখানে আর কিছু নেই।

আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল রানা। মনে পড়ল, ঠাণ্ডার সঙ্গে অসমযুদ্ধে মাত্র আড়াই মিনিট টিকে থাকবে ওর হার্ট, তারপর থেমে যাবে।

ওর পঞ্চাশ ফুট দূরে ফ্লো। ওটাকে লক্ষ্য করে সাঁতার শুরু করল। গালে মনে হলো আগুন ধরে গেছে, হাত দুটো ফুলে উঠেছে ঠাণ্ডায়। প্রতিটি পেশি দপদপ করে উঠল, তারপর অবশ হয়ে গেল। প্রতি ইঞ্চিতে বাধা দিচ্ছে সাগর। বুটের ভিতর পানি

ঢুকছে। পরনের কাপড়গুলো যেন সিসার তৈরি।

স্রোতে যখন ধাক্কা খেল, জ্ঞান না থাকারই মত। নিজের অবশিষ্ট সামর্থ্যে কুলাল না, মনিকার সাহায্য নিয়ে পানি থেকে বরফের উপর উঠতে হলো। তারপরেই শুরু হলো অদম্য কাঁপুনি।

নিষ্প্রভ নীল হয়ে ওঠা মুখটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে মনিকা, ভাবছে—হায় খোদা, এখন আমি কী করব!

হঠাৎ চোখ খুলে উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা। 'নড়াচড়া করতে হবে, তা না হলে বিপদ...' বলল ও।

'অস্টিন কোথায়?'

'নেই। ওরা দুজনেই...'

বত্রিশ

আর ঠিক তখনই, আবার, বিপুল জলরাশির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কাছাকাছি উঠে এল কিলারদের লিডার, দ্রুতগতিতে সাঁতরে ওদের কাছে চলে আসছে, পিঠটা তুলে রেখেছে পানির উপর, ফলে উঁচু হয়ে রয়েছে ফিন। মাথাটা এখনও জালে জড়ানো।

মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে কিলার, অথচ ওটার শক্তি যেন এতটুকু কমেনি। এই শক্তির উৎস সম্ভবত প্রচণ্ড আক্রোশ।

পারকার পকেটে হাত ভরে ব্যস্তভাবে কী যেন খুঁজছে মনিকা। পরমুহূর্তে ফ্লেয়ার পিস্তলটা বের করে লম্বা করে দিল হাত, তাক করেছে কালো তিমির মাথায়, অপেক্ষা করছে মুখটা কখন আরও একটু উঁচু হবে।

কিলারের মাথা খুব বেশি হলে বিশ ফুট দূরে। ট্রিগারে আঙুল

চেপে বসছে।

'না!' মনিকার হাতের তলার দিকে বাড়ি মারল রানার কবজি। মুঠো থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল পিস্তলটা, বিস্ফোরিত হলো, বাদামী আকাশ চিরে ছুটল লাল ফ্লেয়ার, যাচ্ছে দক্ষিণে জমে ওঠা ফগব্যাঙ্কের দিকে।

'লুক!' হাত তুলে দেখাল রানা। সম্পূর্ণ অবাস্তব একটা দৃশ্য, কল্পনারও অতীত, তিমির পিঠে কী যেন একটা নড়ছে।

অস্টিন জানে মৃত্যু হয়েছে তার।

কিলারের লেজের ঝাপটায় রানার মত ছিটকে পড়েনি সে, তার বদলে কীভাবে যেন নেটের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তার শরীরটা। তিমি ডাইভ দিলে সে-ও তলিয়ে যায় সাগরের গভীরে।

ডাইভ দেওয়ার পর মাথা থেকে নেট আর পেট থেকে হার্পুন ছাড়াবার জন্য আড়াই মিনিট ধরে ঘন ঘন ডিগবাজি আর মোচড় খেয়েছে কিলার, পুরোটা সময় ফিন আঁকড়ে ধরে ওটার পিঠে সেঁটে থেকেছে অস্টিন, সেই সঙ্গে জেনে নিয়েছে নরকযন্ত্রণা কাকে বলে।

তারপর শ্বাস নেওয়ার জন্য সারফেস ভেঙে আবার পানির উপর উঠে এসেছে কিলার। সুযোগ পেয়ে অস্টিনও নিজের ফুসফুস ভরে নিচ্ছে।

তবে পানির নীচে তিন মিনিটের বেশি ছিল সে। পায়ে কোনও অনুভূতি নেই। হাত দুটো ঠাণ্ডায় এমন 'পুড়ছে' যে সহ্য করবার মত নয়। একটা মাত্র জিনিস বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে, তার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা কিলারের উষ্ণ মাংস।

কপালে নিরেট কী যেন বাড়ি খেল। রিফ্লেক্স অ্যাকশন—হাত দিয়ে পরবর্তী আঘাত ঠেকাতে গেল। হাতেই পড়ল দ্বিতীয় বাড়ি। তারপর দেখতে পেল জিনিসটা, কুড়ালের হাতল। বোকার মতই এক সেকেন্ড ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর হাসতে শুরু

করল।

'দাঁড়াও শালা, বেজন্মা খুনি!' হিসহিস করে বলল অস্টিন, আঁচড়াআঁচড়ি করে তিমির কাঁধে উঠে যাচ্ছে। কুড়ালের হাতলটা বারকয়েক মোচড়াতে ওটার শরীর থেকে বেরিয়ে এল ফলা।

কিলার টের পেল পিঠে কিছু একটা নড়ছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওটা। অন্ধের মত ছুটল, ফুল স্পিডে। কিন্তু ষাট ফুট পিছনে রয়েছে ফ্লো, রশি দিয়ে জোড়া, তাতে টান পড়তেই আবার মন্থর হয়ে পড়ল স্পিড।

অমানুষিক পরিশ্রম আর অবিশ্বাস্য ইচ্ছাশক্তির জোরে কিলারের পিঠ বেয়ে উঠে যাচ্ছে অস্টিন। ওটার কাঁধে কিছুটা হাঁটু গাড়ার ভঙ্গিতে, কিছুটা বসার ভঙ্গিতে স্থির হলো সে; নিতম্বে ঠেকে থাকা প্রকাণ্ড ফিন শক্ত একটা ভিত দিয়েছে ওকে।

নড়াচড়া করায় প্রতিটি জয়েন্ট ব্যথায় যেন আর্তনাদ করছে, কুড়ালের হাতলটা মুঠোয় ভরল সে, তারপর কাঠের শাফট যতটুকু সাধ্যে কুলাল উপরে তুলল। এক মুহূর্ত এই ভঙ্গিতে স্থির থাকল অস্টিন।

গর্জে উঠল সে, 'মর শালা!' পরমুহূর্তে ইস্পাতের ফলাটা এক ঝলক উজ্জ্বল আলোর মত কিলারের মাথার পাশে নেমে এল। অস্টিন অনুভব করল চুরমার হওয়া হাড় ফলার সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে। আবার মুচড়ে বের করে আনল হাতল। যান্ত্রিক পুতুলের মত ঝাঁকি দিয়ে তুলল ফের, তারপর নামাল। তুলল, নামাল। তুলল, নামাল।

নতুন ব্যথায় দিশেহারা হয়ে পড়ল কিলার। হঠাৎ করেই বেড়ে গেল উন্মত্ততা, রশিতে প্রচণ্ড একটা টান দিল ওটা।

কাঁপুনি ভুলে একহাতে মনিকার ঘাড় পেঁচিয়ে রেখেছে রানা, ফ্লো থেকে রশির গোঁজটা বের করবার চেষ্টা করছে, এই সময় ঝাঁকি খেল ফ্লো। আলগা হয়ে থাকা গোঁজটা মুক্ত হয়ে গেল, সেই সঙ্গে রানা অনুভব করল ওর হাতের নীচে ভেঙে যাচ্ছে বরফ।

বাতাসের ভিতর দিয়ে ছোটার সময় আহত কোনও জন্তুর মত হাহাকার করছে রশিটা।

অস্টিনের মধ্যে মানসিক সুস্থতা বলতে আর কিছু নেই এখন। কুড়ালটা আবার তুলল সে, এই সময় প্রচণ্ড একটা ঝাঁকিতে নিজেকে ফ্লো থেকে মুক্ত করে ফেলল কিলার। ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য মোচড় খাচ্ছে অস্টিনের শরীর, দোল খেয়ে সরে যাচ্ছে ফিনের কাছ থেকে, এই সময় হঠাৎ ওটাকে চারপাশ থেকে কী যেন পেঁচাতে শুরু করল।

চোখ নামিয়ে নীচে তাকাল অস্টিন। একটা কমলা সাপ তার বুকের কাছে উঠে আসছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢেকে দিচ্ছে পরনের হলুদ লাইফজ্যাকেট। মর্মান্তিক বাস্তবতা হলো, শরীরের কোথায় কী আছে, কোথায় কী হচ্ছে তার কিছুই অনুভব করছে না সে, কারণ তার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে, গুঁড়িয়ে গেছে পাঁজর।

দম নিতে চেষ্টা করল অস্টিন, কিন্তু কী যেন আঘাত করল তাকে। একটা ঘোরের মধ্যে নীচের দিকে তাকাল। এই মাত্র কোমর থেকে বুক পর্যন্ত কমলা রঙের বৃত্তাকার বাঁধন উঠে আসছিল, অথচ এখন দেখতে পাচ্ছে ওর লাইফজ্যাকেটের সামনে থেকে বেরিয়ে রয়েছে ইস্পাতের একটা গোঁজ।

'অ-অ-স-টি-ই-ই-ন!' রানার চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই দক্ষিণ দিগন্ত থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ফগব্যাঙ্কে বাধা পেয়ে থেমে গেল। ডাকটা শুনতে পায়নি অস্টিন।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা; কিলারের কালো, উঁচু ফিনটাকে সাবমেরিনের কনিং-টাওয়ারের মত ডুবে যেতে দেখছে।

রানার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চোখ সরু করল মনিকা, কিন্তু গাঢ় হতে শুরু করা আলোড়িত কুয়াশার ভিতর দেখবার মত আর কিছু নেই।

ওদের ফ্লো এখন ছোট একটা কামরার মত, দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট,

প্রস্থে পনেরো; বিরতিহীন দুলছে, কিনারায় পানি উঠছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে মনিকা, আতঙ্কিত চোখে কী যেন খুঁজছে চারদিকে। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হেঁটে রানার পাশে চলে এল মনিকা। সে-ও নিঃশব্দে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। পরস্পরের হাত ধরল ওরা, তারপরেও তাকিয়ে আছে কুয়াশার ভিতর। তবে ওদের চোখে কিছু ধরা পড়ছে না।

মারা যাচ্ছে মাসুদ রানা।

শুয়ে আছে ও, পরনের পরিচ্ছদ জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে, মাথাটা মনিকার কোলের উপর। ওর পায়ে কোনও সাড় নেই। উত্তাপ আর প্রাণশক্তি, দুটোই ওর শরীর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এরকম ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হলে খিঁচুনি উঠে যায়, প্রবল ইচ্ছেশক্তির জোরে সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। খিঁচুনি উঠলে পেশিগুলো প্রচুর এনার্জি ব্যয় করবে, সেটার ধকল ওর হার্ট খুব বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না। নিজেকে সময় দিল ও, খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা।

ওর মত মনিকাও জানে কী হচ্ছে, তবে মুখ ফুটে কেউ সেটা বলছে না। মৃদুকণ্ঠে কথা বলছে ওরা, গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে নয়, ব্যক্তিগত টুকটাক আলাপ।

কিন্তু, তারপর, কুয়াশা যখন ঘন মেঘের মত ওদেরকে ঘিরে ফেলল, অস্পষ্ট একটা কম্পন অনুভব করল ওরা। ধীরে ধীরে সেটা বাড়ছে।

হঠাৎ ঝট করে খুলে গেল রানার চোখ। 'শোনো!'

কম্পনটা বাড়তে বাড়তে প্রায় নিরেট হয়ে উঠল, রূপান্তরিত হলো আওয়াজে। ওটার সঙ্গে কুয়াশাও কাঁপছে। ঝাঁকি খাচ্ছে বরফও।

'কী ওটা?' শব্দটার গাম্ভীর্য বিহ্বল করে তুলেছে মনিকাকে।

'ইঞ্জিনের আওয়াজ। জাহাজ!' অসম্ভব বলে মনে হলেও, চেষ্টা করতেই উঠে বসতে পারল রানা, তারপর মনিকার হাত ধরে দাঁড়াতেও পারল। ওদেরকে ঘিরে পাক খাচ্ছে কুয়াশা।

কিন্তু তারপর অকস্মাৎ নীরবতা নেমে এল।

'কোথায় ওটা? আরে, কোথায় গেল?' চোখ দুটো যেন কোনও মানসিক রোগীর, কুয়াশার ভিতর তন্নতন্ন করে খুঁজছে রানা। কিন্তু ঝাপসা ও অস্থির ছায়াই শুধু দেখতে পাচ্ছে, প্রকাণ্ড সব দৈত্যের মত ঝুলে আছে, কিন্তু নিরেট কিছু নয়।

'হেলপ!' নিস্তেজ সুরে আবেদন জানাল রানা।

'ওই তো!' হাত তুলে দেখাল মনিকা, উত্তেজনায় আর আনন্দে কেঁদে ফেলল।

রানাও দেখতে পেল, কুয়াশার নীচের স্তরে সত্যি কী যেন নড়ছে। চোখ সরু করে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল ওরা। একযোগে দুজনেই চেঁচাচ্ছে: 'হেলপ! হেলপ! হেলপ! হেলপ!'

কিন্তু তারপর হঠাৎ বোবা হয়ে গেল ওরা। নড়ছে ঠিকই, তবে কাঁটা আকৃতির দশটা কালো ফিন ওগুলো। কিলার ওয়েইলদের গ্রুপটা ফিরে এসেছে।

হতাশায় প্রায় ঢলে পড়ল রানা। ওর কাঁধটা শক্ত করে ধরে আছে মনিকা, দু'চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে। খুদে ফ্লোটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে ফিনগুলো।

কথা বলবার সাহস ও শক্তি, কোনটাই নেই ওদের। তীরচিহ্নের আকৃতি নিয়ে ঝাঁক বাঁধতে দেখল দলটাকে, ক্রমশ ছোট করে আনছে বৃত্তটা, সেই সঙ্গে পানির উপর টাওয়ারের মত উঁচু হচ্ছে। নড়াচড়া আড়ষ্ট, ওগুলোর সঙ্গে ঘুরছে মানুষের দুটো মূর্তি, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তিমিগুলোর দিকে।

উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে সময়, খুদে বরফের টুকরোর উপর উঠে আসছে সাগর। ফিনগুলো কাছে চলে আসায় হিসহিস

করছে পানি, রাশি রাশি বুদ্বুদ তৈরি হচ্ছে। সাদা-কালো একেকটা প্রকাণ্ড কাঠামো ঘষা খাওয়ায় ওদের ফ্লো এদিক-সেদিক ছিটকে যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে দশটা কিলার, ফিনগুলো চার থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচু।

জাহাজের আওয়াজ পেয়ে যে আশার আলো জেগেছিল ওদের মনে অনেক আগেই তা নিভে গেছে। দুজনেই বুঝতে পারছে এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে ওরা, অপেক্ষা করছে অনিবার্য পরিণতির জন্য।

কী কারণে বোঝা গেল না তীরচিহ্নের আকৃতি নিয়ে ঝাঁক বাঁধা কিলারের গ্রুপটা দূরে সরে যাচ্ছে, কুয়াশার ভিতরে ঝাপসা হয়ে উঠল ফিনগুলো।

কিন্তু তারপর ঘুরল, ফিরে আসছে টর্পেডোর মত, হামলা করবার জন্য গতি ক্রমশ বাড়াচ্ছে।

এখন আর কিছু আসে যায় না। ঠাণ্ডায় খিঁচুনি উঠে গেছে রানার শরীরে। প্রতিটি পেশি ঝাঁকি খাচ্ছে, যেন নিজস্ব প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ওগুলো। দাঁতগুলো ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে। ওকে আরও জোরে আলিঙ্গন করল মনিকা, সবটুকু শক্তি দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে রাখল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে,' ফিসফিস করল সে। 'তুমি দেখো, রানা। যেভাবে পারি আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলব।'

ডুব দিয়ে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল ফিনগুলো, কয়েক গজ দূরে। আঘাতের আশঙ্কায় শরীরটাকে শক্ত করল রানা। এক হাতে মনিকার কোমরটা জড়াল, এত জোরে যে পাঁজরে ব্যথা পাচ্ছে মেয়েটা।

কিছুই ঘটল না।

তারপর সারফেসে উঠল কিলাররা। রানা ও মনিকা একযোগে

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, দেখল আকৃতি ভেঙে ফিনগুলো ওদের পিছনদিকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। তারপর নীরবতা ভেঙে নতুন একটা শব্দ হলো: আউটবোট মোটরের যান্ত্রিক গুঞ্জন।

কেউ ওরা নড়ল না, কথাও বলল না; ব্যাপারটা যেন অদ্ভুত কোনও ম্যাজিক, বোকার মত কিছু বলে কিংবা করে বসলে নষ্ট করে ফেলা হবে।

রানাই প্রথম ওটাকে দেখতে পেল। কী দেখেছে বলল মনিকাকে। ওই একই সময়ে ওদের পিছনে নীরবে ফিরে এল ফিনগুলো। ওগুলোর মালিক, তিমিরাও দেখছে এরপর কী হয় না হয়।

কুয়াশার ভিতর ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে লম্বা একটা আকৃতি। আকার একই হওয়ায়, রোমহর্ষক একটা মুহূর্তে ওদের মনে হলো কিলারের ফিন ওটা। তবে দমকা বাতাস ওদিকের খানিকটা কুয়াশা সরিয়ে দেওয়ায় দীর্ঘদেহী, বৃষস্কন্ধ এক লোকের কাঠামো পরিষ্কার হয়ে উঠল।

মুখে নিখুঁতভাবে কামানো দাড়ি, গায়ে হলুদ পারকা, হুডের কিনারা থেকে বেরিয়ে আছে ছোট করে ছাঁটা চুল। শিরদাঁড়া খাড়া, শ্বেতাঙ্গ লোকটা পা দুটো সামান্য ফাঁক করে মোটাসোটা ইনফ্লেটেবল-এর বো-তে দাঁড়িয়ে। লম্বা বোট-হুকটা ধরে রেখেছে বুকের কাছে।

'হাই!' ভারী গলায় বলল সে। 'আপনারা সুস্থ তো?' রাবার বোটের বাকি অংশ স্পষ্ট হলো। আরও পাঁচ কি ছ'জন লোক বসে আছে ওটায়, দাঁড়ানো লোকটার পায়ের পাশ দিয়ে সবাই তারা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে অটোমেটিক রাইফেল, প্রত্যেকের পরনে ইউনিফর্ম।

'না, সুস্থ নই, জমে যাচ্ছি,' নিস্তেজ গলায় বলল রানা। 'আপনারা?'

'আমরা আমেরিকান নেভির মেরিন কমান্ডো,' বলল লোকটা।

'আমি ক্যাপটেন হিউবার্ট সিমসন।'

নিজেদের মধ্যে কয়েক সেকেন্ড ফিসফাস করল ওরা, তারপর ক্যাপটেন সিমসন আবার বলল, 'আমরা ফ্লেয়ার দেখে এদিকে এসেছি। কাজটা উচিত হয়নি, কারণ এটা আসলে রাশিয়ানদের জলসীমা। তবে না এসেও উপায় ছিল না, কারণ আমরা প্রফেসর আদনান মনসুরকে খুঁজছি।'

'কেন খুঁজছেন, প্লিজ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনারা কি রেসকিউ টিম?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই রেসকিউ টিম! তিনি নুমার একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে কাজ করছিলেন, বারো থেকে ওখানে ফেরার পথে ওঁদের প্লেন নিখোঁজ হয়ে গেছে। আপনাদের পরিচয়, প্লিজ?'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ফ্লেয়ার দেখে খুঁজতে এলেও, মার্কিন মেরিন কমান্ডোদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্ভবত প্রফেসর মনসুরের আবিষ্কার করা রাসায়নিক অস্ত্রের ফর্মুলা হাইজ্যাক করা। চকচকে ক্যাপসুলটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর, প্লাস্টিকের আবরণে মোড়া, গায়ে মসুর ডাল আকৃতির একটা আঙটা আছে।

তবে চিন্তার কিছু নেই, মাইক্রোফিল্ম-এর ওই রিল সহজে খুঁজে পাবে না তারা। খুদে আংটায় সুতো বেঁধে ক্যাপসুল গিলে ফেলেছে রানা, অপরপ্রান্ত জড়ানো আছে নীচের পাটির শেষ দাঁতটার গোড়ায়। সুতো ধরে টান দিলেই উঠে আসবে মুখে।

'আমি মাসুদ রানা, নুমায় আছি, স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর,' বলল রানা। 'ইনি প্রফেসর মনসুরের মেয়ে।'

'প্রফেসর কোথায়?' ক্যাপটেন সিমসনের গলায় উদ্বেগের চেয়ে কাঠিন্যই যেন বেশি।

'ড্যাডি মারা গেছেন,' বলল মনিকা। 'একদল কিলার ওয়েইলের সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাদেরকে। সাতজন ছিলাম, আছি মাত্র দুজন—আমি আর আমার ফিয়াঁসে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, সব কথা জাহাজে ওঠার পরে শোনা

যাবে। তার আগে আপনাদের চিকিৎসা দরকার।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাপটেন। 'লেফটেন্যান্ট রস, বোট সামনে বাড়াও!'

বিশ ফুট দূরে রয়েছে ওদের রাবার বোট, অলস ইঞ্জিন থেকে যান্ত্রিক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল আবার। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ফ্লোর কিনারায় ঠেকল বোটের মোটা কালো বো।

বোট-হুক হাতে নিয়ে ফ্লোতে নেমে এল ক্যাপটেন সিমসন, ওদের দুজনকে বোটে উঠতে সাহায্য করবে। তার সঙ্গে একজন লেফটেন্যান্টও এল, নাম অ্যারন, হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

বোটের কিনারায় দাঁড়িয়ে বোট-হুকের অপরপ্রান্তটা ধরে আছে সেকেন্ড অফিসার ক্লাইভ। কাঁধে একজোড়া ভারী কম্বল নিয়ে তৈরি হয়ে আছে লেফটেন্যান্ট হামফ্রে, বোটে উঠলে রানা ও মনিকাকে ওগুলো দিয়ে মুড়ে ফেলবে। আরেকজনের হাতে একটা ব্র্যান্ডির বোতলও দেখা গেল।

সেকেন্ড অফিসারের সাহায্য নিয়ে প্রথমে মনিকা উঠল বোটে। লেফটেন্যান্ট হামফ্রে সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিল। আরেকজন লেফটেন্যান্ট সমীহের সঙ্গে পথ দেখিয়ে পনেরো ফুট লম্বা বোটের আরেকদিকে নিয়ে যাচ্ছে ওকে, খালি একটা সিট দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল। ওকে সাহায্য করবার জন্য ঝুঁকে পড়ল আরও দুজন লোক। শুধু যে লোকটা আউটবোট মোটর নিয়ন্ত্রণ করছে, লেফটেন্যান্ট রস, নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

'এবার মিস্টার রানা,' বলল ক্যাপটেন সিমসন।

পিছন ফিরে অবশিষ্ট ফ্লোর দিকে একবার তাকাল রানা। ওদেরকে ভালই সার্ভিস দিয়েছে ওটা। আর সবাই বেঁচে থাকলে তাদেরও এখানে আশ্রয় হত।

হঠাৎই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চিরবিদায় জানাবার মত কষ্টকর একটা অভিজ্ঞতা। ছায়া, দাগ, ভাঁজ, ফাটল, খানা-খন্দ ইত্যাদি সহ চকচকে সাদা বরফের টুকরোর শেষপ্রান্ত

কুয়াশায় ঢাকা, সেদিকে তাকিয়ে রানা যেন আশা করছে বাকি পাঁচজনকেও দেখতে পাবে ওখানে: পাইলট, কো-পাইলট, প্রফেসর মনসুর, জুনো আর অস্টিনকে।

আরে, সত্যি কী যেন রয়েছে...

তেত্রিশ

'সাবধান!' রানার গলায় চিৎকার, হাত তুলে দেখাল।

পানি কাটছে দশটা ফিন। একটা প্রায় সাত ফুট লম্বা, বেশ বড় একটা অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে ওটা থেকে। বোটের দিকে ওগুলোর বিরতিহীন এগিয়ে আসার মধ্যে শক্তির নীরব প্রদর্শন লক্ষ করবার মত।

হাত থেকে বোট-হুক ছেড়ে দিল ক্যাপটেন, সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোর সামনে থেকে পিছাতে শুরু করল বোট। কাছে চলে আসছে দশটা ফিন, ওগুলোর সামনের কিনারায় ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে পানি। তারপর ডুব দিল। নিখুঁত তীরচিহ্নের আদলে ডাইভ দিল বোটের তলায়, উল্টোদিকের সারফেসে উঠল, তারপর হারিয়ে গেল কুয়াশার ভিতর।

'কিলার ওয়েইল,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্যাপটেন সিমসন, দেখল বোটটা আবার ফিরে আসছে।

ফ্লোর কাছে চলে এল বোট। ওটা থেকে হাত বাড়াল সেকেন্ড অফিসার, বোট-হুকটা ক্যাপনেটকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ধরার জন্য ক্যাপটেনও হাত বাড়াল...

ফ্লো আর বোটের মাঝখানের পানি লাফিয়ে উঠল, সাগর

থেকে উঠে এল কিছু একটা। গাঢ়, শান্ত পানিতে ধীরে ধীরে ঘুরছে জন অস্টিন; ভেসে উঠেছে গায়ে লাইফজ্যাকেট থাকায়; মরা হাতের মুঠোয় এখনও কুড়ালের হাতল, রশিটা এখনও কোমরের চারদিকে জড়ানো। রশির শেষপ্রান্তে আটকানো ইস্পাতের গোঁজটা বুকে গাঁথা।

ভারসাম্য রক্ষার জন্য রানাকে ধরে রেখেছে ক্যাপটেন সিমসন, ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল ও, মাথায় একটাই চিন্তা—অস্টিনের লাশ আর কিলারকে আলাদা করে রেখেছে পঞ্চাশ ফুটী রশিটা, সারফেসে উঠে আসবার আগেই ওটাকে যদি কোনওভাবে বোটের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়...

ক্যাপটেনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লেফটেন্যান্ট অ্যারনের রাইফেল ধরে টান দিল রানা।

হকচকিয়ে গেল অ্যারন।

'কী করছেন আপনি?' রানার আচরণে বিমূঢ় বোধ করছে ক্যাপটেন সিমসন।

সাগর থেকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠে এল উত্তরটা।

মারাত্মক আহত হলেও, মারা যায়নি লিডার। ইস্পাতের গোঁজটা হার্টে গাঁথার আগে কুড়াল দিয়ে সব মিলিয়ে ছ'টা আঘাত করেছিল অস্টিন। কিন্তু ওটার খুলির কাঠামো এমনভাবে তৈরি, সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে পারেনি।

কিলার ওয়েইলের মাথার পিছনে বড়সড় একজোড়া ট্যাংক আছে, প্রচুর রক্ত ধরে ওগুলোয়; এমনভাবে ডিজাইন করা, দীর্ঘ ডাইভ দেওয়ার সময় মস্তিষ্ক যাতে অক্সিজেন সাপ্লাই পেতে পারে। কুড়ালের আঘাত দু'পাশে বাইরের দেয়ালের হাড় ভেঙেছে, ফলে আংশিকভাবে দুটো ট্যাংকেই ফাটল ধরেছে, তবে যেখানে মগজ আছে তার নাগাল পায়নি।

কাজেই আচ্ছন্ন বোধ করলেও, সাগরের নীচে নেমে গিয়ে

সাঁতরাতে কোনও অসুবিধে হয়নি লিডারের—সঙ্গে করে বয়ে বেড়িয়েছে গায়ে-মাথায় জড়িয়ে পড়া নেট, রশি আর লাশ।

জাহাজের শব্দ আর ফিরে আসা দলের গান একাধারে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করেছে লিডারকে। রক্তক্ষরণে ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে, তারপরেও তল্লাশি শুরু করেছে। জাহাজ কিংবা নিজের দল, কোনওটাই পায়নি। তার বদলে শুনতে পেয়েছে আউটবোট মোটরের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

লিডারের মনের পরদায় ট্রেইনার-এর ছবি ফুটে উঠেছে। দিক বদলে আউটবোট মোটরের শব্দ লক্ষ্য করে সাঁতরাতে শুরু করেছে, ঠিক যেমন ট্রেনিং পেয়েছে ওটা। গভীর পানির ঠাণ্ডা আর অন্ধকার থেকে উষ্ণ আর আলোকিত পানিতে উঠে এসেছে, রীতিমত উত্তেজিত।

সারফেস কাছে চলে আসতে রাবার বোটের তলা দেখতে পেয়েছে ওটা, চোখে পড়েছে ফ্লোর কিনারা। তারপর দেখতে পেল দুটোর মাঝখানে লম্বা করা একটা হাত। এক নিমেষে ওটার সমস্ত পেশি টান টান হয়ে গেল, শেষ একটা আক্রমণের জন্য তৈরি। প্রকাণ্ড লেজটা ঘন ঘন আছড়ে তীরবেগে পানির উপর উঠে এল ওটা।

ক্যাপটেন আর সেকেন্ড অফিসারকে নাগালের মধ্যে পেল না কিলার, পেল রাইফেলসহ রানার লম্বা করা বাম হাতটাকে। এক ঝটকায় ফ্লো থেকে ওকে তুলে নিয়ে গেল ওটা, কনুই পর্যন্ত বাম হাতটা মুখে পুরে ফেলেছে।

বিপুল পানি ছিটিয়ে সাগরের অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল তিমি।

চোখের সামনে থেকে, পলকের মধ্যে, রানাকে নিয়ে কিলারকে ডাইভ দিতে দেখে মনিকার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। অস্টিনের লাশ দেখেছে ও, মনে পড়ল তাকে পিঠে নিয়ে কী করেছিল তিমি; রানার মত সে-ও জানে, এরপর কী হবে।

লাফ দিয়ে সিট ছাড়ল মনিকা, টলতে টলতে পার হয়ে এল বোটের সবটুকু দৈর্ঘ্য, ছোঁ দিয়ে সেকেন্ড অফিসারের হাত থেকে বোট-হুকটা নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওর প্ল্যানটা খুব সহজ: কিলার উঠে এলে বোট-হুকটা সোজা ওটার চোখে ঢুকিয়ে দেবে।

রানাকে নিয়ে এক মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড পানির নীচে থাকল কিলার।

সাগর থেকে আবার যখন উঠল ওটা, মাফলারের মত গলায় জড়িয়ে গেছে নেটটা, একাধিক তাজা ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় ফুলে গেছে সাদা-কালো মুখ, মাথার পিছন থেকে মোটা ধারায় রক্ত বেরুচ্ছে।

হাঁ করে আছে কিলার, কারণ মুখটা বন্ধ করবার কোনও উপায় নেই।

তিমির সরু ঠোঁটের কিনারায় হাঁটু ভাঁজ করে বসে রয়েছে রানা। রাইফেলটাকে খাড়া করে রেখেছে ও, ট্রিগার খুঁজছে আঙুল দিয়ে; মাজল ঠেকে আছে দানবটার মুখের ছাদে, বাঁটটা দু'হাঁটুর মাঝখানে।

ওখানে খুব একটা আরামে বসে নেই রানা, কারণ কর্কশ কার্পেটের মত কিলারের মস্ত জিভটা ঠেলে মুখের ভিতর থেকে ওকে বের করে দিতে চেষ্টা করছে। জিভের হামলাটা বুটের লাথি মেরে ঠেকাচ্ছে ও।

ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করছে রানা, বুঝতে পারছে যে-কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

পানি থেকে উঠে আসতেই ওটার প্রকাণ্ড চোয়ালের উপর, এক কোণ লক্ষ্য করে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বোট-হুকটা ঠেলে দিল মনিকা। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, লাগাতেই পারল না।

সাগরের তলা থেকে উঠে আসবার পর তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিল রানা, তাতে দু'এক মুহূর্তের জন্য নতুন শক্তি অনুভব করলেও, ক্লান্তি আর অসুস্থতা দূর হলো না। তবে

ট্রিগারটাও পেয়ে গেল ও। রাইফেলের সিলেক্টর আগেই অটোমেটিকে ঠেলে দেওয়া ছিল, এখন শুধু ওকে ট্রিগারে আঙুল পেঁচাতে হবে।

ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, গুলিও বেরুচ্ছে, এই সময় অজ্ঞান হয়ে গেল রানা।

ওকে হাঁ করা মুখের দোরগোড়ায় নিয়ে পানি থেকে ত্রিশ ফুট উপরে উঠে পড়ল কিলার, এই সময় বিস্ফোরিত হলো ওটার মগজ আর মাথা। একের পর এক বুলেট বেরুচ্ছে চূড়া থেকে, প্রতিটি বুলেট মাথার খানিকটা করে টুকরো আর মগজ ছড়িয়ে দিচ্ছে শূন্যে। বিস্ফোরিত ট্যাংকগুলো থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে বিপুল রক্ত, ত্রিশ ফুট উপর থেকে নিশ্ছিদ্র লাল প্রপাত হয়ে নীচে নামছে। ওটার সমস্ত পেশিতে ঢিল পড়ল, নিষ্প্রাণ হয়ে গেল চোখ দুটো; প্রকাণ্ড শরীরটা এখন যেন নরম কাদার পাহাড়, ঢলে পড়ছে সাগরে।

তিমিটার পতন দেখতে পেয়ে রাবার বোটের ক্রুরা তৎপর হয়ে উঠল। চালু ইঞ্জিনকে উল্টোদিকে চালাল লেফটেন্যান্ট রস, ফলে বোটের বো থেকে বেশ খানিকটা দূরেই পড়ল লিডারের লাশ।

বিরাট একটা ঢেউ উঠল, সেই ঢেউই ভাসিয়ে নিয়ে এল রানাকে, এখনও জ্ঞান ফেরেনি; ফ্লোর উপর তুলে দিয়ে গেল ওকে, ঠিক মাঝখানটায়।

লিডারের অবস্থা দেখে ঝাঁক ভেঙে যে-যেদিকে পারে সরে গিয়েছিল দলের বাকি তিমি। সাগরের তলায় নেমে যাচ্ছে লিডার, দূর থেকে দেখতে পেয়ে চারদিক থেকে ছুটে এল ওগুলো। অন্য কোনও দিকে খেয়াল দেওয়ার ফুরসত নেই, লাশটাকে নিয়ে মচ্ছব শুরু করে দিল।

রানার জ্ঞান ফিরল মার্কিন নৌ-বাহিনীর ডেস্ট্রয়ার 'প্রোটেকটর'-

এ। তবে চোখ খোলার আগেই টের পেল সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটি করছে না আমেরিকান নৌ-সেনারা।

স্যালাইন চলছে, নার্স এসে আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল। ওর মাথার পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছে মনিকা, নার্স আর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে মাঝে-মধ্যে।

চোখ খুলতে যাবে, এই সময় ক্যাপটেন সিমসনের গলা পেল রানা, সঙ্গে আরও দু'তিনজন নৌ-সেনাকে নিয়ে সিক বে-র কেবিনে ঢুকল। তাদের মধ্যে অন্তত একজন মেয়ে।

মনিকাকে সার্চ করবার অনুমতি চাইছে সে।

ব্যাপারটা হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়েই শুরু হলো। মনিকা বলল, 'আমাদের দুজনকে ইতিমধ্যে একবার তো সার্চ করা হয়েছেই, আবার কেন?'

মেয়েটি, লেফটেন্যান্ট অ্যাঞ্জেলা, হেসে উঠে উত্তর দিল, 'এ থেকেই বোঝা যায় যে ব্যাপারটা স্রেফ রুটিন, আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এমন হতে পারে ঘুমের মধ্যে আপনারা টের পাননি, প্রফেসর মনসুর আপনাদের শরীরে কোথাও কিছু একটা রেখে গেছেন।'

চোখ খুলে রানা বলল, 'তা হলে ফুটোফাটাগুলো ভাল করে চেক করুন।'

হেসে উঠল সবাই, তবে সেটা রানার জ্ঞান ফেরায়, নাকি ওর কথা শুনে, ঠিক বোঝা গেল না।

'আচ্ছা,' বলল মনিকা। 'একটা কথা।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'ড্যাডি যদি কিছু রেখে গিয়ে থাকেনও, তাতে আমেরিকার কী বলুন তো? এই জিনিসটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

হাসিমুখে জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আমেরিকার মাটিতে বসে গবেষণা করছিলেন তিনি। আমরা জানতে পেরেছি তাঁর গবেষণা সফল হয়, যুগান্তকারী

একটা কিছু আবিষ্কার করেন তিনি। সেই সঙ্গে এ-ও জানতে পারি যে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা আছে এমন কয়েকটা দেশের স্পাইরা তাঁর ওই আবিষ্কারের ফর্মুলা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কাজেই আমাদের ও বাংলাদেশের স্বার্থে ফর্মুলাটা তাদের হাতে পড়া উচিত নয়। এটাই আমরা নিশ্চিত করতে চাইছি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' হাসিমুখে বলল মনিকাও।

সার্চ অবশ্য ঠিকই করা হলো আবার। তবে রানার মুখের ভিতরটা দেখতে চায়নি কেউ।

পরদিন সকালে অ্যাঙ্কারেজ শহরে পৌঁছাল প্রোটেকটর। নুমার তরফ থেকে প্রতিষ্ঠানের চিফ স্বয়ং অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন রানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওখানে।

***

মাসুদ রানা

জলরাক্ষস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা সহ পাঁচজন পুরুষ আর সুন্দরী এক তরুণী। আর্কটিক মহাসাগরের এক টুকরো ভাসমান বরফের উপর আটকা পড়ে গেছে। সবাই যদি এক থাকত, শূন্যাঙ্কের নীচের তাপমাত্রা আর ভয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও টিকে থাকবার মত যন্ত্রপাতি আর দক্ষতা ওদের ছিল। দলে রয়েছেন বাংলাদেশী একজন বিজ্ঞানী, ওঁর আবিষ্কারের ফর্মুলা নিয়ে মাসুদ রানাকে ফিরতে হবে দেশে। কিন্তু হঠাৎ বিক্ষুব্ধ সাগর থেকে উঠে এল দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী—একদল কিলার ওয়েইল। বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ওদের লিডার—অবিশ্বাস্য ওটার ক্ষমতা, প্রিয় খাদ্য মানুষের মাংস। মানুষের প্রতি ঘৃণা অপরিসীম।
শুরু হলো ওগুলোর বিরুদ্ধে অস্তিত্ব রক্ষার রোমহর্ষক লড়াই। কিন্তু লড়াই রয়েছে যে ওদের নিজেদের মধ্যেও!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET